॥ প্রথম প্রকাশ ॥

আষাঢ়, ১৩৭৬

জুলাই, ১৯৬৯

॥ প্রকাশক ॥

বীরেন নাগ

১, কলেজ রো,

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

শ্রীবংশীধর সিংহ

মুদ্রক সংঘ

১/বি, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

॥ প্রচ্ছদ ॥

অজয় দাস

আট টাকা

নীল সমুদ্র সবুজ দেশ

এই লেখকের ঃ —

যৌবনের নায়িকা

বাসর প্রদীপ

পিয়াসী মন

অগ্নিস্বাক্ষর

পিয়ারী

বর্ণান্তর

শেষ নাগ

রূপতরঙ্গ

মণি বেগম

গৌড়জন বধূ

কেউ ফেরে নাই

মেঘে ঢাকা তারা

বাসাংসি জীর্ণানি

অন্তরে অন্তরে

মনের মানুষ

যদি জানতেম

মুক্তিস্নান

ভোর হয়ে আসছে।

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস ততখানি ধারালো দাঁত দিয়ে শরীরটাকে ফুঁড়ছে না, বেশ একটা আমেজ আনে। চাদর গায়ে জানালার ধারে বসে চেয়ে আছি সামনের দিকে জানলার বাইরে।

মাদ্রাজ এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে। একপাশে মাঠ-পাহাড় অন্যদিকে শুধু চকচকে রূপালি জলরাশির বিস্তার। কুয়াশার ফিকে আবরণ আলোর আভায় ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে সেই জলের বিস্তার এসে রূপালি রেখায় লাইনকে ছুঁয়েছে আবার সরে গেছে। জলের বুকে কোথায় নীরব অস্তিত্ব নিয়ে জেগে উঠেছে দু একটা পাহাড়, আবার সেই জল।

সূর্যের প্রথম আলোয় ওই জলরাশি সুপ্তিমগ্ন পাহাড়গুলো সব এক নতুন রং-এ ভরে উঠেছে।

গাড়ীর গতি কমে আসছে।

নারকেল গাছগুলো সকালের আলোর ছোঁয়ায় জেগে উঠে মাথা নাড়ছে—ছোট সুন্দর সাজানো একটা ষ্টেশন।

লোকজন বিশেষ নেই। ওখানের এখনও সকালের ঘুম বোধ হয় ভাঙেনি। পাখীগুলোই কলরব করছে।

ষ্টেশনের নাম রম্ভা। চিল্কা হ্রদের পাশ দিয়ে আমরা বের হয়ে এলাম। পেছনে ফেলে গেলাম সেই সুন্দর পরিবেশটুকুকে, দাঁড়াবার সময় আমাদের নেই।

দীর্ঘপথ সামনে—তাই চলে যেতে হয় সব সুন্দরকে ফেলে। হাতছানি দিয়ে ডাকলো, ভালো লাগলো, তবু দাঁড়াবার সময় নেই।

পথ অনেক দূর— শেষ হবে একেবারে ভারতের দক্ষিণ-সীমান্তে, কন্যাকুমারী রামেশ্বরমে সমুদ্রতীরে। তাই চিল্কার নির্জন সৌন্দর্য, রম্ভার আধো আলো আঁধারিতে পাহাড়ের বুকে সেই স্বপ্নলিপি পড়ার আমার অবকাশ নেই।

আনমনে জানলার ধারে বসে আছি। দু একজন যারা চিল্কা দেখার জন্য উঠে এসেছিল, তারাও আবার গিয়ে শয্যা নিয়েছে। সুরপতি তো টানা ঘুম দিয়েছে, আজ সকালে ওঠার যেন দরকার নেই।

ওরা বেশ ঘুমুতে পারে। ওপাশে বেঁটে খাটো বউটি শুয়ে শুয়েই একবার বলে :

—চিল্কার অনেক মাছই খেয়েছি আমরা—ও আর দেখবো কি! আবার র‍্যাগটা মুড়ি দিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্ত আরামে।

মনে পড়ে নিবেদিতার কথা।

আগেবারের যাযাবর পরিক্রমায় সে-ও সাক্ষী ছিল। দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় সেই পথ, দক্ষিণ ভারতের পথ তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

নিবেদিতাই বলেছিল, যদি বের হ'ন খবর দেবেন। কিন্তু আজ তার দিন বদলেছে। কোথায় নিভৃতে কোন স্বপ্ননীড় রচনা করেছে বোধহয়। সে সুখেই থাক।

তার আর খবর নিই নি। ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে যখন মানুষ পথে পা দেয় তার মনও অতীতকে ভুলে যেতে চায়।

পথকেই এখন চরম এবং পরম সাথী বলে না মেনে নিলে কষ্টের আর অবধি থাকে না। পথে তো আর ঘর বাঁধা যায় না—তাই সব মানুষই তখন বাইরের খোলস ফেলে সহজ হয়ে উঠে।

এখনও পুরো একদিনের পথ বাকী। উড়িষ্যার সীমানা শেষ হবে বহরমপুরে (গঞ্জাম) পার হয়ে। ইচ্ছাপুরম ষ্টেশন থেকে পড়বে অন্ধ, সারা অন্ধ প্রদেশ পার হতে হবে; ভিজিয়ানাগ্রাম, ওয়ালটেয়ার, রাজামহেন্দ্রীর পর গোদাবরী নদী, আরও অনেকদূরে বেজওয়াদা, নেলোর, গুড়ুর—তারপরও আড়ম্বকম ষ্টেশনের শেষ হয়ে অন্ধ্রের

সীমানা। তারপর তড়া ছোট্ট একটা ষ্টেশন, সেখান থেকে মাদ্রাজ-এর সুরু।

ইতিমধ্যেই খাবার-দাবারের রূপ বদলে গেছে। পাশেপাশে মাথা তুলে চলেছে পূর্বঘাট পর্বতমালা। দূরে কালো পাহাড়শ্রেণী মাঝে মাঝে আকাশে মাথা তুলেছে। ওরা যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে পূর্বদিককার প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে। শুধু সমুদ্রই নয় তারপর ওই পর্বতমালাও ভারতের দুদিকেই সেই বাধাপ্রাচীর রচনা করে রেখেছে। ট্রেনটা ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটে চলেছে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণের দিকে।

সঙ্গী কয়েকটি নরনারীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওদিকে শুয়েছিল বুড়ো বয়স্ক নেত্যবাবু, সে লাফ দিয়ে উঠে মাথাব দিককার জানালাটা খুলে তাঁর জবুথবু গিন্নীকে ধাক্কা মেরে তুলে র‍্যাগ জড়িয়ে একটা পুঁটলির মত সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বলে ঃ

—সমুদ্রের হাওয়া খাও। শরীব ভালো হবে।

—সমুদ্র কোথায়? সে যে অনেক দূর। বলে ওঠে প্রশান্ত।

—অ! তালে শুয়ে পড়ো। আমি একটু চা দেখি। বলা মাত্র গিন্নীর সেই র‍্যাগ-জড়ানো মূর্তি ধপ্ করে বেঞ্চে আবার কাৎ হয়ে পড়ল। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামল। নেত্যকালীবাবু বুড়ো বয়সেও ছোকরার মত বেশ চট্ করে একটা এনামেলের মগ্ হাতে করে ষ্টেশনে নামল, লোকটা দেখতেও বিচিত্র স্বভাবটা আরও বিচিত্র-ধরণের। একমাথা পাকাচুলেও বেশ রীতিমত ফ্যাশন কাটা হয়েছে। বোধ হয় কলপও দেয়। সাদা চুলগুলো তামাটে, আর দু চোখে সর্বদাই একটা ধূর্ত ভাব। কণ্ঠস্বরও তেমনি—একসঙ্গে তিনটে সুর বের হয়।

ওপাশে সুরেরই আলাপ চলেছে বিজয়দাকে অনেকদিন থেকেই জানি। এ যাত্রায় তিনিও সঙ্গী। খুব সৌখিন লোক। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনিও তাদের দক্ষিণের নাচ এবং গান সম্বন্ধে একটা ধারণা বানিয়ে দিতে চলেছেন।

কোন একটা গলিতে গজানো নাচ গানের স্কুলের তিনি অন্যতম কর্মকর্তা নিজে গান নাচ কতটুকু জানেন তা আমার গোচরে নেই। কিন্তু ভদ্রলোক শিষ্য শিষ্যা পরিবৃত হয়ে যে বিরাট এলেমদারের অভিনয় করে চলেছেন, সেটা দেখছি।

—রেয়াজ করো দিকি! জৌনপুরী—ধরো ইলা!

ওপাশের যে মেয়েটি চুপ করে বসে ছিল তাকেই ফরমাস করেন বিজয়বাবু।

নিজেও গুনগুনিয়ে আলাপ করে চলেছেন। গাড়ী দাঁড়িয়েছে একটা ষ্টেশনে। ইলার গলার সুর ওঠে, তার সঙ্গে বিজয় মাষ্টারের গলার সুর মিলেছে।

নেত্যকালীবাবু গজগজ করে গাড়ীতে উঠে এল।

—কি দেশ রে বাবা কেবল খাবি আর খাবি, সেই সঙ্গে আছে বণ্ডা আর মশচাকুলি আর আসকে পিঠে।—কই গো একটু গরম কফি পেলাম, খেয়ে নাও দিকি।

সেই পুঁটলিগিন্নীও যন্ত্রচালিতের মত উঠে বসে কফির মগটা নিয়ে চুমুক মারতে থাকে, নেত্যবাবু হাঁ হাঁ করে উঠে।

-খালি পেটে ও বিষ গিলো না, ছটো বিস্কুট চিবিয়ে নাও দিকি। নেত্যবাবু সারা সংসারই সঙ্গে করে এনেছে। একটা বালতির ভেতর থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে গিন্নীর হাতে তুলে দিল।

কফি, ইটলি-ধোসার রাজ্য সুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই।

মাদ্রাজ পৌঁছবো দুপুরে।

মাষ্টারমশাই ওপাশে চুপ করে বসেছিলেন, কলকাতার কোন এক স্কুলের মাষ্টার ওই বিমলবাবু। বিয়ে থা করেন নি—নেশা ওই ঘুরে বেড়ানো। শান্তিপ্রিয় লোক—গাড়ীর একধারে চুপ করে বসেছিলেন, তাঁর কথা শুনেই নেত্যবাবু বলে:

—ভালোয় ভালোয় পৌঁছলে বাঁচি। বাব্বা পুরো ছদিন দুরাত্রি গাড়ীতে থাকা। দেখি আবার চান-টানের কি হয়।

রান্নাঘরের দিকে উঁকি মেরে বলে ঃ

—ও ঠাকুর, ভাত নামলো ? ম্যানেজারবাবুর কি এদিকে নজর নেই।

ট্যুরিষ্ট কোচ। সঙ্গেই রান্নাঘর। তবু ওই রাস্তার খানা বড় একটা খেতে হবে না। অবশ্য ব্রডগেজের রান্না গাড়ীতেই হবে, কিন্তু মিটার গেজেই আমাদের বেশী ঘুরতে হবে, সেখানের ব্যবস্থা—ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে।

অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হবে।

রিজার্ভ কোচ। ভিড় মাপা। ওয়ালটেয়ার পার হয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল, উর্বর এখানের মাটি। পাহাড়গুলো একটু দূরে সরে গেছে। ষ্টেশনগুলো সবুজ ক্ষেতেরও রূপ বদলেছে। অজস্র নারকেল গাছে কাঁদি কাঁদি নারকেল। ক্ষেতে আখের চাষ রয়েছে সর্বত্রই, ষ্টেশনেও আখ বিক্রি হচ্ছে—কালো কাজলী আখ। যেমন নরম আর তেমনি মিষ্টি রসাল।

আর ধান, বাংলার মাঠের চেয়ে সবুজ। একদিকে ধান পেকেছে—অন্যদিকে আবার জল দিয়ে নোতুন ধান গাছ পোঁতা হচ্ছে। জলের অভাব নেই। ক্যানেল থেকে ছোট ছোট নালা ভর্তি জল এসেছে মাঠের বুকে। তার থেকেই আসে জল—আর যেখানে তা নেই, সেখানে মাঠের মাঝে মাঝে ডিপ টিউবওয়েল বসানো। বিজলীর অভাব এদেশে নেই ; ছোট পল্লীতে অবধি সেই বিজলীর আলো এসেছে—সেই বিজলী গেছে মাঠে মাঠে। ছোট ঘর তৈরী করে গভীর নলকূপের পাম্প বসানো। তাই মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। নারকেল, আমগাছ ঘেরা কোন গ্রামসীমায় নামছে আবছা সন্ধ্যার অন্ধকার। গরুগুলো ঘরের দিকে ফিরছে। ওদের পায়ে পায়ে ধুলোর আবেশে শেষরৌদ্রের আভা পড়ে ফাগের বর্ণসমারোহের সৃষ্টি হয়েছে।

পথে একটা ষ্টেশন দেখলাম। তার বুকিং অফিস, মাল অফিস সব পোড়ানো। দরজা জানালা অবধি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মাসখানেক আগে অন্ধ্রের ছাত্রদের কীর্তি, ষ্টিলপ্ল্যান্ট-এর দাবীতে তারা এ ষ্টেশনও ভস্মীভূত করেছিল।

সেই পোড়া ষ্টেশনেই কাজকর্ম চলেছে। যাত্রীরা নামছে উঠছে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের অলঙ্করণ। ফুলের ওই ছোট ছোট গহনা ষ্টেশনেও বিক্রি হয়। এরা ফুল ভালবাসে তাই বোধ হয় যত্রতত্র এর ব্যবহার।

নিজেদের রং কালো, তাই শাড়ীতে ওদের বর্ণাঢ্য রং—খোঁপায় ফুলের রংবাহার। আমাদের বাড়ীর মেয়েরাও অনেকে ফুলের সেই শিরভূষণ কিনেছে।

বিজয় মাষ্টারও বলে—ইলা তোমাকে কিন্তু সত্যি মানিয়েছে হলুদ ফুলটা।

নেত্যবাবুরও চেষ্টার অন্ত নেই। আধবুড়ীর খোঁপাতেও ফুল উঠেছে। সব কিছু তার কেনা চাই।

ধানের কারবারী। আমতার ওদিকে তার নাকি ধান-পাট-এর রাখি কারবার। তাছাড়া শ্বশুরেরও বিরাট সম্পত্তির মালিক। লোকে বলে 'নেত্যকালী সরকার শ্বশুরের পয়সাতেই বড়লোক, তাই স্ত্রীকে তার এত খাতির যত্ন।'

ওদিকে বিজয় মাষ্টারের গানের কচকচি চলেছে।

—যাই বল হংসধ্বনি তার কর্ণাটিক রাগ হতে পারে, কিন্তু ওর চল এখন হিন্দুস্থানী ঢঙেও এসেছে। ওস্তাদ আমীর খাঁ—কানন সাহেব তো প্রায়ই গান।

বলে উঠি—এ কানন তো আর্কটের লোক।

ফ্যাচ করে ওঠে বিজয় মাষ্টার—আরে মশাই হোক না আর্কটের লোক, শিক্ষা-দীক্ষা তো কোলকাতাতেই, গিরিজাবাবুর ঘর—আমরা সবাই গুরু ভাই বুঝলেন, এক গুরুর ঘরে নাড়া বাঁধা। গাও দিকি—

বিজয় মাষ্টার সুর ধরে—লাগি লগন—উছঁ বেপর্দা মা পা হয়ে গেলেই ভূপালীর ঢং এসে যাবে।

ওদের সুরের রাজ্যে আমার প্রবেশ নিশেষ। তাই চুপ করেই গেলাম। সন্ধ্যা নামছে, অন্ধকার আকাশের বুকে তারাগুলো ফুটে উঠেছে। গাড়ীর একটানা শব্দে বাতাস কাঁপছে।

জানালার বাইরের দিকে চেয়ে থাকি।

মাদ্রাজ এখনও অনেক দূর। আজ সারারাত গিয়ে কাল দুপুরে পৌঁছাবো। বড় গাড়ী পৌঁছবে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে, সেখান থেকে যেতে হবে দক্ষিণের সব রেলপথের মূল সেই এগ্‌মোর ষ্টেশনে। মালপত্র গাড়ীতে তুলে তারপর কয়েকদিনের জন্য নিষ্কৃতি। সুরু হবে আসল ভ্রমণের পালা।

রাত অনেক হয়েছে।

বিমলবাবুই বলেন—কোলকাতা নয়, পলাশীর প্রান্তরেও নয়, বুঝলেন, ইংরেজ প্রথম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে এই মাদ্রাজেই।

প্রশান্ত এক কোণে চুপ করে বসেছিল। ওদিকে সরখেল গিন্নী কর্তার পাশেই বসে। কোনকালে নাকি ইস্কুল কলেজের গণ্ডী পার হয়েছিল—বর্তমানে চাকরী নিতে হয়েছে সংসারের চাপে। স্বামী ওই সরখেল মশাই দেখতে টিকটিকির মত।

স্ত্রীর আশেপাশে মাঝে মাঝে ঘোরে, এটা সেটা ফরমাইস করে খাটে মাত্র, কিন্তু বিজলী সরখেলের ধমকে আবার সরে আসে। বিজলী সরখেলও কথাটায় সায় দেয়।

—তা সত্যি। ফরাসী আর ইংরেজ তো প্রথমেই এখানে আসে, এই দক্ষিণে।

শুধরে দিই—তা নয়, তার আগেও আসে পর্তুগীজরা। মাদ্রাজে তারাই প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। মাদর নামে কোন পর্তুগীজের নাম থেকে মাদ্রাজের উৎপত্তি।

বিমলবাবুর আলোচনাটা ভালো লাগে। ভদ্রলোকের ইতিহাসে জ্ঞান আছে, বলতেও পারেন ভালো, তিনি বলে চলেছেন।

—ইংরেজ প্রথমে আসে সুরাটে, তারপর মাদ্রাজের মসলীপত্তনে।

সেখানে শুধু কুঠি স্থাপনের অনুমতি পেয়েছিল—তারপর তারা ব্যবসা পত্তন করে অরম গায়ম-এ। কিন্তু সেখানের ব্যবসায় তেমন যুৎ করে উঠতে পারেনি। নানা গোলমাল বাধলো, অরম গায়ম-এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন ফ্রান্সিস ডে—তিনি বেশ চালু লোক। মাদ্রাজের কাছে সেণ্ট থম-এর আশে পাশে তখন পর্তুগীজদের আস্তানা গড়ে উঠেছে। সে অঞ্চলকে বলে ময়লপুরম। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পর্তুগীজ ধর্মযাজক সেণ্ট টমাস এদেশে এসেছিলেন, তিনি মাদ্রাজ থেকে ন'মাইল দূরে একটা পাহাড়ের কাছে ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন, পর্তুগীজ তাঁকে সমাধিস্থ করে বর্তমান ময়লপুরম-এর সেণ্ট থম গির্জায়। তাকে ঘিরেই পর্তুগীজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

ফ্রান্সিস ডে ময়লপুরের ওপাশে বেশ খানিকটা জায়গা তখনকার চন্দ্রগিরির রাজা দ্বিতীয় রঙ্গের কাছ থেকে পত্তনি নিলেন। চন্দ্রগিরির রাজাদের তখন ভগ্নদশা। সারা দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় বিজয়নগর রাজবংশের প্রভূত অবদান ছিল, সেই চন্দ্রগিরি রাজবংশের বংশধররাই ১৬৪৫ খ্রীঃ ফ্রান্সিস্ ডে-কে মাদ্রাজ পত্তনের খানিকটা জায়গা ইজারা দেন। এই নিয়ে এক ইংরেজ লিখেছিলেন:

"The Raja was an obscure representative of a magnificient Indian Empire of the past ; Mr. Francis Day was an obscure representative of a magnificient Indian Empire that was yet to be ; and the document that the Raja handed over to Mr. Francis Day was in reality a patient of empire transferred from Vijianagar to Great Britain. It was at Chandrigiri that British Empire in India was begotten, it was a Madras that the British Empire was born."

তাই বলছিলাম মাদ্রাজেই ইংরেজরা প্রথম পায়ের তলে একটা দাঁড়াবার মত মাটি পায়।

—চন্দ্রগিরি কোনখানে ?

মাষ্টারমশায় জবাব দেন—মাদ্রাজ বাঙ্গালোরের রেলপথে কাঠগাদি জংশন থেকে রেনিগুণ্টা যাবার পথে পড়ে। এখন সেটা ছোট একটা গ্রাম মাত্র।

ট্রেনটা অন্ধকার ভেদ করে চলেছে। ওদের কলরব থেমেছে। সুরের কাকলিও স্তব্ধ। ইলা ইতিমধ্যে এসে বসেছে এইখানে। ট্রেনের অল্প আলোয় চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের ইতিহাসের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা।

প্রত্যেক দেশেরই ইতিহাস আছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি-শিল্পকলার অভ্যুত্থান বিবর্তনের একটি ধারাপথ ছাড়াও থাকে রাজ্যের ওঠাপড়ার কাহিনী।

দক্ষিণভারতের বিস্তৃত ইতিহাসেও বহু রাজা বহু সভ্যতার ধারা পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজ আসবার আগে সেখানে রাজত্ব করেছে পল্লব, চোল, চালুক্য, বিজয়নগর রাজবংশ মাদুরার নায়ক রাজবংশ অনেকেই দ্রাবিড় সভ্যতাকে তাঁরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

এক রাজ্যের পর অন্য রাজবংশ এসেছে—তাঁরা তবু সেই আগেকার সম্পদকে ক্ষয় করে নি, শিল্পকলার আরও উন্নতিবিধানই করেছেন। দক্ষিণভারতের বিভিন্ন প্রস্তর শিল্পের থেকে আকাশস্পর্শী মন্দিরের গোপুরমে শিল্পশৈলী উন্নতির সেই বিবর্তনের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। দক্ষিণ থেকে সেই শিল্পকলা আরও সার্থকতা লাভ করে উত্তরাপথের দিকে এগিয়ে, বেলুর—শ্রবণ বেলগোলা থেকে ইলোরায় তার সার্থক পরিণতি।

কিন্তু সেই ধারাপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায় এই পতুর্গীজ ফরাসী এবং ইংরেজ বণিকদের আগমনে। উত্তর ভারতের বহু শিল্প সম্পদ মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে, দক্ষিণ ভারতে সেই ধ্বংসটা বিশেষ হয় নি।

কিন্তু সেই শিল্পশৈলীর ধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে আজকের দিনের সঙ্গে সেই যোগসূত্রের কোন বাঁধন নেই।

বিমলবাবু মাথা নাড়েন।

—তা সত্যি! সেই শিল্পশৈলীর মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। সেটা কাঞ্চিপুরমে গিয়েই মনে হবে। একটা অতীতের গৌরবময় জীবনযাত্রার ধারা—কোন অভিশাপে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজকের জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

বিজলা সরখেল বলে—তবে কাঞ্চীভরমের শাড়ী কিন্তু বেশ নাম করা।

ওরা শাড়ী গহনাই চেনে বোধ হয়। মুখে এমনিতে চকচকে পালিশ, চোখে ওদের অন্য জগতের নেশা। এই ট্রেনের ধকলেও দেখলাম মুখের পালিশ এখনও ঠিক আছে, আর শাড়ীও ঠিক বদলেছে।

সুরপতি এদিকে বেশ রসিক ছেলে, পুলকের মত মুখচোরা নয়। সে আড়ালে ফোড়ন কাটে।

—দেখবেন দাদা, ওসব সাজা-ময়ুর দক্ষিণের ধকলে তিনদিনে দাঁড়কাক হয়ে যাবে। রূপ বের হয়ে পড়বে।

ওকে থামিয়ে দিই।

বিমলবাবু বলে চলেছেন ইতিহাসের সেই কথাগুলো।

—মাদ্রাজ পত্তনে জায়গা পাবার পর ইংরেজ মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে গড়ে তুলতে লাগলো তার কোম্পানীর অপিস-কর্মচারীদের বাসভবন। ব্যবসা বাড়তে লাগলো—তারাও এইবার স্ূঁচ থেকে ফালে পরিণত হতে লাগলো। বসতির চারিদিকে কেল্লার মত প্রাচীর—পরিখা একদিকে নদীর একটা ধারা দিয়ে সুরক্ষিত করে তুললো। ১৬৫৩ খ্রীঃ এই দুর্গের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল, তাই সেটি জর্জের নাম অনুসারে এই কেল্লায় নামকরণ করেছিল তারা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ।

১৭৪৬ খ্রীঃ মধ্যে ফরাসীরা এটা দখল করে নেয়, কিন্তু বছর তিনেক পর আবার ইংরেজ মাদ্রাজ ফিরে পায়, ক্রমশঃ তারা এইবার হাত-পা মেলতে চেষ্টা করে। এইসময় গোলকুণ্ডার নবাবের কাছ থেকে

ইংরেজ নামমাত্র খাজনায় তিরুঅল কেন্‌নি অঞ্চলের পত্তনি নেয়—ক্রমশঃ তারা সেটাকে গ্রাস করে ফেলে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে আরও জায়গার পত্তনি নিয়ে ইংরেজরা বেশ গড়ে বসল। এই ফোর্টেই ক্লাইভও বেশ কিছুদিন ছিল। এই ফোর্টের গির্জার খাতায় ক্লাইভ আর মার্গারেট মাস্‌কেলিনের বিবাহের নজীরসইও আছে। ১৭৫৩ খ্রীঃ তাদের এই বিয়ে হয়েছিল ফোর্টের ভিতর সেন্ট মেরীর চার্চে। এশিয়ার মধ্যে এটা অন্যতম পুরোনো গির্জা।

মাদ্রাজ, ইতিহাস পুরাণের অনেক সাক্ষী এর সমুদ্র-তীর। দক্ষিণের দ্বারই বলা চলে তাকে।

রাত্রি হয়ে আসছে, আলোয় ভরা রাজমহেন্দ্রী শহর পার হয়ে গাড়ী উঠছে পুণ্যতোয়া গোদাবরীর সেতুতে। অন্ধকার আকাশে একফালি চাঁদ উঠে আছে, তারই একটু আভা পড়েছে নদীর বিস্তৃত বুকে বিশাল সেতু, নীচে পূর্ণা গোদাবরী।

চাকায় চাকায় শব্দ উঠেছে—ফাঁপা যান্ত্রিক একটা শব্দ। বিজয় মাষ্টারের চোখ পড়ে ইলার দিকে। ইলা একপাশে বসে আমাদের কথাগুলো শুনছিল, বিজয়বাবু বলে। —রাত হয়েছে শোও গে।

ইলার মুখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে চকিতের জন্য। বলে—যাচ্ছি। রাত এমন হয় নি।

ওদিকে নাচিয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তখনও মাঝেমাঝে কথাকলি ভারত-নাট্যমের বুলি কপচাচ্ছে, সে কোন আসরে বাজীমাৎ করেছে তারই কাহিনী চলেছে। ইলা চুপ করে উঠে গেল ওপাশের বেঞ্চের দিকে।

সুরপতি গজ গজ করে—ওই মাষ্টারের সবতাতেই মাষ্টারি। বুঝলেন দাদা, ও এসেছে এদেরই পয়সায়, আবার ওদের উপরই ডাঁট নিচ্ছে।

অনেক প্রতীক্ষার পর মনে হয় এ পথের শেষ হোক, আনন্দেও ক্লান্তি আসে। বিচিত্র পথ পরিবর্তনের আনন্দও তখন বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

তাই মাদ্রাজ এগিয়ে আসতে খুশী হই। গুডুর ষ্টেশনেই স্নান সেরে নিয়েছি। সকালের আলো তখন গাছ-গাছালির মাথায়। বেশ বড় ষ্টেশন। তবে খাবার মধ্যে ওই কফি, ইডলি আর ধোসা।

এর পরেই শুরু হবে কয়েকটা ষ্টেশনপর মাদ্রাজের সীমানা। মাঠ আর মাঠ—মাঝে মাঝে গাছগাছালির পর সুরু হল ঝাউ বন। কালো পুঞ্জ পুঞ্জ পাতাগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে, সুরু হয় সাদা বালির স্তূপ—মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল খাড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছে এই দিকে।

নীল সমুদ্রকেও দু-একবার দেখা গেল, অসীম অনন্ত সেই উদার নীল বিস্তার—ঢেউগুলো সাদা রেখায় ফাটছে। মাদ্রাজ আসতে আর দেরী নেই।

দীর্ঘ দুদিনের পব এই বৈচিত্র্য—ক্ষণিক বিরতির স্বাদ ভালোই লাগে মনে মনে। তাই মাদ্রাজ শহরের দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকি।

মালপত্র লটবহরও গুছোতে হয়, এখান থেকে যেতে হবে এগমোরে। সেইখান থেকেই দক্ষিণ যাত্রার আসল পালা সুরু—এতো মুখবন্ধ মাত্র।

মাদ্রাজ এক্সপ্রেস সগর্জনে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে ঢুকছে।

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশন থেকেই ব্রডগেজের সব গাড়ী ছাড়ে, বোম্বাই ব্যাঙ্গালোর দিল্লী কলকাতার দিকে. যাবার এইটিই মূল ষ্টেশন। ওপাশেই সাদার্ন রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার, রাস্তার ওপারে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতাল, ও-দিকে মিন্ট রোড। মাদ্রাজের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য স্থান। আশপাশে ছোটবড় নানা হোটেল লজও আছে। এখনও জাতিপ্রথার কিছুটা কড়াকড়ি আছে বোধ হয়। তাই পথেঘাটেও চন্দন না ভস্মতিলক দেখা যায় আধুনিক সাজে সজ্জিত ছেলেমেয়েদের কপালেও।

তা ছাড়া হোটেল-কফিখানার নামও বিচিত্র। Brahmin's Lodge, Brahmin's Coffe House ইত্যাদি। অধিকাংশই নিরামিষ হোটেল। খাদ্যের মেনুও সীমিত, না হয় সেই এক ফর্মুলায় বাঁধা।

কফির সঙ্গে বণ্ডা না হয় বিস্কুট—বড়জোর কেজুভাজা—না হয় পটেটো চিপ্‌স্‌-এর মত গোল গোল কাঁচকলা ভাজাও মেলে। আর লাঞ্চ বলতে শাদম্‌-শম্‌বরম্‌, রসম্‌ পাপড়ম্‌ আর মোর অর্থাৎ ঘোল জাতীয় একটা পদার্থ তাও মশলা কারিপাতা দিয়ে সাঁতলানো। এর সঙ্গে একটু 'নেই' অর্থাৎ ঘি, তবে তার স্বাদগন্ধও বিশেষ পাই নি।

এর উপর যদি বট্‌টানি কারি—মটরের তরকারি, না হয় উরুকায়, একটু আচার যদি হয় সে তো গ্রাণ্ড ফিষ্ট। সবসমেত খর্চা পড়বে পঁচাশি পয়সা থেকে এক টাকা পাঁচ পয়সার মধ্যে।

তবে কফি এককাপ সাধারণতঃ পনের পয়সা—ষ্টেশনের রেলওয়ে কাটারিং-এর অখাদ্য জলবৎ কফি এবং একটা কলাই-এর বণ্ডার জন্য আপনাকে দিতে হবে বাইশ পয়সা আর পনেরো পয়সা। অতিরিক্ত দাম।

মাদ্রাজ সেণ্টাল ষ্টেশন তবু বেশ ঝকঝকে—দোতালায় আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম—ওপাশে রেস্তোরাঁ আর একদিকে রিটায়ারিং রুম। ব্যবস্থা মন্দ নয়।

তবে থার্ডক্লাস যাত্রীদের জন্য পায়খানা আর স্নানের ব্যবস্থা অতি জঘন্য, তার তুলনায় আমাদের হাওড়া, শিয়ালদহ ষ্টেশনের ব্যবস্থা অনেক ভালো বলেই মনে হ'ল।

ষ্টেশনের বাইরেই পুন্নমালাই হাইওয়ের সুরু। একটা খাল বয়ে চলেছে, ব্রিজের উপর দিয়ে—পার হয়ে চললাম এগ্‌মোর ষ্টেশনের দিকে। এইখানকে ওরা বলে নর্থ রিভার—কেউ কেউ বলে কোকরেণ ক্যানেল। এই খাল আর কুয়মনদী মাদ্রাজ শহরের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। অনেক সেতু একে বহুবার অতিক্রম করেছে।

পথে দেখি সাদা জিনের পাঞ্জাবী আর খাঁকি প্যাণ্ট পরা পুলিশ পায়ে পট্টির নীচে শ্লিপার আর হাতে একটা টিনের পাতে Stop লেখা বড় চাকতি। সেইটা ঢালের মত এদিকে ওদিকে দেখি ট্রাফিক কনট্রোল করছে।

পথের লোকজনও বেশ আইন মেনেই চলছে, আমরা কোলকাতার লোক। একটু গো এজ ইউ লাইকে অভ্যস্ত। সরাসরি পথের উপর দিয়েই চলেছে।

পরক্ষণেই মনে হ'ল ব্যাপারটা এখানে বে-আইনি তো বটেই অশোভনও। অযথা পথে কেউ নামেনি, ফুটপাথে উঠে এলাম।

পাশেই মূর মার্কেট। বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ীটা আশেপাশেও দোকানের সারি। রকমারি সব জিনিসই মেলে ব্যাঙ্গালোর কাঞ্চিভরম, মাদুরা, ক্যান্নানোর সব জায়গারই শাড়ী, টেরিলিন জামা, প্যান্ট ইত্যাদিও মেলে। তবে রীতিমত দরাদরির ব্যাপারই চলে সেখানে।

সে হাঁকল পঁচিশ টাকা, টোয়েনটি ফাইভ রুপী, আপনি সেখানে হিয়া খোলসা করে কবুল করেন।

—টেন চিপ্স্।

কষাকষি মাজামাজি করে দাঁড়াবে পনেরো টাকায়। তবে এ বাজারের জিনিস হয়তো সস্তা—কিন্তু তার মান কি হবে সেটা ঠিক জানা নেই।

আর একটু এগিয়ে এলেই পড়বে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের বিরাট সীমানা ঘেরা বাড়ীটা এখনও রিবণ বিলডিং নামেও পরিচিত।

সামনে বেশ খানিকটা বাগান; ঘাসের বুকে ফুলের সমারোহ, মাদ্রাজ শহরে এখনও খোলা মেলা জায়গা, প্রচুর গাছপালা আছে। সাধারণতঃ ঘিঞ্জি শহর এ নয়। বেশ সাজানোই। তবে দু'একটা ঘিঞ্জি অঞ্চল আছে সে যার শহরেই থাকে। বস্তি আর দরিদ্রপল্লী সেও তো শহর জীবনের অভিশাপই।

মিটার গেজের গাড়ীতে এবার উঠতে হবে।

শহরের মধ্যেই এই ষ্টেশন—বিরাট সাইডিং, শেড ইত্যাদি। একপাশে মাদ্রাজ বিচ থেকে ভালবরম্ অবধি দু বগির ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেন চলেছে তাও মিটার গেজের। ছোট হলেও চলে বেশ জোরে। মাদ্রাজের ট্রামের কাজ করে চলেছে ওরা।

মফঃস্বল থেকে যাত্রীরা ওতে করেই একেবারে শহরের আপিস পাড়ার কাছে এসে নামে। ওখানের ট্রামকোম্পানাকে নিয়ে নানা গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল—তারপর ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়।

বোম্বাই-দিল্লীর ট্রামও আর নেই। এখন টিকে আছে একমাত্র কোলকাতাতেই।

এগমোর ষ্টেশনের রূপ আলাদা।

মিটার গেজের গাড়ী হলেও এর গতি মন্দ নয়, ইঞ্জিনগুলোও বেশ বড়সড় এবং জোরদার। এখান থেকেই রামেশ্বর এক্সপ্রেস টিউটি কোরিণ মেল—মাদুরা এক্সপ্রেস—ইত্যাদি সারা দক্ষিণের ট্রেন ছাড়ে।

একটা কোচের ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়েছিল। ব্যাঙ্গালোর টাইপের কোচ—এপাশের সিঙ্গল সিটগুলো তাতে নেই—ওটা প্যাসেঞ্জ। অপেক্ষাকৃত কম পরিবার বলে এ গাড়ীর ওই ব্যবস্থা।

মালপত্র তুলে গুছিয়ে নিয়ে বের হলাম মাদ্রাজ ঘুরতে।

ষ্টেটবাসও শহরে যথেষ্ট—বেশ ঘনঘনই যাতায়াত করছে তারা, আর সব চেয়ে আশ্বাসের কথা কোলকাতার মত এমন কুঁচকি কণ্ঠায় ঠাসা তারা নয়, ওঠা যায়।

তবু ট্যাক্সি নিলাম। ছোট বড় দু'রকমের ট্যাক্সিই মেলে। ছোটতে তিনজন, বড় গাড়ীতে পাঁচজনের জায়গা। তবু দেখলাম এখানে শুধু এ্যামবাসাডারই নয়, তা ছাড়া শেভ্রলে, হাডসন এ সব গাড়ীও ট্যাক্সি হিসাবে চলছে।

চশমার ফ্রেমটা বদলানো দরকার, তাই ট্যাক্সিওয়ালা রঙ্গস্বামীই নিয়ে গেল প্রথমে মার্শাল ষ্ট্রীটে এক চশমার দোকানে, ডাক্তারের কারিগর একজন মহিলা, তিনি চশমার ফ্রেম দেখাতে বললেন মার্শাল ষ্ট্রীটের ঐতিহ্যের কথা।

ওপাশেই মার্শাল ষ্ট্রীটে ভারতবিখ্যাত একজন কানের ডাক্তার থাকেন, তার এয়ার কনডিশন করা অপারেশন থিয়েটার—বিরাট নার্সিং হোমও দেখলাম। এখানে আমার পরিচিত দু'একজন ভদ্রলোকও

কান অপারেশন করিয়ে গিয়েছেন কলকাতা থেকে এসে—তাই নামটা দেখেই মনে পড়ল কথাটা।

ওদিকে দেখি বিজলা সরখেল—নেংটি ইন্দুরের মত কটাকে গাড়ীর পিছনে বসিয়ে—আমাদের অন্যতম সহযাত্রী চিত্ত মল্লিক আর কাকে নিয়ে বের হয়েছে।

পরেই দেখা যায় বিজয় মাষ্টার চলেছে তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। টাক্সিতে বসেই হাত মাথা নাড়ছে। সুর বলে,—বিজয়বাবু আমাদের নটবর শ্যাম, বুঝলেন দাদা। কেষ্টোর ছিল ষোড়শ গোপিনী, এর—

—থাম না!

সুরপতি থেমে গেল। বিমলদা বলেন—বলতে দাও ভায়া, ওসব অক্ষমের হিংসা বুঝলেন না?

—আর আপনার? সুরপতি গজগজ করে।

বিমলদা বলেন—ওসবে আর রুচি নেই ভায়া।

অবশ্য সব কথাবার্তাই এখানে চালানো নিরাপদ। একবর্ণ বাংলাও এরা বোঝে না। ভাষার সমস্যা আর খাওয়ার সমস্যা দক্ষিণে বড় সমস্যা।

ওরা শহরে তবু ইংরাজী বোঝে কিছু কিছু, হিন্দীও বোঝে তবে মনে হল বিশেষ বলতে নারাজ—কিন্তু বাংলা মোটেই বোঝে না। মাদ্রাজে তবু চালানো যায় কিন্তু আরও ভেতরে গেলে কথা বোঝানোর সেই আদিম রীতি অর্থাৎ ইশারাতেই আসতে হয়।

চশমার ফ্রেম হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বেশ সহজ ভাবেই তার ভাষায় হড়ং বড়ং করে বকে চলেছেন চশমাটা আমার চোখে চাপিয়ে দিয়ে। বলি—ব্রিজটা একটু লাগছে।

কে বোঝে কার কথা—ইংরাজীও তিনি বোঝেন বলে মনে হ'ল না। ডাক্তারও নেই। ইশারায় দেখাই চেপে ধরেছে ব্রিজটা—ইনি দুবার ঘাড় নেড়ে চশমাটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে আবার যখন ফিরলেন তখন দেখি চশমা নাকেই আর ঢোকে না। আরও কস্ মেরেছেন।

শেষকালে রাস্তার এক ভদ্রলোককে ধরে এনে তার সাহায্যে কথাটা ঠিকমত বোঝালাম ইংরাজীতে।

তখন ভদ্রমহিলা একবার ঘাড় নেড়ে চশমাটা ঠিক ধরে আনলেন।

বেলা পড়ে আসছে, এমনিতে ডিসেম্বর মাস—কোলকাতার তুলনায় শীত এখানে অনেক কম। বেশ গরম লাগছে।

এই ভাষার বিভ্রাট নিয়ে দক্ষিণভারতে পদে পদে বাধা পেয়েছি। অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষা তেলেগু, মাদ্রাজের ভাষা তামিল, ব্যাঙ্গালোর মহীশূর অঞ্চলে বলে ক্যানারি—আর কেরলে বলে মালয়ালম, একা দাক্ষিণাত্যে এই চারটে ভাষা পাশাপাশি বলে।

সুতরাং এক ভাষার দু চারটে চলিত কথা শিখলেও তা দিয়ে অন্ধ্র-প্রদেশে কথা বলে না। তাই অসুবিধায় পড়তে হয়।

অবশ্য ক্রিশ্চান এ অঞ্চলে অনেক বেশী, শহর ঘেঁষা জায়গায় ইংরাজী জানা লোক মেলে, তাই দিয়ে কাজ চলে যায়। কেরালায় শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেশী। ইংরাজীও জানে অনেকে। পথেঘাটে স্কুলের ছত্রছাত্রীরাও তাই সাহায্য করে। এভাবে অনেকবার সাহায্য পেয়েছি।

মাউণ্ট রোডের কর্মব্যস্ত অঞ্চল দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ীখানা মাদ্রাজের মেরিণা বীচের দিকে। বেশ ঝকঝকে পথ—দোকানপাটও সাজানো। ষ্টেটবাসগুলো অধিকাংশই প্যারিস কর্ণার থেকে এই দিক হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে চলেছে।

মাদ্রাজ শহরের মধ্যে প্যারি কোম্পানী অন্যতম একটি বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। একটি বড় বাড়ীতেই তাদের বিভিন্ন অফিস—সেইখান থেকেই বাসগুলো অনেক ছাড়ে।

শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে কুয়মনদী পার হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি বীচের দিকে। বাঁ পাশে দেখা যায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ ওপাশেই আকাশ আর নীল সমুদ্র এক হয়ে মিশেছে দিগন্ত রেখায়—নীলসমুদ্রের বুকে উত্তরোল ঢেউ-এর মাতামাতি—প্রশস্ত রাস্তার উপর শহরের

কোলাহলের বাইরে লালরঙ-এর বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বাড়ীগুলো দেখা যায়—ওপাশে গাছের বেষ্টনীর পরই সুরু হয়েছে মেরিণো বীচের হলুদবালির প্রশস্ত প্রান্তর সেটা শেষ হয়ে গেছে সমুদ্রের জলরেখায়।

এত প্রশস্ত বেলাভূমি পৃথিবীতে বিশেষ কোথাও নেই। বেলাভূমিতেও নিওন লাইট দিয়ে সাজানো। ওপাশে মাদ্রাজ সুইমিং পুল, এখানে সকলেই স্নান করতে পারে অবশ্য পঞ্চাশ পয়সা ফি দিলে।

মাদ্রাজ শহরের সাধারণ সভা, ভাষণ ইত্যাদি অনেক এই বীচেই হয়। বিরাট ময়দান গোছের। তবে ঘাস নেই বালিই। সেখানে হাজারো নরনারী ছেলেমেয়েদের ভিড়। মোমফালি কাজুবাদাম ইড্‌লি বড়া কফি সবকিছুই মেলে—ওপাশে জেলেদের বস্তিও গড়ে উঠেছে। বর্তমানের দর্শনীয় বস্তু পড়ে আছে বীচে—একটা মস্ত সমুদ্রগামী জাহাজ। মাসখানেক আগেকার সাইক্লোনে ওই জাহাজটাকে ঠেলে এনে একেবারে ডাঙ্গায় বালিতে গেড়ে দিয়ে ওকে বিকল অকেজো করে দিয়েছে। বহু চেষ্টা করেও ওকে আর জলে নামানো সম্ভব হয়নি, সেই নিদারুণ ঝড়ের নীরব সাক্ষী হয়ে সে পড়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

ট্যাক্সীওয়ালা রঙ্গস্বামী বলে।

—ওটাকে নাকি ওজনদরে এইবার বিক্রী করা হবে।

মেরিণো বীচে নামবার রাস্তার ধারে দেখলাম ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তৈরী দুটি বিখ্যাত ব্রোঞ্জের কার্য একটি গান্ধীজীর মূর্তি—ঠিক কোলকাতার মূর্তির মতই অন্যটি তার প্রখ্যাত ভাস্কর্যের নিদর্শন—শ্রমের মর্যাদা। তিনটি মানুষ, তাদের কর্মরত মূর্তি, পিছনে সেই অন্তহীন সমুদ্র—তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বিরাট শিল্পকর্ম একটি শাশ্বতসত্যে পরিণত হয়েছে।

মেরিণো থেকে এই বেলাভূমি চলে গেছে রাস্তার পাশাপাশি একেবারে ট্রিপলিকেন পর্যন্ত। প্রায় তিন মাইল লম্বা এর পরিসর কমেছে সেন্ট থোম গির্জার কাছে গিয়ে।

গাড়ী রাস্তায় রেখে এবার সোজা সেন্ট থোম গীর্জার পাশ দিয়ে আবার বীচে গিয়ে নামলাম। নামবার মুখেই ওই গীর্জার পাশেই একটা জাহাজের মাস্তুল মত খাড়া করা ওটা নাকি সেন্ট থমাস যে জাহাজে এসেছিলেন তারই মাস্তুলের স্মারকচিহ্ন, বিরাট বিদেশী কাঠের সেই মাস্তুল সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় আর কালের স্পর্শ আজ প্রস্তরীভূত হয়ে আসছে। কতকাল ওর বয়স তা কে জানে।

আশেপাশে খ্রীষ্টানদের বসতি, অনেক কালের পুরোনো এই অঞ্চল। পর্তুগীজদের প্রথম বসতি গড়ে ওঠে এই ময়লাপুর অঞ্চলেই।

বীচে এসে ফেটে পড়েছে সমুদ্র। জল এখানে গভীর বলেই মনে হয়। ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর এখানে মারমুখী।

বিমলদা বলেন—কি ভায়া বসে বসে ঢেউ গুণবে? আশেপাশেই তো কপালেশ্বর শিব আর পার্থসারথীর মন্দির, ও দুটো দেখবে না? জবাব দিই—এসেছি যখন নিশ্চয়ই দেখবো। তবে কি জানেন, আধুনিক শহরে ওই ধর্মের ব্যাপারটা কেমন যেন গৌণ, মুখ্য এখানে আজকের জীবন! কালিঘাটের মাহাত্ম্য কলকাতার আধুনিক জীবনের আলোর নীচে কি কালো হয়ে যায় নি? হাসেন বিমল দা।

তবে কি জানো, মাদ্রাজে সারা দক্ষিণ দেখবে এরা আধুনিক বিজ্ঞানকে মেনে নিলেও অন্তরের দিক থেকে এখনও দেবতাকে হয়তো একটু বেশী শ্রদ্ধাই করে। মনে প্রাণে এরা এখনও সাবেকী সেকেলে রয়ে গেছে, তাই বোধ হয় ভালোই আছে।

কথাটা নিছক মিথ্যা নয়। এখানের পথেঘাটেও দেখেছি সেই ভাব। এরা দেশী পোষাক—সেই লুঙ্গির মত ধুতি পরেন তার উপর সার্ট, কোট এমনকি টাইও পরেন, কপালে চন্দনের তিলক—কাঁধে একটা তোয়ালে, তাতেই অফিস কাছারিও করেন।

লাখপতি কি সাধারণ মানুষ অনেকেই এই পোষাকে চলাফেরা করেন। এমন কি একদিন ওদেশে প্রখ্যাত অভিনেতা শিবাজী

গণেশনকেও দেখেছিলাম ত্রিরুচিরাপল্লীর কাছে এক মন্দিরে ঠিক ওই পোষাকেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শহরের আলো জ্বলে উঠেছে। এগিয়ে চললাম কপালেশ্বর শিবের মন্দিরের দিকে। বিমলদাই বলে চলেছে।

—পুরাণে আছে পার্বতী এখানে ময়ূরের রূপ ধরে শিবের আরাধনা করেছিলেন। তবে এখন কোন ময়ূরই এখানে দেখতে পাবে না।

কর্মব্যস্ত শহরের এক পাশে মন্দির, পিছনেই পুষ্করিণী। চারিদিকে তার ধাপ উঠে গেছে। লোকজন এই পুষ্করিণীতে স্নান করে দেবতার পূজো দিতে যায়। দু পাশে মাথা তুলেছে বেশ উঁচু প্রবেশ পথ। দক্ষিণের মন্দির শৈলীর অন্যতম রীতি নিদর্শন এই গোপুরম আর ওই পবিত্র পুষ্করিণী—তেরাপীকুল্যম, তা এখানেও রয়েছে।

মন্দিরের একপাশে ওই ময়ূররূপে পার্বতীর সাধনার ছবিও পাথরে আঁকা রয়েছে। গোপুরম পার হয়ে চত্বরের পর মূল মন্দির। চারি দিকের দেওয়ালে পাথরের কারুকার্য। মন্দিরের দেবতা মহাদেব।

ভক্তজনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময়ও পূজার আয়োজন চলেছে।

এখান থেকে এলাম পার্থসারথীর মন্দিরে। শিব এবং বৈষ্ণব দুই মতেরই সাধনা চলে এই দক্ষিণ ভারতে। বৈষ্ণবরাও বেশ প্রতিষ্ঠাবান।

পার্থসারথীর মন্দিরের ওপাশেও তেমনি ঘাট বাঁধানো পুষ্করিণী জলের মাঝখানে একটা মন্দিরের মত—ওখানে বিশেষ পূজার সময় দেবতার জলবিহার হয়।

ওপাশেই মূল মন্দিরের প্রবেশ দ্বার, এখানেও সেই গোপুরম। দ্রাবিড় সংস্কৃতির নিদর্শনেই তৈরী। বাইরে ছোটখাটো দোকান-পসার। কেউ দেবতার পূজার উপকরণ নিয়ে বসেছে—একটা ডালায় নারকেল, কলা এবং ফুলের মালা আর ধূপ, এই দিয়েই ওরা দেবতার পূজো দেয়।

মন্দিরের গোপুরম পার হয়ে একটু গেলে মূল মন্দির, দেবতার সামনে পর্দা ফেলা, পূজা চলেছে দেবতার। দর্শনও পেলাম।

এ মন্দিরের জাঁকজমক আছে। পূজারী ভক্তের সংখ্যাও বেশী। দেবতার মূর্তি দেখে মনে হ'ল আমাদের ধারণায় যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী সুন্দর সুঠাম দেবতা ইনি তা নন। প্রস্তরমূর্তি—তবে মনে হল অনেক পুরাতন মূর্তিই। এর শিল্পীশৈলীও একটু অতীত কাল ঘেঁষা। এখানে তাঁর মূর্তি বেশ রুক্ষ কঠোর। দেবতার অনুরূপ ধাতুমূর্তিও আছে, তাকে বলা হয় ভোগমূর্তি। বাইরে পূজার সময় সেই মূর্তিই আনা হয়। দর্শনপ্রার্থী জনতার অনেকেই দেখলাম দেবতার সামনে ঘটা করে পূজো দিচ্ছে, কেউ বা লাফ দিয়ে নাচছে দেবতা দর্শনের আনন্দে।

মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম।

ঘিঞ্জী বসত এখানে। রাস্তাও সরু। সুরপতি বলে,—এ একেবারে আমাদের বাগবাজার পাড়া বুঝলেন দাদা, মাদ্রাজের আদি এবং অকৃত্রিম অঞ্চলই বলতে পারেন। নিন। হাতে তুলে দেয় ক'টা বড়াভাজা।

—ঠাণ্ডা যে রে? তায় বাদাম তেলে ভাজা—

সুরপতি বলে গরম তো—সেই সকালে ভাজে সারাদিন ওই ভাজাই খায়। বাদাম তেলে ভাজা বড়া—সঙ্গে একটু ডাল বাটা মত তাতে কারিপাতা আর কাঁচালঙ্কা মেশানো। পবিত্র ড্রাইভার বলে—বাদাম তেল মাদ্রাজের সর্বত্রই, কেবল কেরলের দক্ষিণ দিকে দু'এক জায়গায় নারকেল তেল পাবেন।

খাওয়া গেল না। বড়াগুলোয় দু'এক কামড় দিয়ে ফেলে দিতে হ'ল।

গাড়ী চলেছে শহরের পথ দিয়ে। মাউণ্ট রোড হয়ে চলেছি আমরা ত্যাগরাজ নগরের দিকে।

—বেঙ্গলী ক্লাবে যাবো। চেনো তো?

ট্যাক্সি ড্রাইভার মাথা নাড়ে—ইয়েস। কামরাজের বাড়ীর কাছে। মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগরেই তাঁর বাড়ী।

শান্ত শহরতলী এলাকা। ছোট ছোট সুন্দর বাগান-ঘেরা সাজানো বাড়ীঘর—ওরই একপাশে বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে মাদ্রাজের বেঙ্গলী ক্লাবের নিজস্ব বাড়ী, পাঠাগার থিয়েটার হলেও প্রায় সাত আটশো লোক ধরে, ওপাশে টেনিস লন।

সেদিন সন্ধ্যায় বেঙ্গলী ক্লাবের সভ্যদের একটা অনুষ্ঠানও ছিল, গিয়ে পড়তে তারাও খুব খুশী হলেন। সিঙ্গাড়া, রসগোল্লাও এসে গেল।

—রসগোল্লা! এখানে?

সম্পাদক মশাই বলেন—কলকাতায় তো বন্ধ, আমরা এখানে ম্যানেজ করেছি। দেখুন না—বেশ ভালো জিনিসই তৈরী হয়।

বেশ কিছু সংখ্যক বাঙ্গালীই আছেন এখানে, পোর্টের একজন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গেও পরিচয় হ'ল। হঠাৎ দেখা পেলাম আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু ভূতপূর্ব অধ্যাপক সত্য ভট্টাচার্যের। তিনি এখানে একটা ফার্মের পরিচালনায় রয়েছেন। ফিল্ম-এর ব্যাপারেও এখানে কিছু বাঙ্গালী আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত রূপশিল্পী ছিলেন আহীরটোলার হরিপদ চন্দ।

শুনলাম বর্তমানে তিনি বেঁচে নেই, তাঁর এক ছেলে বাবার কাজ-কর্ম দেখাশোনা করেন। হরিবাবুর ওই মেকআপের ব্যাপারে খুব নাম ছিল, নিজের বাড়ীতেই তিনি মেক্‌আপ্‌ লেবরেটরী করেছিলেন, সেখানে আসতো মাদ্রাজ-কোয়েম্বাটোর থেকে শিল্পীর দল রূপসজ্জা নিতে, এমন কি সিলোন থেকেও শিল্পীরা মেক্‌আপ্‌ নিয়ে প্লেনে করে গিয়ে সেখানে স্যুটিং করতেন। হরিপদবাবু আজ নেই। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীও অবসর নিয়েছেন আর্ট কলেজ থেকে।

সত্যবাবু বলেন—থিয়েজফিক্যাল সোসাইটি কলাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন আর্ট স্কুল নিশ্চয়ই দেখবেন।

এর পরেই আতিথেয়তার পালা, একটু দূরেই তাঁর বাড়ী না গেলে

চলবে না। ওদিকে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মিটার উঠছে। অন্যদিন যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে রেহাই পেলাম।

মাদ্রাজ শহরের থিয়েজফিক্যাল সোসাইটির হেডকোয়ার্টার এ্যানি, বেসান্ত এই সোসাইটির অন্যতম প্রবর্তক-এর পাঠাগারের সংগ্রহ বিস্ময়কর বহু মূল্যবান পুঁথি-গ্রন্থ এঁরা সংগ্রহ করেছেন, অনেক গবেষণার কাজে সে সব ব্যবহৃত হয়। এই সোসাইটির বাগানের বিশাল বটগাছ আমাদের বটানিকেল গার্ডেনের বটগাছের কথাই স্মরণ করায়। শান্ত স্তব্ধ সবুজ পরিবেশে এই বাগানটি যেন একটি সাধন আশ্রমে পরিণত হয়েছে।

এদের মত হচ্ছে জীবনের সত্যই সব চেয়ে বড়, ধৈর্যের চেয়েও বড়। সারা পৃথিবীর ধর্মমন্ত্রের উপর মানুষের মধ্যে প্রীতিই সব চেয়ে বড় ধর্মতত্ত্ব।

এই অন্তহীন স্তব্ধতার রাজ্যে মানুষ ক্ষণিকের জন্যও নিজের অন্তরের সেই পরম আলোকময় সত্বাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করে—ঐকান্তিক সে চেষ্টা।

বেলা বেড়ে উঠেছে। তবু পথ বলতে কষ্ট হয় না। দুপুরের খাওয়া আজ বাইরেই কোথাও সেরে নেব। ছায়াময় পরিবেশ থেকে এগিয়ে চলেছি কলাক্ষেত্রের দিকে। রুক্মিণী আরনেডেল এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। নিজেই সারাজীবন তিনি শিল্প সাধনার জন্য পাত করেছেন, তাই এমনি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি।

এ্যানি বেসান্ত মেমোরিয়াল রোডের উপর তাঁর দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেই প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাজের বিখ্যাত ভারত নাট্যম; কেরলের কথাকলি-নাচ, দক্ষিণী সঙ্গীত এবং বাদ্য এসব শেখানো হয় বিধিবদ্ধ ভাবে।

অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই দেখলাম, এখানে পাঠক্রমের শিক্ষা তাদের চলেছে। হাতের কাজ ও এছাড়া দু একটা বিভাগে শেখানো হয়।

বিমলদা বলেন—বিজয় মাষ্টার হয়তো আসবে! তার ছাত্র-ছাত্রীদের এ সব দেখা দরকার। ভারতনাট্যম—

ছুটোধারারই বেশ গবেষণামূলক কাজ চলেছে। ভারতনাট্যমের নৃত্যে ছন্দ লয় তাল—ভঙ্গী, মুদ্রার বিভিন্ন সূক্ষ্ম কাজ তো আছেই তাছাড়া চোখের ভাষায়—হাতের মুদ্রায় নিখুঁত অভিনয়ও ফুটে ওঠে। এদের একটি অঙ্গ 'বর্ণম' নাচের মধ্যে শিল্পীর যা পরিশ্রম হয় তাও কল্পনাতীত।

কথাকলি অবশ্য অন্যধাঁচের। মুখোস পরে সাধারণত রামায়ণের কোন ঘটনাকেই অভিনয় এবং সঙ্গীতের মধ্যে ফোটানো হয়। ভারত-নাট্যমেও সঙ্গীতের সাহায্য থাকে। তবে তা শুধু রাগসঙ্গীত। যেমন বসন্তের রাগ—নর্ত্তকীকে নৃত্যছন্দ মুদ্রা এবং নাচের গতি এবং লাস্যে সেই বসন্তের রূপ মূর্ত করতে হবে।

কথাকলিতে থাকে নাটকীয় ঘটনার একটা সূত্র। তবে এদের মৃদঙ্গমে যে তালের সূক্ষ্ম ভাগ যদি দেখা যায় তার ছন্দে নৃত্য অত্যন্ত কঠিন। রেওয়াজ সাপেক্ষ। গতি এবং ছন্দ তাই এ নাচেরও অঙ্গ।

বিমলদার কথায় সুরপতি জবাব দেয়—তিনি তো বাজার করতে গেলেন ওদের নিয়ে; নাচ শেখাতে কি এসেছে দাদা, নাচানো শেখাতে এসেছে।

পুলক চুপ করেই থাকে। একটা সুর উঠছে। পুলক গুণগুণিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা কলি গাইছে। ছেলেটা গায় ভালো তবে বড় লাজুক, তাছাড়া কখনও বাইরে এত দূরে আসেনি তাই মন মরাই হয়ে থাকে। তবু সুরের রাজ্যে এসে পুলকের শিল্পীমনও চকিতের জন্য খুশীতে মেতে উঠেছে।

ফেরার পথে রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে ফিরছি। মাদ্রাজেও মিশনের বেশ প্রতিষ্ঠা, এরা নিজস্ব স্কুল কলেজ ষ্টুডেন্টসহোম চিকিৎসালয় সবই করেছেন। সাধারণ মানুষের সেবার এই বিভাগগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তেলেগু ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা, তামিলে শ্রীরামকৃষ্ণ

বিজয়ম এবং ইংরাজীতে বেদান্তকেশরী নামে তিনখানি মাসিকপত্রও এরা প্রকাশ করেন, তাছাড়া এই আশ্রমের প্রকাশনা বিভাগ থেকে অনেক গ্রন্থই প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে গৌরীয় মঠও মাদ্রাজে একটি শাখা স্থাপন করেছেন।

বৈকাল হয়ে আসছে। গাড়ীটা ফিরছে শহরের দিকে। আজকের মত আমাদের ঘোরাঘুরির শেষ। ক্লান্ত দেহ নিয়ে বহু লোকের ভিড়ের থেকে একটু দূরে বালিয়াড়িতে বসলাম।

মাদ্রাজের বীচে আজ আমরা এসে শূন্যমন নিয়ে বসেছে।

—কফি! কফি।

অবসর সময়ে বাদামভাজা আর কফি মন্দ লাগে না। সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের অবিরাম গর্জন ওঠে। বালিতে এসে আছড়ে পড়ে ওর ঢেউগুলো।

—ওই যে দাদা।

দেখি বিজয়মাষ্টার ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একগাদা রকমারি সাইজের প্যাকেট বগলে বীচের দিকে আসছে।

বিমলদা তখনও মাদ্রাজের নামের ইতিহাস আওড়ে চলেছে—বুঝলে রাজা যযাতির এক ছেলে ছিল তার নাম ছিল মদ্রক। তার থেকেই এই মাদ্রাজ নামকরণ হয়েছে।

সন্ধ্যা নামছে।

দেখি ইলা আমাদের দেখে এগিয়ে আসে ওখান থেকে। ঢেউগুলো মৃদু মর্মরে ভেঙ্গে পড়ছে, আবছা অন্ধকারে পুলকের সুর জাগে।

সেথা রোজ দুই বেলা
ভাঙ্গাগড়া খেলা
অকূল সিন্ধুতীরে
পথ ভোলো পথ ভোলো পথ ভুলে মর ফিরে
ওরে সাবধানী পথিক।

নিস্তব্ধ অন্ধকারে ওর সুরটা মিশেছে সমুদ্রের সবেগ গর্জনে।

ইলা-আমি-ওই বিমলদা-ওপাশের বালিয়াড়িতে বসা সেই আত্মসর্বস্ব বিজলী সরখেল—ভণ্ড বিনয় মাষ্টার সবাই ওই বিশাল রূপের রাজ্যে নিজেদের সব কথা ভুলে গেছি— হারিয়ে গেছি।

ঢেউএর বুক থেকে লাফিয়ে ওঠ! জলকণার আবেশে বাতাস এখানে আমন্থর আবেশময়।

ভোর থেকেই তৈরী হয়েছি দীর্ঘ পাড়ি। কাঞ্চিপুরম হয়ে পক্ষীতীর্থ দেখে মহাবলীপুরম। ঝকঝকে ডিলাক্স বাস—একজন কনডাক্টার গার্ডও আছে। সিটগুলোও বেশ আরামপ্রদ।

বাসটা নিয়ে আমাদের পুন্নামালাই হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে।

একপাশে কুয়ম নদী চলেছে, অল্প জলধারা সকালের প্রথম আলো সবে আকাশে ফুটে উঠেছে। পুন্নামালাই শহরতলীর একটি অঞ্চল আগে মাদুরার নায়ক রাজবংশের অন্যতম ঘাঁটি ছিল তারপর ইংরেজ সৈন্যদের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়।

ঘুমের জড়তা যেন এখনও কাটেনি।

ঝকঝকে রাস্তা দিয়ে বেগে ছুটে চলেছে গাড়ীটা, গ্রামসীমার বুক চিরে। কোথায় দূরদিগন্তে দেখা যায় গোপুরম; কোন ক্ষুদ্র গ্রাম তবু তাতে একটি মন্দির ঠিক রয়ে গেছে।

—মন্দিরকে কেন্দ্র করেই এদের সামাজিক জীবনও গড়ে উঠেছিল। বিমলদা বলে চলেছেন।

মন্দিরের দেবতাই ছিলেন সবকিছুর অধিপতি। চাষীদের দাদন দেওয়া হ'তো মন্দির থেকে, তারা সেই ধান ফেরৎ দিত দেবতাকে। তারা ছিল দেবতারই প্রজা। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত জনপদ-বাণিজ্য কেন্দ্র।

বাসটা চলেছে কাঞ্চিপুরমের দিকে।

মাদ্রাজ এসে কাঞ্চিপুরম না দেখটা অন্যায়। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে সাতটি পবিত্র নগরের নাম করা হয় যথা, কাঞ্চিপুরম, অযোধ্যা, মথুরা,

হরিদ্বার, বারাণসী, অবন্তিকা এবং দ্বারকা। সাতটি নগরের মধ্যে তিনটি শৈব তীর্থস্থান, তিনটি বৈষ্ণবতীর্থ স্থান, কিন্তু কাঞ্চিপুরম-এ পাশাপাশি বহুশতাব্দী ধরে শৈব বৈষ্ণব বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। বর্তমানে কাঞ্চীপুরমের দুটো অঞ্চলের নাম শিবকাঞ্চী এবং বিষ্ণুকাঞ্চী, বৌদ্ধ এবং জৈনদের চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে ।

ইলা ওপাশের সীটে বসেছিল, মেয়েটি যেন ওদের গোত্রছাড়া। কালো ডাগর দু'চোখ মেলে আমাদের কথা শুনছিল মন দিয়ে। বলে ওঠে।

—এত পুরোনো শহর?

—হ্যাঁ। চীনদেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এদেশে এসেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে তখন তিনি দেখেছিলেন কাঞ্চিপুরম একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী পল্লবরাজাদের রাজধানী ছিল এই নগর। মন্দির—বৌদ্ধবিহার চৈত্য সবই ছিল—অনেক শ্রমনও বাস করতেন সেই সব সাংঘরাম-এ। প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিধর্ম এখানেই তাঁর জীবন অতিবাহিত করে ছিলেন। এসেছিল সাধক জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, তিনি এখানে শৈব ধর্মের পূর্ণ প্রচার করেন।

তাছাড়া পল্লব রাজবংশের তৈরী মন্দির গোপুরম, দ্রাবিড় সভ্যতার প্রথম এবং প্রকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে আছে আজও।

কাঞ্চিপুরমের অতীত ইতিহাস অনেক বর্ণাঢ্য।

পল্লব রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেন অনুমান ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত, তারপর আসেন চোল রাজবংশ, ৯০০ থেকে ১১৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল তাদের রাজত্বকাল, তারপর বিজয়নগর রাজবংশ ও এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মধ্যবর্তী দুটি রাজবংশের মধ্যে একটি নাগুং অন্যটি নায়ক রাজবংশ তাঁরা এখানে রাজধানী স্থাপন করেন নি।

বিজয়নগর রাজবংশের রাজত্বকাল ১৩৪০ থেকে ১৫৬৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত। এর পর থেকেই কাঞ্চীপুরমের, গৌরবময় ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যায়। বর্তমান কাঞ্চীপুরে তাদের নীরব সাক্ষ্য ছড়ানো।

—বিমলদা বলেন—

—আমাদের বিষ্ণু কাঞ্চীপুর প্রথমে না গিয়ে মহাবলীপুরম দেখে কাঞ্চীপুরম গেলে ভালো হ'তো। ইতিহাসের ধারা আর মন্দির নির্মাণ শৈলীর ধারার একটা বিবর্তনের আভাস পাওয়া যেতো।

—মানে? ইলা ওর দিকে চাইল।

বলে উঠি—বিমলদার কথাই সত্যি। মহাবলীপুরমে পল্লব রাজবংশে পাথরের বুকে শিল্পশৈলীর যে প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, কাঞ্চিপুরমের বিভিন্ন মন্দিরে তার উৎকর্ষতা লাভ করেছে, তারপর সেই শিল্পশৈলা বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যম তার সার্থকতার সীমান্তে পৌঁচেছে বাতাপি এমন কি ইলোরার গুহমন্দিরে। অনেকেই বলেন ইলোরার অনেক শিল্পী সেদিন অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন—এই কাঞ্চীপুরমের বিভিন্ন মন্দিরের সূক্ষ্মতা দেখে।

মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় সাতচল্লিশ মাইল পথ, ট্রেনেও যাওয়া যায়। চিংলিপুট আরকোনাম লাইনের একটি স্টেশন এই কাঞ্চীপুরম।

বাসটা ছুটে চলেছে।

সূর্যের আলোয় ভরে উঠেছে ধানক্ষেত, পিচঢালা পথে দু ধারে অর্জুন আম তালগাছের জটলা। কোথাও জন্মেছে ঝাউবন, হঠাৎ দিগন্তসীমায় দেখা যায় কয়েকটা গোপুরম আকাশে মাথা তুলেছে। একটার পর একটা গোপুরম দেখা যায়।

সেই প্রখ্যাত কাঞ্চীপুরম আমাদের সামনে, বিশাল জলাশয়।

বিমলদা বলেন—অতীতে কাঞ্চীপুরমে একবার দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়, তখনকার চোল রাজারা এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে অনেক লোককে কাজ দেন।

প্রায় মাইল দুয়েক লম্বা—মাইল দেড়েক চওড়া এই জলাশয়ের ওপারে কাঞ্চীপুরম নগরীর সীমারেখা দেখা যায়। গাড়ীটা এগিয়ে চলে।

আমরা যেন কোন অতীতের একটি নগরীতে প্রবেশ করেছি।

বর্তমান এখানে স্তব্ধ। বেগবতী নদীর তীরে কাঞ্চীপুরমের সেই হারানো অতীত আমার চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বেশ প্রশস্ত পথ তারই একধারে তালপাতার আবরণে মোড়া প্রকাণ্ড রথ, ঠাঁই ঠাঁই পাতাগুলো খসে গেছে—অপূর্ব কারুকার্য ফুটে উঠেছে। কাঠের সেই প্রকাণ্ড রথ-সারথি, নৃত্যচঞ্চলা সখীর দল যেন সজীব, প্রাণময়।

একপাশে মন্দিরের বিশাল প্রাকারসীমা। বাস গিয়ে থামল একাম্রনাথ মন্দিরের বাইরের চত্বরে। আজকে কাঞ্চীপুরমের মাত্র শৈব এবং বৈষ্ণব মন্দিরকে নিয়ে দুটি ভাগ গড়ে উঠেছে। একটি শিবকাঞ্চী —আর অপরটি বিষ্ণুকাঞ্চী।

গাড়ী থেকে নেমে ওরা ওপাশেই একটা বিষকরমচা গাছের নীচে চায়ের দোকানে ভিড় জমিয়েছে। এখানে দেখলাম চা কফি দুটোই মেলে সেই সঙ্গে গরম বড়াভাজাও আছে।

বিজয়মাষ্টার গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজছে। ওদিকে বিশু মল্লিক নিজে বিজলী সরখেলকে নিয়ে একটা কফিখানার দিকে এগোয়, বিজলীর নেংটি ইন্দুরের মত স্বামীও চলছে পিছু পিছু।

নেত্যকালীবাবু ইতিমধ্যে সকলকে ডিঙ্গিয়ে গোটাকতক বড়াভাজা আর এনামেলের মগে একমগ চা হাতিয়ে এনে ওপাশে বুড়ীকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। পান নেই, যদিও বা পান মেলে, লম্বা পাতার স্বাদবিহীন পান, তাও চুন-খয়ের নেই, গালে ঢেলে দাও পুরিয়া মোড়া, এইটুকু সুপারি···মুখে কোন স্বাদ আসে না। বুড়ির জন্য পান পান করে এদিক ওদিকে হন্যে হয়ে ছুটছে।

বিজয়দা আর আমি কামাক্ষী আসল মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই। বুড়ো পাণ্ডা আমাদের মুখে মন্দিরের নাম শুনে একটু অবাক হয়। বিমলদা বলেন—

—ওই মন্দির থেকে শঙ্করাচার্য শৈব মতকে এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে যন্ত্ররূপে দেবতার পূজা হয়। বুড়ো পাণ্ডা মাথা নাড়ে। ভাঙ্গা ইংরাজী হিন্দী এরা জানে; যাত্রীদের জন্য জানতে হয়,

তাছাড়া যাত্রী না ডাকুক এরা লোক বুঝে তার সঙ্গ নেবে। এটা সেটা বলবে, চলে যেতে বললেও যাবে না। অগত্যা আপনাকে যা হয় কিছু ওকে দিতে হবে।

ভগবান শঙ্করাচার্যের মূর্তি এখানে এখনও পূজিত হয়। খুব বড় নয় এ মন্দির, কিন্তু তবু এর নির্মাণশৈলী বেশ সুন্দর।

কথিত আছে এককালে এই দেবতা খুবই জাগ্রত ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে সেই মহিমা ম্লান হয়ে যায়। তখন কাঞ্চীপুরমে বৌদ্ধধর্মের প্রসার চলেছে। ভগবান শঙ্করাচার্য এই মন্দিরে এসে নিজে নানা যাগযজ্ঞ করে এই দেবতার মাহাত্ম্য পূর্ণ প্রচার করেন। শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়—তাই কামাক্ষী আসন মন্দিরের আজও সেই গুরুত্বে রয়ে গেছে।

তন্ত্র এবং মহাযান বৌদ্ধের এই চক্র-যন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে একটি নিকট সম্বন্ধ আছে, তবে তান্ত্রিকসাধনও যে প্রচলিত ছিল সেকালে তা এই মন্দিরের দেবতাকে দেখলেই বোঝা যায়।

একাম্রনাথ মন্দিরের প্রধান গোপুরমে তখন দিনের আলো এসে পড়েছে। বাইরে ওদের কাউকে দেখলাম না। দেখি ইলা দাঁড়িয়ে আছে একা ওই চত্বরের বাইরে।

—তুমি!

ইলা এগিয়ে আসে, "ওদের কলরব ভালো লাগে না, মন্দির দেখতে এলাম এখানে—মনের শান্তি না থাকলে চলে?"

একাম্রনাথ মন্দিরের গোপুরম দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের মধ্যে উচ্চতায় অন্যতম। এবং উচ্চতা প্রায় ১১৮ ফিট। দশতলা এই গোপুরমের বিভিন্ন অংশে দ্বারপাল-গণেশেরমূর্তি তো আছেই। তাছাড়া রামায়ণের অনেক কাহিনীও এখানে অঙ্কিত আছে। পল্লব রাজারা এর প্রতিষ্ঠা করেন অনুমান সপ্তম শতকে, তারপর চোল রাজবংশের কারিকল চোল এই মন্দিরের অনেক সংস্কার করেন, শেষ সংস্কার ঘটে বিজয়নগরের রাজত্বকালে; তারপর থেকে বিরাট মন্দির আজ অনাদৃত পড়ে আছে।

দেবতার পূজা-আরাধনা সবই হয়, কিন্তুপ্রাকারের পর প্রাকার বিভিন্ন গোপুরম—মন্দিরের মধ্যে বিশাল হল যে সব কিছু মেরামত করা কঠিন।

বিশাল মন্দির। ভিতরে একটা বিরাট পুষ্করিণী—একপাশে উৎসর্গবেদী, ধ্বজ, তারপর পাথরের নন্দী, অর্থাৎ শিববাহন বৃষমূর্তি। তারপর মন্দিরের ভিতরে আছে শিবমূর্তি। কথিত আছে, আমগাছের চারটি শাখায় চার রকম স্বাদের ফল হতো, কটু, কষায়, অম্ল এবং মধুর। তাদের সঙ্গে চার বেদের তুলনা করে আমগাছের নামকরণ হয়েছে বৈদিক আম্রবৃক্ষ। প্রবাদ আছে যে, প্রতিদিন ওই গাছে একটি করে আম পাকতো আর সেই ফলে দেবতার সেবা হতো। তার থেকেই একাম্রনাথ বলে এই দেবতা পরিচিত।

পার্বতী এই বৈদিক আমগাছের নীচে শিবকে পাবার জন্য সাধনা করেছিলেন। পূজারীরা বলেন, এই আমগাছের বয়স নাকি কয়েক হাজার বৎসর, তবে গাছটা যে পুরোনো তা বোঝা যায়। তার গুঁড়ির পরিবৃত্ত বিরাট, তবে এখন আর ফল হয় না।

মন্দিরের চত্বরের চারিপাশ অনেক অলিঙ্গ কক্ষ, তবে আজ ওখান থেকে বের হয়ে চলেছি কৈলাসনাথ মন্দিরের দিকে। পল্লব রাজবংশের অন্যতম রাজা ছিল রাজসিংহ। ৫৬৭ খ্রীঃ এই মন্দির স্থাপিত করে রাজসিংহ তাঁর নাম অনুসারে এর নামকরণ করেন রাজসিংহেশ্বর।

কিন্তু পল্লবদের রাজ্যকাল শেষ হল—চোলরাজাদের আমলে এই মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়; এর সব সম্পত্তিও অন্য দে তার নামে বিক্রী হয়ে যায়; কিন্তু তার কিছু পরে চোল রাজবংশের এক মন্ত্রী এই দেবতার মন্দির আবার উদ্বোধন করান, পূজোও সুরু হয়। সেই থেকে এর নাম হ'ল কৈলাসনাথ মন্দির।

শৈব এবং বিষ্ণুর আরাধনা নিয়ে যে মন্দির তার নাম এখানে কচ্ছপেশ্বর মন্দির। মন্দিরটি ছোট হলেও এর গোপুরমে বেশ সুন্দর উন্নত ধরণের কাজ দেখা যায়। মূল মন্দিরের গঠনপ্রণালী ও সুঠাম।

এখানে কূর্মরূপী বিষ্ণু মহাদেবকে আরাধনা করছেন। একত্রে তাই দুই দেবতারই পূজা হয় এখানে।

সেদিন বোধ হয় কোন পূজার দিন ছিল; অনেক স্থানীয় লোক ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন মন্দিরে, চেনাকুলমে তাদের স্নান করিয়ে মন্দিরে পূজো দিয়ে মাথায় একটি বালা তুলে দিয়েছে, তাতে জ্বলছে একটা প্রদীপ আর পূজার উপকরণ ওই নারকেল কলা আর দিশী চিনির মত পদার্থ; মন্দির প্রসাধন করে সেই প্রসাদ দিচ্ছে ছেলেদের। জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পেলাম না। তাদের ভাষায় কি বললো কি জানে। ইলা এগিয়ে যায়। এক ভদ্রমহিলাই ভাঙা ইংরাজীতে জানান।

—ছেলে-মেয়েদের অসুখ-বিসুখের জন্য মানসিক করে অনেকে এই দেবতার, তারই পূজো দিতে এসেছে তারা।

মানুষ চিরকালই এইভাবে দেবতাকে অর্চনা করে এসেছে—তাকে আপনজন করে বরণীয় করে তুলেছে। সেই অতীতকাল থেকে আজও একই ধারা সমানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মানুষ তাই এক জায়গাতে স্থির, আজও সে সংস্কারে অচল—বদ্ধ।

শিবকাঞ্চীর আশ পাশে আরও শিবমন্দির রয়েছে। ওপাশ থেকে একটু এসে পড়ে বিষ্ণুকাঞ্চী। এখানে বৈষ্ণবদের মন্দির।

তুলনামূলক ভাবে দেখলে, মন্দিরের কাজকর্ম অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এর মধ্যে একটি উন্নতধারার শিল্পশৈলীর ছাপ আছে। এর মণ্ডপের পাথরের কাজ আরও নিখুঁত। অশ্বারোহীর মূর্তি আরও প্রাণবন্ত, এর ধারা আরও উন্নতি লাভ করে পরবর্তীকালে, বেলুর—এমন কি ইলোরায় যে কাজ দেখা যায় এইখান থেকেই তা প্রভাবান্বিত।

বিমলদা বলেন।

—বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির ও পল্লব রাজবংশের রাজা নন্দী বর্মণের দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল অনুমান ৭৭০ খ্রীঃ অঃ। এর শিল্পশৈলী আরও নিখুঁত; গঠনসৌষ্ঠবও অনুপম।

বেলা বেড়ে এসেছে। বেশ ঘোরাঘুরির পর এইবারে চায়ের তেষ্টাও অনুভব করছি। ভরদ্বাজ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। গোপুরম পার হয়ে গোপীকুলম, ওপাশে মন্দিরের প্রশস্ত হল। কাঞ্চীপুরমের বিভিন্ন মন্দিরের শিল্পশৈলীর মধ্যে একটা সভ্যতার ছাপই মেলে, সেই দ্রাবিড় রীতি। কিন্তু বেশ বোঝা যায় শিল্পীদের কাজের মান ক্রমশঃ সূক্ষ্মতার দিকে চলেছে।

সেই কাজের চরম নিদর্শন পাওয়া যায় ভরদ্বাজ স্বামী মন্দিরের হলে, পাথরের অশ্বারোহী মূর্তিগুলো আরও সুন্দর। পল্লব এবং চোল বংশের মধ্যে যুদ্ধের অনেক মূর্তি আছে, একটা পাথরের বুক থেকে কেটে বেশ বড় শিকলও তৈরী করা হয়েছে।

এ মন্দির এখনও যত্নে আছে। কোথাও গ্রানাইট পাথরের কাজ নষ্টও হয়েছে; তবু মন্দির কর্তৃপক্ষ তাকে মেরামতের চেষ্টা করছেন। মণ্ডপের হল স্তম্ভের অলঙ্করণ অপরূপ।

এই মন্দিরেই কাঞ্চীপুরম শিল্পকলার সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়।

কথাটা হচ্ছিল সেই পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

দেবদাসীর ব্যাপার কি?

বৃদ্ধ বলেন—দেবদাসী আগে এখানের অনেক মন্দিরেই ছিল। তারাই ছিলেন ভারতনাট্যমের ধারিকা এবং বাহিকা। তাছাড়া এ দেশে অনেক ব্রাহ্মণের মেয়েদের তখন বিয়ের ব্যাপারও সহজ ছিল না, তাই সমাজে থেকে ঘৃণা অবজ্ঞা সহ্য করার চেয়ে দেবদাসীত্বই গ্রহণ করত তারা। সমাজে শ্রদ্ধার আসন থাকতো তাদের। তা ছাড়া অনেক রাজারাও মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, মন্দিরের এদিক ওদিকে যে সব শিলালিপি রয়েছে তাতে ওই দানপত্র লেখা আছে।

মন্দিরের এদিক ওদিকে চারিদিকে বিভিন্ন লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে তামিল ভাষায়। তার মধ্যে একটা শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করলেন বৃদ্ধ, সেটা বিজয়নগররাজ অচ্যুত রায়ের দানপত্র, মন্দিরকে তিনি সতেরোটি গ্রাম দান করেছেন।

মন্দিরে এই শিলালিপিই ছিল তখনকার নিদর্শন—বিমলদাই কথাটা পাড়েন।

—দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরেও ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর সৈন্যদল হানা দেয়।

বৃদ্ধ পাণ্ডাঠাকুর মাথা নাড়েন।

—ঠিক কথা। তবে তার আগে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরও কাঞ্চীপুর এবং মাদুরায় হানা দিয়েছিল, কিন্তু কাঞ্চীপুরের কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিল ঔরঙ্গজেবের সৈন্যদল। বৈকুণ্ঠ পেরুমহলের দেবতাকে সেদিন পুরোহিতরা এখান থেকে সরিয়ে দেন। পরে আবার সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, মন্দিরেরও সংস্কার করা হয়।

কাঞ্চীপুরে অনেক হিন্দু রাজাই রাজত্ব করেছিলেন। চালুক্য বংশের রাজা বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীপুর দখল করেন, কিন্তু তারা কেউ দেবমন্দির ধ্বংস করেন নি, বরং উন্নতিবিধানই করেছিলেন মন্দিরের।

কাঞ্চীপুর অতীতের ঐতিহ্যময় নগরী। আজ তার বুকে পিচের রাস্তা, বিজলী বাতি। পথঘাটও বদলেছে। তবু মাঝে মাঝে দেখা যায় পথের ধারেই তাঁতিরা কাপড়ের লম্বা টানা মেলে সুতো ঘুরিয়ে পুণ্যি কাটছে।

রেশম এবং সুতোর কাপড়ের সেই শিল্প আজও সেখানে টিকে আছে। অনুমান পঞ্চম শতাব্দী থেকে যে বয়ন বিদ্যার সেখানে প্রচলন ছিল, আজ তার অনেক উন্নতি হয়েছে।

পথে ঘাটে কিছু গুজরাটিও দেখলাম। ব্যবসা উপলক্ষে তারা আছে। ওই কাপড়ের ব্যবসা। কলকাতা থেকেও অনেকে সেখানে মালপত্র কিনতে যান।

তাই কাঞ্চীপুরম্ আজ ধর্ম—বাণিজ্য আর শিল্পকলা ছাড়াও সংস্কৃত এবং আধুনিক বিদ্যার পীঠস্থান।

বড় রাস্তার ধারেই পল্লব হোটেল। বেশ ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার বোর্ডিং। নীচে খাবারও মেলে।

শাক্‌পাডু ?

অর্থাৎ ব্রেকফাষ্ট। সকালের খাবার এইখানেই সারলাম।

বিমলদা বলেন—এরপর পাহাড় ঠেঙ্গাতে হবে ভায়া, ভাতটাত গিলো না।

গরম বড়া ভাজা, মাঝখানটায় আর একটা ফাঁকমত মাসকলাই-এর বড়া, হিং দিয়েছে তাতে, স্বাদ মন্দ লাগল না, আর পেলাম অমৃত্তির মত একটা বস্তু, তবে চিনি কম, তার সঙ্গে কফি।

কাঞ্চীপুরকে সত্যিই ভালো লাগছিল। মাদ্রাজের মধ্যে একটি স্মরণীয় স্থান, কিন্তু থাকার সময় নেই। চিংলিপুট হয়ে আমরা যাবো এইবার পক্ষীতীর্থে—সেখান থেকে মহাবলীপুরম।

বাস অপেক্ষা করছে। সরখেল গিন্নী আর বিশু মল্লিকের তখনও দেখা নেই।

সময় হয়ে যাচ্ছে, চিংলিপুট বাইশ মাইল ; সেখান থেকে পক্ষীতীর্থ আরও বেশ দূর। সরখেলমশাই গজগজ করেন।

তিনিও জানেন না—কোথায় গেছে তারা। ইলা রমা মুখ টিপে হাসে আড়ালে। মেয়েদের মধ্যেও গুজগুজ ফুসফাস হয়।

নেত্যকালীবাবু বলে—মশাই, আপনি গিন্নীকে একটু শাসান দিকি।

সুরপতি এপাশ থেকে বলে—আপনি যেমন করছেন ?

দেখা যায় বিজলী সরখেল নামছে একটা রিক্সা থেকে ; হাতে একটা শাড়ীর মোড়ক। বিশু মল্লিকের চোখে সোনার রিমলেস চশমা, হাতে পানের বোঁটায় চুন। কোন দিকে নজর না দিয়ে তারা গাড়ীতে এসে উঠল।

—শাড়ীটা কিন্তু চমৎকার।

ওদিকে মেয়ে মহলে দু' একটা কথা ওঠে। নেত্যকালীবাবু যেন ছেয়ে গেছে। বেশ জোর গলায় বলে গিন্নীকে—হবে বাপু, মাদুরা ব্যাঙ্গালোরের কাছে কাঞ্জীভরম ! ধ্যাৎ।

গাড়ীটা এগিয়ে চলেছে চিংলিপুটের পথে।

জেলা সদর এই চিংলিপুট, ভেল্লুপুরম যাবার পথে, পণ্ডিচেরীর বাসও এইদিকে যায়। বেশ বড় শহরটা খ্রীস্টান মিশনারীদেরও গির্জা কলেজ স্কুল সবই আছে।

শহর পার হয়ে একটু আসার পরই দিগন্তে দেখা যায় পর্বত-সীমা, বেগবতী নদীর উপর কাঞ্চীপুরম—সেই নদীটাও এবার দূরে সরে গেছে। আমরা পক্ষীতীর্থের দিকে এগিয়ে চলেছি পাহাড় শ্রেণীর দিকে।

রোজ ওখানে দুটি পাখী আসে মধ্যাহ্নে, পূজারীর হাতে প্রসাদ খেয়ে তারা চলে যায় রামেশ্বরের দিকে। প্রবাদ আছে বারানসী থেকে রামেশ্বরের পথে এই পক্ষীতীর্থে তারা আসে, তামিল ভাষায় এই পাহাড়টির নাম তিরুকালুকুনভরম্। বাংলায় বলা যেতে পারে পবিত্র পাখিদের পাহাড়।

আশেপাশে অনেক পাহাড়ই আছে—তার মধ্যে মাথা তুলেছে পাঁচশো ফিট উঁচু এই পাহাড়টি ; পুরাণে একে বলা হয়েছে বেদগিরি। কথিত আছে, ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব এই চারি বেদ মহাদেবের আরাধনা করতে মনস্থ করে, মহাদেব তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। এই পাহাড়ের ধাপগুলিকে সেই চতুর্বেদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে শীর্ষদেশে বেদগিরিশ্বর শিবের মন্দির। এই পাহাড় এমনিতেই প্রসিদ্ধ তীর্থ। কথিত আছে এই পর্বত প্রদক্ষিণ করলে মানুষের সব যন্ত্রণা নিরাময় হয়।

প্রায় পাঁচশো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়, দর্শনী দশ পয়সা। সিঁড়ি থেকে নীচের মন্দির গেস্থরমকুণ্ডগুলিতে মনোরম দেখায়। পাহাড়ের মাথায় তখন বহু লোকের ভিড় হয়।

পর্বতের চূড়ায় মন্দির তিনটি বিরাট শিলাখণ্ডের উপর স্থাপিত। মধ্যে মূল দেবতা দেবগিরিশ্বর। কথিত আছে প্রতি বারো বছর পর পর দেবরাজ ইন্দ্র বজ্ররূপে এই মন্দিরে এসে দেবতাকে অর্চনা করে যান।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে শিব পার্বতী এবং সব্রাহ্মণ্য (দেবসেনাপতি কার্তিকেয়) দেবের মূর্তি খোদিত। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মূর্তি আছে, নীচে মার্কণ্ডেয়ের মূর্তি খোদিত।

উত্তর দিকে প্রাচীর গাত্রে খোদিত আছে যোগদক্ষিণ মূর্তি; তাঁর কাছে দুটি ঋষির মূর্তিও প্রস্তরে খোদাই করা আছে। কথিত আছে, এই ঋষি দুজনই ওই পাহাড়ের শীর্ষে প্রত্যহ আগত দুটি পাখী।

এই পাখীদের নিয়ে অনেক কাহিনীও পুরাণে প্রচলিত আছে। পুরাণকাররা জানিয়েছেন, ওই পাখী দুটি নাকি তিনকাল, সত্য—ত্রেতা—দ্বাপরেও ছিল, কলিতে ও আছে। কলির শেষে ঘটবে ওদের মোক্ষ।

সত্যযুগে ওই পাখী দুটিকে সৃষ্টি করেছিলেন শাল্মলী দেশের বৃদ্ধশ্রমণ নামে এক ব্রাহ্মণ, ওরা ক্রমশঃ দেবচিন্তায় বিভোর হয়ে শিবের উপাসনায় রত হয়।

রামায়ণে বর্ণিত ত্রেতা যুগে ওরা ছিল সম্পাতি ও জটায়ু। পাখী হয়েও ওরা একদিন মহাতেজে সূর্যের দিকে অগ্রসর হলে হংসমুনির শাপে পঙ্গু হয়ে ওরা বিন্ধ্যারণে আর মলয়পর্বতে এসে পতিত হয়। সীতা উদ্ধারের সময় রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল, সেই পুণ্যবলে মুক্ত হয়।

দ্বাপরে ওরা ছিল দুই ভাই—মহাগুপ্ত আর শম্ভুগুপ্ত। একজন শৈব, অপরজন শাক্ত। শিব আর শক্তির মধ্যে কে বড় তাই নিয়ে ওদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ফলে দেবাদিদেব ওদের পক্ষীরূপে পরিণত করেন।

কলিযুগে ওরা ছিল দুই ভাই, পূষ আর বিজ্জিত। মহাদেবের সাধনায় তারা তন্ময় হয়ে দেবতার কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করে। মহাদেব জানান, এখনও কাল সমাগত হয় নি। তবু তারা বিরত হয় না। তাই মহাদেব ওদের পক্ষীরূপে রূপান্তরিত করে দেন।

তবু সেই পক্ষীরূপী দুই ভক্ত প্রত্যহ বারাণসী থেকে রামেশ্বরমকে

ভজনা করতে যায়, পথে এই বেদগিরিতেও অর্চনা করে—চিদাম্বরমেও তাদের দেখা যায়।

রোদের তাপ বেশ চনচনে। মন্দিরের একটু নীচে বেশ খানিকটা জায়গা—ওপাশে পাহাড়ের উপর একটা ছোট্ট কুণ্ড। ওই কুণ্ডের নাম পক্ষীতীর্থ, তারই একপাশে একটা পাথরের উপর কালো বলিষ্ঠ এক পূজারী সোনার থালা আর ছোট একটা পাত্রে জল নিয়ে বসে আছে; থালায় পাখীদের জন্য ভোগ—পাত্রে পানীয়। মাঝে মাঝে দৃষ্টি মেলে নীল আকাশের অসীমে চেয়ে থাকে—কখন আসবে সেই পাখীরা।

জনতার ভিড় বেড়ে চলে। পাথরের এদিক ওদিকে বসেছে তারা প্রায় পাঁচ সাতশো মানুষ ব্যাকুল কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিমলদা বলেন—সত্য মিথ্যা কি আছে জানিনা, তবে বিশ্বাস কিছু আছে নিশ্চয়ই।

ওদিকে আমাদের দলবলও উঠে এসেছে। কে. রায় চলতি কথায় টিকুও রয়েছে। কেউ কেউ ওকে টিকেও বলে। বেশ কালো ঘসঘসে রং, বেঁটে খাটো গোলগাল মানুষটি। বয়সের নাগাল বোঝার কায়দা নেই। তবে মনে হয় জীবনেও অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছে, তবে সদাহাস্যময় একটি মানুষ।

রাগ দুঃখ নেই। সে পাথরের উপর বসে নিবিষ্টমনে গাইছে—

ওহে পাগল ভোলা তোমার লীলা বোঝা ভার,
শ্মশানে মশানে থাকো, তুমি বেদের সারৎসার।
বিশ্বরূপী মহাকাল হে
প্রলয় নাচের তালে।

দু একজন কৌতূহলী লোক বাংলা ওই বন্দনা গান মন দিয়েই শুনছে।

আশপাশে পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমি দেখা যায়, গ্রাম—মাঠ—গাছগাছালি—নারকেল কুঞ্জও আছে। সেখানের মানুষ অনন্তকাল থেকে তাদের স্বাভাবিক জীবনও অতিবাহিত করে।

আমরা পরদেশী, একদিনের জন্য সেখানে গিয়ে এক বিরাট কৌতূহল বিস্ময় আর সংশয়ের দোলায় দুলছি।

একটা কলরব ওঠে। পূজারী ব্রাহ্মণ পাথরের উপর সেই থালাটা দু একবার আওয়াজ করে। বাইনাকুলার লাগিয়ে দেখতে থাকি—হ্যাঁ, প্রায় বারোটা বাজছে। ওপাশের পাহাড়ের দিক থেকে দুটো পাখী উড়ে আসছে।

সাদা চিল জাতীয় বেশ বড় আকারের পাখী, দু ডানার পাশে কালো একটু ছাপ। পাখী দুটো বেদগিরি পাহাড় পরিক্রমা করে এই দিকেই আসছে। পাহাড়ের মাথায় জনতার কলরব, ওরা ঠেলে গিয়ে পড়ছে যে পাথরের উপর পাখীরা এসে খাবে তারই কাছাকাছি।

পূজারীরা লোক সরাতে ব্যস্ত। পাখী দুটো একবার কাছাকাছি এসে আবার সরে গেল।

নিত্যকালীবাবু ততক্ষণে দু হাতে কান চেপে ধরে তড়াক্ তড়াক্ নৃত্য সুর করেছে, মাঝে মাঝে গালবাদ্যি করে বম্ বম্ বম্।

কায়দা এখানে এসে রপ্ত করেছে। ওতে নাকি পুণ্যি বেশী হয়।

বুড়ী গজগজ করে—অমন দাপাদাপি করছ কেন?

—নেত্যকালী গিন্নীর কথাগুলো জিবে আর ঠোঁটে কেমন জড়াজড়ি করে বের হয়।

পাখীর আহারের পর আর কোন দ্রষ্টব্যই থাকে না। লোকজন তাড়াহুড়ো করে নামতে থাকে। অনেকেই মাদ্রাজ থেকে চিংলিপুট হয়ে এখানে এসেছে, যাবে মহাবলীপুরম, তাই তারা তাড়াতাড়িই চলে গেল। মাদ্রাজ থেকে চিংলিপুট পক্ষীতীর্থ হয়ে মহাবলীপুরম পরে বাহান্ন মাইল রাস্তা, আর মহাবলীপুরম থেকে মাদ্রাজ গেছে সোজা রাস্তা তেত্রিশ মাইল প্রায়।

বেদগিরি পাহাড় থেকে নামবার পথ অন্য একটা আছে মন্দিরের পিছন দিকে। সেইদিকে প্রায় শতখানেক ফিট নামলেই ডান-হাতে দেখা যায় একান্তে একটা শিলাতলে এক গুহামন্দির। একটা শিলা

থেকে এই মন্দির কেটে তৈরী। এর গঠনশৈলী অনেকটা মহাবলী-পুরমের গুহামন্দিরের মতই কতকটা।

বিমলদা বললেন—এটাও নরসিংহ বর্মণের আমলেই করা, একটা শিলাতল কেটে এই গুহা তৈরী বলে তামিল ভাষায় এর নাম ঔর্ কল্ মণ্ডপম্। প্রায় বাইশ ফিট চওড়া আর ২৬ ফিট এর ভিতরের দিকে বিস্তৃত। দেবতা হলেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণু।

পর্বতের উপরের মণ্ডপে কয়েকজন ডাচ ভদ্রলোকের নাম খোদিত করা আছে, তারা অনুমান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৭ সালে এখানে এসেছিলেন, তারাও দেখেছেন ওই পাখীদুটির আসা যাওয়া।

ঘুরপথে পাহাড় থেকে নেমে এলাম নীচের মন্দিরের দিকে। পক্ষীতীর্থমের নীচেও বেশ জমকালো বসত, মন্দির দোকান পসার সবই আছে। বিজলী বাতিরও অভাব নেই। ওপাশেই একটি গোপুরম—মন্দিরের পাশে তেপপাকুলম; একটিতে নাকি এখনও বৎসরের একটি আসল সামুদ্রিক দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ জন্মায়, সেই শঙ্খ দিয়ে অভিষেক হয় ওই বেদগিরিশ্বর মহাদেবের।

বেলা বেড়ে উঠেছে। পাহাড়ের ওঠার ক্লান্তি এইবার বুঝতে পারি। ডাব বিক্রী হচ্ছে চার আনা করে। কলা কমলালেবু মুসাম্বীও আছে। মুসাম্বিকে ওরা বলে 'সাতকুডি'। তাই চিবুতে চিবুতে চললাম মহাবলীপুরমের দিকে। সেখানে কিছু না খেলে আর নড়ার উপায় থাকবে না।

বাস এগিয়ে চলেছে সমুদ্রতীরের দিকে। মুক্তপ্রান্তর আর ধানক্ষেতের সীমানার শেষে দেখা যায় জলা জমি, মাঝে একটা ব্রিজও আছে। দিগন্তরেখায় ফুটে ওঠে বালিয়াড়ি—তাল নারিকেলকুঞ্জ আর ঝাউয়ের ঘনকালো বনরেখা লাইট হাউসের উঁচু চূড়ার খানিকটাও দেখা যায়।

আমরা মহাবলীপুরমের দিকে চলেছি। কাছে গিয়ে দেখি সবুজ তাল নারকেল বনে যেন মদমাতঙ্গের দল ঢুকে তছনছ করে গেছে।

শত শত তাল নারকেল গাছ উপড়ে পড়পড় হয়ে আছে, তাদের সবুজ মাথাগুলো সব বিবর্ণ, মৃত।

মাসখানেক আগেকার সাইক্লোনে এইসব ঘটেছে, মাদ্রাজ শহরের সমুদ্রতীরে সেই পরিত্যক্ত জাহাজটার কথা মনে পড়ে।

সমুদ্র কি উত্তাল উন্মাদ বেগে এই জনপদকে আঘাত হেনেছিল তা অনুমান করতে পারি।

তবু এরা সমুদ্রতীরে সেই আঘাত সয়েও বেঁচে থাকে।

বাস গিয়ে থামলো একটা চৌরাস্তায়, ওপাশেই পাহাড়ের গায়ে সেই বিশ্ববিখ্যাত মূর্তির কিছুটা দেখা যায়। আজকের মহাবলীপুরমের রূপ অন্য রকম। বিজলীবাতি আছে, হোটেল—কাফিখানা—ট্যুরিষ্ট লজ—সুন্দর বাগানঘেরা ছোট্ট ম্যুজিয়াম সবই আছে। বাসও মেলে—তা ছাড়া ট্যুরিষ্ট বাস তো অনেক। লোকজনের ভিড় বেশই থাকে।

"আহারের মধ্যে সেই ইড্‌লি বড়া ধোসা—না হয় স্বাদম পাপরুম—রসম পাপরম—রোজ ইত্যাদি। ভাত খেতে ইচ্ছে করে না। তাই পাউরুটি আর কলা দিয়েই দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম।

সুরপতি ব'ল—দাদা এতে মন্দ হ'ল না, তবু ঘোরা যাবে।

আজকের মহাবলীপুরম একটি সাধারণ জনপদ, কিন্তু অতীতে এর ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মাদ্রাজকে সেদিন কেউ চিনতো না।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে তখন পল্লব রাজারা এখানে এই নগর এবং বন্দর স্থাপন করেন পুরাণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাপরাক্রমশালী বলিরাজা নাকি সমুদ্রতীরে এই প্রখ্যাত নগরী মহাবলিপুরম্ স্থাপনা করেন। বলিরাজের বংশধর রাজা নমুচিকে দুজন স্বর্গপুরী স্বর্গে নিয়ে যায়। সেখানের ঐশ্বর্য এবং দেবপুরের বৈভব দেখে এসে বলিবংশধর মহাবলীপুরমকেও ইন্দ্রের স্বর্গের চেয়েও মনোরম করে তোলে, তাই রোষে ইন্দ্র বরুণদেবকে আদেশ দেন ওই নগরী জলের তলে বিলীন করে দিতে।

"ইতিহাসে পাওয়া যায় পল্লবরাজ মমলল্, তাঁর অন্য নাম নরসিংহ

বর্মণ—এই নগরের এবং এখানের শিল্পকলার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অনেকে বলে, ওই মমল্ল রাজ এই স্থানের সংস্কার এবং সংযোজন করেন মাত্র, পৌরাণিক কাল থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। সেই থেকে কেউ কেউ একে মমল্লপুরমও বলেন।

তবে দেখা যায় পল্লবরা সে যুগে বহু কীর্তিমান নরপতি ছিলেন।

সাতবাহন রাজাদের অধীনে প্রথমে এরা সামন্ত রাজার মত ছিলেন, পরে নিজেদের বাহুবলে এরা দক্ষিণে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এদের সময় দক্ষিণ ভারতে শিল্প স্থাপত্যের বিকাশও ঘটে। তার প্রমাণ আজও আছে।

তা ছাড়া নৌবহরও এদের ছিল। এদের সময় ভারতের বহু পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করেছে বিভিন্নদেশে। গ্রীস—রোম—এদিকে জাভা—সুমাত্রার দিকেও। এখানের ধ্বংসস্তূপের নীচে বিদেশী অনেক মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

তখন দক্ষিণ ভারতের থাঞ্জাবুর (বর্তমান তাঞ্জোর)-এর চোল, মাদুরায় পাণ্ড্য, এবং বাতাপিতে চালুক্য রাজ-রাজবংশও রাজত্ব করতেন।

তবুও পল্লবরাই সব দিক থেকে তখন প্রখ্যাত ছিল—পরে অবশ্য তাঁরা হীনবল হয়ে পড়লে তখন তাঞ্জোরের চোল রাজবংশই প্রাধান্য লাভ করে।

মহাবলীপুরমকে পল্লবরাই সমৃদ্ধ বন্দর নগরীতে পরিণত করেন, বর্তমানে যেখানে সমুদ্রতীরে জলশয়ান মন্দির আছে তার ওদিকে নগর আরও বহুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল, সেখানে পরপর সাতটি মন্দির ছিল, তাই বিদেশী নাবিকরা ওকে বলত 'সাত প্যাগোডার শহর'। আজ সবই সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে; সমুদ্রের দুরন্ত তাণ্ডবের মুখে টিকে আছে মাত্র একটি মন্দির।

তারও দিন বোধ হয় ঘনিয়ে আসছে।

ছোট জায়গা, একটা পাহাড়কে কেন্দ্র করে কয়েকটি মণ্ডপ, রাস্তার ধারেই প্রথমে পড়ে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডপম্।

একটা পাথর কেটে গুহা তৈরী, প্রথমে চত্বর ভিতরের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের নানা উপাখ্যানে কাহিনী আঁকা। তার মধ্যে গোবর্ধনধারণও রয়েছে। গোদোহন প্রস্তর চিত্রটিও প্রাণময়।

বিমলদা বলে—দেখলে ভায়া পক্ষীতীর্থের সেই গুহা মন্দির ; একই ধরণের। দ্রাবিড় স্থাপত্যের এই খানেই সূত্রপাত, বার বার দেখে যাও বুঝতে পারবে ক্রম বিকাশের পালা, এই ধারা চলেছে এখন থেকে জলশয়াণ মন্দির ওই Shore Temple পর্যন্ত, তারপরই আরও বড় মন্দিরের কথা ভাবো, কাঞ্চিপুরমে দেখবে ধারাটা ঠিক বজায় আছে।

ওপাশেই রাস্তার ধারে প্রায় একশ ফিট লম্বা আর পঞ্চাশ ফিট চওড়া একটা শিলার বুকে মহাবলীপুরমের প্রখ্যাত প্রস্তর চিত্র অর্জুনের তপস্যা খোদিত রয়েছে।

মহাদেবের কাছ থেকে অর্জুন তপস্যা করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছে, অন্যদিকে গঙ্গা আসছেন মর্তে। তার জন্য জীবযুক্ত মরলোক আনন্দে অধীর। ঐরাবত এগিয়ে এসেছে তার গতিবেগ সংবরণ করতে।

পাহাড়ের উপর থেকে জলও বোধহয় নামতো তখন ওই শিল্পকৃতির সার্থকতা বোঝা যেতো, সে ব্যবস্থাও আর নেই। তবু একটা বিরাট পরিবেশে বহু চরিত্রের ভিড় ওই নীরব প্রস্তরকে বাঙ্ময় মুখর করে তুলেছে।

কথিত আছে এই মহাবলীপুরমে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্ম একত্রে বাস করতো। এই গঙ্গাবতরণ চিত্রে শিব এবং বিষ্ণুকেও দেখা যায়।

এখান থেকে পাহাড় ঘুরে উঠবার মুখেই গণেশ মণ্ডপম। গণেশ মণ্ডপমের পরই পড়ে বরাহমণ্ডপম্।

এখানের মূর্তিটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সপ্তফণা বাসুকী নাগের উপর দাঁড়িয়ে আছেন বরাহরূপী দেবতা, দক্ষিণ জানুর উপর ধরিত্রী।

আদি শেষ নাগ ধরিত্রী গ্রাস করে অতলে নিয়ে যেতে চায় বরাহরূপী —দেবতা ধরিত্রীকে সেই রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করছেন।

পাথরগুলো পাহারের মত মাথা তুলেছে। বেশ খানিকটা ঠাঁই জুড়ে এই ছোট্ট পাহাড়ের সীমানা। পাথরগুলো পিচ্ছিল, যাতায়াতের পথও তেমন নেই। ওই পাথরের মধ্যে যেখানে মাটির স্পর্শ পেয়েছে সেইখানে মাথা তুলেছে দু একটা ভাল অন্য বুনো গাছ।

দেখলাম একটা গুহা মন্দিরের বেশ খানিকটা ভাঙ্গা এবং বোধ হয় পোড়ানোও হয়েছিল। এটা শাক্তদের গুহামন্দির ছিল। বৈষ্ণবরা নাকি একে ধ্বংস করে সেখানে বৈষ্ণব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

এর একটু ওদিকে একটা শিলাস্তর পার হয়ে উঠলে আজকের লাইট হাউস, তার ওপাশেই মহাবলীপুরমের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির। মহিষমর্দিনী মণ্ডপম। এর দেওয়াল গাত্রে অঙ্কিত আছে দেবীর মহিষমর্দিনী রূপ। সিংহবাহিনী দেবী অসুর নিধনে রত। ওই দিকে ভিত্তিগাত্রে পদ্মনাভ বিষ্ণু ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত শয়ানে রয়েছেন।

দুটি মূর্তিই অত্যন্ত উন্নত ধরণের। দীর্ঘ অতীতের সব আঘাত সহ্য করে আজও তারা সুন্দর—সার্থক।

এইখানেই দেখা হয়েছিল আমেরিকান তরুণ ক্যামবেলের সঙ্গে। পাতলা সুন্দর চেহারা, ঝাঁসীতে কম্যানিটি ডেভেলাপমেণ্টে কাজ করে, মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বের হয় ভারতবর্ষ দেখতে।

এবার এসেছে দক্ষিণভারতে।

আমরা একটা পাথরের উপর বসে একটা ডাবওয়ালাকে ধরে ডাব কাটাচ্ছি, ও এসে দাঁড়াল।

—ডাব খাও।

তাকেও একটা মুখ-কাটা ডাব দিলাম।

হাসি মুখে হাতে নিয়ে জানায়—স্ট্র নেই খাবো কেমন করে?

সোজা মুখে ফেলবার কায়দাটা দেখিয়ে দিতেই একগাল হেসে সে উবু হয়ে পাথরে বসে ডাব খেতে শুরু করল।

উৎসুক কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে ওরা ভারতে এসেছে, চারিদিকে তার বিস্মিত দৃষ্টি। অবাক হয়ে গেছে সে এই মহাবলীপুরম দেখে।

—কাঞ্চীপুর গিয়েছিলে?

—কাল যাবো। সত্যিই মনে হয় বিরাট একটা অতীত সভ্যতার স্তব্ধ রাজ্যে এসে দাঁড়িয়েছি, মানুষ তাকে পিছনে ফেলে এসেছে।

ক্যামবেল শুনে চলেছে বিমলদার মুখে মহাবলী-পুরমের কথা মুগ্ধ শ্রোতার মত। জিজ্ঞাসা করলাম—বাংলা দেশে গেছো কখন?

যাবো সামনের মার্চে। শুনেছি সেখানে নানা খাবার মেলে—সুইটস্!

ক্যামবেলের কথায় শুধু আমন্ত্রণ জানালাম—কি মিলবে তা জানিনা, তবে এলে খুশী হবো।

বাংলার বর্তমান অবস্থার কথা ওরা জানে না বোধ হয়। ওদের মনেও বাংলা দেশ সম্বন্ধে একটা কৌতূহল আছে।

পাথরের ঢালু পথ দিয়ে নেমে এইবার আমরা সামনেই সমুদ্র তীরের দিকে চলেছি। রাস্তার উপরই কয়েকটা শাঁখ মালা কড়ি ঝিনুক ইত্যাদির দোকান।

একটা শাঁখের দাম বললো ন'টাকা। ইতিমধ্যে ইলাও দেখছি আমাদের সঙ্গে নামছে সেই মন্দিরগুলো দেখে।

বিজয়মাষ্টারের দল বার কয়েক ওকে ডেকে গেছে, ও যায় নি, চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কি যেন একটা ঘটেছে।

বিজলী সরখেল মালার কাকাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সরখেল মশাইও কাছে নেই, একাই সে দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে এগিয়ে আসে।

পুলক বলে ওঠে—ওরা আবার কেন?

বলি—তোর ভয় কি। চল্ না।

পথটা সুন্দর। দুদিকে বালিয়াড়ি, বনঝাউ আর কাজু বাদামের গাছ মাথা তুলেছে। একটু গেলেই দেখা যায় এক শিলা পাথর কেটে কয়েকটি রথের মত মন্দির। একে বলে পঞ্চ পাণ্ডবের রথ।

বিমলদা জানায়—অনেকে আবার বলে, এদের নির্মাণকর্তা নরসিংহ বর্মণ ছিলেন পরম শৈব, এই রথগুলি শিব, পার্বতী, গণপতি কার্তিকেয় এবং শিব অনুচর নন্দীর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। রথগুলির কাছে ওদের বাহনদের দেখে এই কথার সত্যতাও মনে হয়।

ব্যাপারটা সত্য কিনা জানি না। তবে রথের নির্মাণ শৈলীর একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। দ্রৌপদীর রথটি একেবারে বাংলা দেশের খড়ের চালাঘরের মত।

যুধিষ্ঠীরের রথটিই বড়।

দ্রৌপদী এবং অর্জুনের রথ পাশাপাশিই।

হঠাৎ ইলার হাসির শব্দে খেয়াল হ'ল। অনেক স্থানীয় দর্শকেরও ভিড় হয়েছে, বালির উপর ডাবের স্তূপ রেখে বিক্রী করছে। ওপাশে অর্জুনের রথের সামনে এক নিকষ কালো সিটকে স্থানীয় ধরণে হাতপা দাঁত মুখ খিচে অর্জুনের গাণ্ডীবটানার পোজ নিয়েছে—আর তারই এক বেরাদার একটি বক্স ক্যামেরায় তার সেই বিশেষ পোজের মূর্তিটির ছবি নিতে ব্যস্ত।

টিকুদা আমাদের পিছনেই ছিল—মাঝে মাঝে সে বিকট আওয়াজ ছাড়ে, হঠাৎ ওই ক্যামেরাম্যানের কাছে গিয়ে আনমনে তেমনি এক আওয়াজ ছাড়তেই ওরা চমকে যায়। টিকুদা অবশ্য সহজ ভাবেই পরম আগ্রহ নিয়ে সেই রথের কারুকার্য দেখতে থাকে, ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

একটি এলাকার মধ্যে এই রথগুলি। এরপর আবার সেই পথ ধরে বসতির দিকে ফিরে আমরা চলেছি, একপাশে নোতুন মিউজিয়াম—সেখানে পাথরের বুকে আজকের শিল্পী নোতুন করে ভাস্কর্য নিয়ে কাজ করছে। অতীতের সেই বিস্মিত ধারাকে আবার প্রবাহিত করার চেষ্টা চলেছে।

সেই পথ ছাড়িয়ে ঝাউবনের পাশদিয়ে চলেছি আমরা সামনেই ঊর্মিমুখর উত্তরোল সমুদ্র, তারই তীরে একটি মন্দির। দেখতে অনেকটা প্যাগোডার মত। এমনি সাতটি মন্দিরই ছিল সবগুলি গেছে সমুদ্রের গহ্বরে। বাকি মাত্র এইটিই। একেবলে Shore Temple —প্রসিদ্ধ তামিল বৈষ্ণব গ্রন্থ নালয়িরা প্রবন্ধে এর নামোল্লেখ আছে তালশান বা স্তালশয়ান (Talasayana বা stalasayana)।

সুন্দর একটি মন্দির। পিছনে এখনও পাথরের একটা আবেষ্টনী আছে, সমুদ্র সেখানে দুর্বার শক্তিতে হানা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জলের ঝাপ্টা উঠে এসে দর্শকদেরও ভিজিয়ে দেয়। নোনা হাওয়ায় মন্দিরের অনেক স্থান ক্ষয়ে গেছে। এবারের সাইক্লোনের চিহ্ন ওর চারিদিকে, সমুদ্রের তুফান এসে এখানে মন্দিরের সামনের তটভূমিতে আঘাত করেছিল।

ঝাউগাছগুলো ভাঙ্গা পড়ে আছে। বৈকাল হয়ে আসছে। পড়ন্ত আলোয় মন্দিরটা ছায়ামূর্তির মত দেখায়। পিছনে ওর অন্তহীন নীলা সমুদ্র।

ওরা সবাই বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে ফিরে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছি আমি। মনে হয় বিরাট এক মহাকাল যুগযুগান্তের সব চেতনা সব ধর্ম সব মানুষকে তার সীমাহীনতার অসীমে একটি নিশ্চিত ভবিতব্যে পরিণত করে চলেছে।

ওপাশে দেখি আলসের উপর বসে আছে বিজলী।

—ফিরবেন না? একা এখনও বসে আছেন এখানে?

আমার দিকে চেয়ে উঠে এল সে।

সুন্দর স্বাস্থ্য। মাথার কুঞ্চিতকেশে লেগেছে সমুদ্রের জলকণার স্পর্শ। চোখদুটো কেমন ভারি। বলে ওঠে—মনে হয়েছিল আর যেন না ফিরি!

ওর কথায় অবাক হই। ঝাউবনে বাতাসের শন্ শন্ সাড়া জাগে কেন?

বিজলীর দু চোখে কি যেন গভীর বেদনা। একটু ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বের হয়। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে সে বলে—সমুদ্রের বুকে ওই উথলপাথাল দেখেছেন—মানুষের মনের অঙ্গনে বেদনার ঝড় তার চেয়ে কি কম ?

সন্ধ্যা নামছে সমুদ্র ও ঝাউবনে সন্ধ্যার অন্ধকারে কি হাহাকার জাগে, বিজলীর মনে তারই সুর লেগেছে। ওর কথায় জবাব দিই।

—তবু বেদনা সয়েও মানুষ বেঁচে থাকবে।

বিজলী আমার দিকে চাইল।

বাসষ্ট্যাণ্ডের আলোগুলো জ্বলে উঠছে। ক্লান্তির মুখে কফি আর ওই বড়া তখন অমৃত বলে বোধ হয়। এবার আমাদের মাদ্রাজ ফেরার পালা।

সোজাপথে গাড়ী এবার পাড়ি জমাবে তেত্রিশ মাইল পথ।

সকালের প্রথম আলো তখনও ফোটেনি।

বাইরে অন্ধকারেই ভেল্লুপুরম থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে চলেছি পণ্ডিচেরীর দিকে।

কোন মন্দির নেই কোন পৌরানিক কাহিনীও একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। তবু মনে হয় আজকের দক্ষিণ ভারতের এ একটি অন্যতম পীঠস্থান। তীর্থক্ষেত্রে মানবাত্মাকে নতুন করে উদ্বোধন করে তাকে মহিমাময় রূপে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনক্ষেত্র এই পণ্ডিচেরী। এই মহাতীর্থের তীর্থদেবতা মহামানব শ্রীঅরবিন্দ।

মাদ্রাজ থেকে মিটার গেজে দক্ষিণে যাবার পথে ভেল্লুপুরম একটি প্রধান জংশন ষ্টেশন। এগোমর থেকে ১৫৯ কিলোমিটার দূর এখান থেকেই পণ্ডিচেরীর শাখালাইন গেছে, পণ্ডিচেরী এখান থেকে ৩৮ কিলোমিটার। মাদ্রাজ থেকে মোট ১৯৭ কিলোমিটার ট্রেনে, সোজা বাসরুটও আছে। তাতে সময় লাগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।

আকাশে ভোরের আলোর আভাষ ফুটছে। ঘুম আসেনি আর। কানে আসে ইলার সেই আবৃত্তিটা।

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনে শৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।
বন্ধন-পীড়ন দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থ যাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদাত্ত মৃত্যুর।

শ্রীঅরবিন্দকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটা ছত্র আজ মনে দোলা দেয়,···ভোরের আলোয় দূর প্রান্তর সন্তজাগা ঝাউবন, পাখীর কলকাকলি, মনে হয় না যে বাংলা থেকে হাজার মাইলেরও বেশী দূরে এসে পড়েছি।

এমনি একটি দেশে ১৯১০ খৃঃ একটি মানুষ বাংলা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন নতুন করে ভারতবর্ষ তার মানুষকে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে।

তার লেখাতেই এক জায়গায় আছে।
"God must be born on earth and be as man
That man being human may grow even as God."

চারিদিকে নারকেলের কুঞ্জ—ফলে ফলে গাছগুলো ভরে উঠেছে দু-একটা আম গাছের প্রহরা; পণ্ডিচেরী ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। এইখানেই এই লাইনের শেষ।

বেশ বড়সড় ষ্টেশনই।

সকাল থেকেই আকাশ যেন ছিঁচ কাদুনে মেয়ের মত থেকে থেকে

কাঁদছে। দক্ষিণ ভারতের উপকূল অঞ্চলে বৃষ্টি ঝড় সাইক্লোনের নিত্য আনাগোনা। হলেই হলো আর কি।

…তারমধ্যেই স্নান সেরে তৈরী হয়েছি। আশ্রম থেকে ইতিমধ্যে গাড়িও এসে গেছে। সঙ্গে এসেছেন ওদের একজন লোক। পরিষ্কার ভদ্র মার্জিত বাঙ্গালী একজন।

বৃষ্টি নেমেছে তরেই মধ্যে আমরা ষ্টেশন থেকে আশ্রমের দিকে চললাম। ছোট্ট সহর পণ্ডিচেরী।

তবু এককালে ফরাসী আমলে এর নাম ডাক ছিল। ভারতের এইটি শেষ ফরাসী উপনিবেশ।

রাস্তার নাম এখনও সেই ফরাসী ভাষাতেই রয়েছে। দুদিকে দোকানপসার, কিছু কুলিবস্তী, পণ্ডিচেরীতে এখন একটা সুগার মিল, দুটো কাপড়ের কল চলে।

ছোট শহরের পক্ষে এও কম নয়।

একটু এসেই একটা পাকা বড় নর্দমা—এইটাই নাকি আগে ব্লাকটাউন এবং ফ্রেঞ্চ হোয়াইট টাউনের সীমারেখা ছিল। আজ সব একাকার হয়ে গেছে।

একটু ওপাশেই পণ্ডিচেরী পুলিশ হেডকোয়াটার। বর্তমানে পণ্ডিচেরী কারিকল এবং মাঝে এই তিনটি ফরাসী উপনিবেশ ভারত-সরকারের অধীনে আসার পর এদের নিয়ে কেন্দ্রশাসিত একটি অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। পণ্ডিচেরী তাদের সদরদপ্তর।

রাজ্যপালের বাসভবন দেখলাম। সেন্ট্রাল পার্কের পাশেই বিরাট প্রহরীবেষ্টিত একটি ভবন, আগে এটা ফরাসী গভর্ণরের বাড়ি ছিল।

রাস্তায় পুলিশের পোষাকও একটু বিচিত্র ধরণের। মাথার টুপিতে এখনও সেই ফরাসী পোষাকের প্রভাব রয়েছে। তবে বর্ণ মিশকালো আর পায়ে সেই স্লিপার।

পণ্ডিচেরী সহরের সমুদ্রের বীচ তেমন নেই, যদিও আছে তাও

শহর থেকে দূরে। সহরের ষ্ট্রাণ্ড পাথর দিয়ে শক্ত করে বাঁধানো, দুরন্ত বঙ্গোপসাগর এসে আছড়ে পড়ে ওর বুকে। সমুদ্রে একটা জেটি ভেঙ্গে পড়ে আছে। অন্যদিকে নতুন বন্দরে আবার জেটি তৈরী হয়েছে, দু-একটা জাহাজও কাছাকাছি নোঙর করে আছে।

এদিকে নির্জন সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট বাড়িগুলো, সোজা ঝকঝকে তকতকে রাস্তা চলে গেছে এদিক ওদিকে। শান্ত নির্জন পরিবেশ। রাস্তায় আকাশ ছোঁয়া বাড়ির উৎপাত নেই, অধিকাংশই দোতলা সাদা রং-এর বাড়ি।

আমাদের আশ্রম থেকে নিতে এসেছিলেন রবিবাবু, আশ্রমের অন্যতম কর্মী। তিনিই শোনালেন।

এসব আসামের বাড়ি। ' সারা শহরে এমনি প্রায় সাড়ে তিনশো বাড়ি আছে আশ্রমের। সেখানে আশ্রমবাসীরা থাকেন, কোনটায় বা বিভিন্ন বিভাগেয় কাজকর্ম চলে।

পোস্টাপিস তার পরই আশ্রমের মূল অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। বৃষ্টি তখন বন্ধ হয়েছে। তবে আকাশ থমথমে।

উঠোনে কোথাও জায়গা নেই। শুধু ফুল আর ফুল। রকমারি ফুল, একটা মাধবীলতার ঘন আবেষ্টনী পথটুকুকে ঢেকে দিয়েছে। সামনেই একটা বড় ঘরে শ্রীঅরবিন্দের ছবি, কিছু বই। ভক্তরা সেখানে শ্রদ্ধা জানায়।

ওপাশে আশ্রমের প্রকাশিত বই ছবি ইত্যাদির প্রদর্শন এবং বিক্রয় কেন্দ্র।

আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্র দেখবার আগেই শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গেলাম। আশ্রমের মেডিটেশন হল—শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহৃত কক্ষগুলোও সাধারণের জন্য খোলা হয়। বেলা বারোটার পর। বিমলদা বলে—

তাই সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আশ্রম ঘুরতেই হবে, ফিরে এসে ওসব দেখা যাবে।

স্তব্ধ একটি শুচিস্নাত পরিবেশ।

মৃত্যু এখানে মূক ভাষাহীন সুন্দর একটি সত্যের রূপে পরিস্ফুট। কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়াঘন মৃত্তিকায় গড়ে উঠেছে শ্বেতমর্ম আর কৃষ্ণমর্মরের সেই সমাধিবেদী।

এর ফুল কখনও মলিন হয় না। সেদিন দেখলাম সমাধিবেদী কাঠবাদাম গাছের নধর কচি পাতার সবুজ স্পর্শে আবৃত—তার উপর ফুলের সমারোহ, সমস্ত স্থানটা সেই সৌরভে আমন্থর। মূক স্তব্ধ মানুষ, আশ্রমবাসী শিশুরদল ফুল হাতে আসে বেদীতে নিবেদন করে সেই পুষ্পদল, বিনম্র শোভাযাত্রায় সবাই যায়। এখানের আকাশ বাতাস সেই পবিত্র আত্মার স্পর্শে প্রাণময়। মনে হয় শ্রীমার সেই বাণী :—

"Lord, this morning thou hast given me the assurance that thou wouldst stay with us until thy work is achieved, not only as a consciousness which guides and illumines but also as a dynamic Presence in action. In unmistakable terms thou hast promised that all of thyself would remain here and not leave the earth atmosphere until earth is transformed."

তাই বোধহয় এই সমাধি মন্দির এত পবিত্র মনে হয়। দক্ষিণ ভারত তীর্থ পরিক্রমায় বের হয়েছি, পদে পদে ওই মন্দির অতীত ভৈরব দেখে মনে বিস্ময়ই জেগেছে। ভক্তি নয়, অন্তরের আকুতিও জাগেনি। এ শুধু বিস্ময় আর কৌতূহল।

এখানে এসে মনে হয় দৈব নয়—মহামানবের চরণপ্রান্তে একটি অতিসাধারণ মানুষ আমি আমার প্রণাম জানিয়ে ধন্য হলাম। তাই মনে হয় পণ্ডিচেরী এ যুগের মানবতীর্থ, আত্মার আত্মীয়। এখানে এসে আমি ধন্য হয়েছি।

বিরাট এক কর্মযজ্ঞের আমরা নিমিত্ত মাত্র। যে কাজ করছে

তারই মধ্যে দিয়েই চলেছে তার সাধনা। আত্মাকে জানার এই সবচেয়ে বড় পথ, কর্ম যোগ। আমরা সবাই সাধক-কর্মী।

বলে চলেছেন আমাদের প্রদর্শক।

আশ্রমের প্রশস্থ শান্ত পথে চলেছি আমরা। এ সাধকদের গেরুয়া নেই বসায় চীনাংশুক নেই। সাধারণ সাদা ধুতি পাঞ্জাবী, না হয় সাদা জিনের হাফ প্যান্ট সার্ট, পায়ে অতি সাধারণ জুতো। পোষাকের বাহুল্য কোথাও নেই। তবে পরিষ্কার। আশ্রম থেকেই পোষাক-পত্র দেওয়া হয়; আশ্রমের ধোপাখানা আছে নিজস্ব। প্রতি আশ্রমবাসী পাঁচখানা করে জামাকাপড় সপ্তাহে সেখানে ধুইয়ে নিতে পারে—খরচও আশ্রমের।

১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ চন্দনগর থেকে এখানে চলে আসেন। আলিপুরের মামলায় খালাস পেয়ে তখন তিনি কলকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনা করছেন। ব্রিটিশ সরকার যে কোন উপায়ে হোক শ্রীঅরবিন্দকে শেষ করতে চায়, চক্রান্ত চলেছে। সংবাদ এলো সিস্টার নিবেদিতার কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে, এখান থেকে চলে যাও ফরাসী চন্দননগরে। ইংরেজ রাজ্য আর নিরাপদ নয়।

শ্রীঅরবিন্দ তখন দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন। এ যেন তাঁর জীবনদেবতারই নির্দেশ। তাই চন্দননগরেই গেলেন সেখান থেকে। এসে উপস্থিত হলেন ১৯১০ সালে এই পণ্ডিচেরীতে।

১৮৭৮ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীমা। তাঁর পূর্বের নাম মীরা। শিশুকাল থেকেই তিনি এক মহাজীবনের সন্ধানী। শিল্পকলা সাহিত্য সঙ্গীত সব কিছুতেই তাঁর অগাধ জ্ঞান। তবু মাঝে মাঝে মনে তাঁর অসীমের আহ্বান। অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি স্বদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে আসেন ১৯১৪ সালে ২৯শে মার্চ। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে মনে হয় এই সেই মহাপুরুষ সেই স্বপ্ন-দেখা দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তরিত মহাসাধক।

মন বলে এই ভারতের পূণ্য মৃত্তিকাই তাঁর সাধনক্ষেত্র, "—It

matters not if there are hundred of beings plunged in the densest ignorance. He whom we saw Yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be trams-formed into light, when thy reign shall be indeed estabished on earth."

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এখানে থাকা তার সম্ভব হয়নি, পরে ১৯২০ সালে তিনি পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন। তখনও আশ্রমের শিশু অবস্থা। পরে আরও আশ্রমবাসীরা ক্রমাগত আসতে থাকেন। ১৯২৬ সালে আশ্রমের সব পরিচালনা ভার শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের হাতে তুলে দেন।

সেই থেকে আজ আশ্রমের বাসিন্দা সংখ্যা প্রায় ষোলশো—তাদের নিয়ে এক আদর্শ যৌথ একান্নবর্তী সংসার গড়ে উঠেছে!

এখান থেকে বারো মাইল দূরে আশ্রমের খামার। প্রায় পঞ্চাশ একর জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষ করে সারা আশ্রমের অন্ন-সংস্থান হয়েও বাড়তি ধান বেশ কিছু থাকে।

তবে এখানের আবহাওয়ায় দুবার ধান হয়।

তাছাড়া আশ্রমের নারকেল বাগান কলার ক্ষেতে ফল-ফসলও হয়।

কৃষি বিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্মী শ্রীভট্টাচার্যের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ছিলেন টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিস্টান্ট ইন্‌জিনিয়ার। আজ চাকরীতে বহাল থাকলে তিনি অনেক উন্নতি করতেন।

কিন্তু দেহ নয়—মনের খোরাকও চাই। আত্মানুসন্ধানেই তিনি সব ছেড়ে ওই কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। কি পেয়েছেন তার উত্তরও ওঁর কথাতেই পেয়েছি।

আনন্দ-তৃপ্তি—সার্থকতা তার নামান্তর।

স্কুল—উচ্চতর স্কুল-চিত্রকলা বিদ্যালয়—পাঠাগার সবই দেখলাম। চিত্রকলা বিদ্যালয়ে ছেলেদেরও কাজ করতে হয়, শ্রীমায়ের আঁকা কয়েকটি ছবিও সেখানে রয়েছে। মিষ্টিক রীতির কাজ—দেখে মন ভরে। কল্পনায় একটি আত্মদর্শনের অনুভূতি জাগে সারা মনে।

শান্ত স্তব্ধ সবুজ পরিবেশে বিরাট একটি তিনতলা বাড়ি আশ্রমের পাঠাগার। পুস্তক সংখ্যা ষাট হাজারেরও বেশী। এ পাঠাগার থেকে বই ইস্যু করার নিয়ম নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে পড়া যায়। অনেক গবেষণামূলক কাজও সেখানে হয়।

প্রেস—প্রকাশন বিভাগও বিরাট। ট্রেডেল ফ্লাট তো আছেই, লাইনো মেসিনও রয়েছে। অতি আধুনিক সরঞ্জামের ছাপাখানা থেকে রীতিমত কয়েকখানা মাসিক পত্রিকাও বের হয়। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ, হিন্দী, সংস্কৃত, পাঞ্জাবী, মারাঠী, বাংলা, গুজরাটি, ওড়িয়া, তামিল, কানাড়া, চীনা ভাষায় ছাপার কাজ হয়।

তাছাড়া আছে ছুটি কারখানা—এখানে স্থানীয় কর্মীর সংখ্যা প্রায় সাতশো, তারা মাইনে পান। মোটর গ্যারেজ, লণ্ড্রী, বেকারী, তেলকল, ছোবড়া থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরীর কারখানা, কাগজ তৈরী শিল্পও আছে। এখানে তৈরী ব্যাগবণ্ড এবং কার্টিজ পেপারের বিদেশে চাহিদা প্রচুর, কাগজের মানও উন্নত ধরণের।

ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ, সুইপিং স্কোয়াড সবই আছে। সবকিছু মিলিয়ে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। মানুষের দৈনন্দিন সভ্যতায় যা যা লাগে সবই আশ্রমে তৈরী হয় নিজেদের প্রয়োজনে। হোসিয়ারী—এমব্রডয়ারী বিভাগও বেশ উন্নত।

বর্তমানে চারতলা বিরাট একটি বাড়ি তৈরী হচ্ছে—এ বাড়ির কাজ শেষ হলে অনেক বিভাগই এখানে উঠে আসতে পারবে।

বাইরে থেকে অতিথিরা প্রায়ই যান, তাঁদের থাকার জন্য আছে কয়েকটি রেষ্টহাউস। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয় আশ্রম থেকে।

পাশ্চাত্য রীতিরও একটি বিরাট হোটেল তৈরী করা হয়েছে। সেখানে শুনলাম ডিম-মুর্গীও চলে। খাওয়ার কোন বাছবিচার নেই।

তবে আশ্রমে ধূমপান বা অন্য কোন নেশার দ্রব্য নিষিদ্ধ। এটা গোড়ামি নয়—চিত্তশুদ্ধির জন্য বোধহয় এর প্রয়োজন।

ঘুরছি—হঠাৎ বৃষ্টি নামল আবার।

পথের ধারেই একটি ছোট সুন্দর আইভি লতা ঘেরা বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এটি ছোট ছেলেমেয়েদের হোষ্টেল।

এমনি হোষ্টেল আশ্রমে বহু আছে।

সেখানে বাড়ির মত যত্ন নিয়ে ছেলেমেয়েদের রাখা হয়। খাবার ব্যবস্থাও তাদের আলাদা।

উঠোনে ফুলের বাগান—মধ্যে একটি লিলি পণ্ড। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা এখানে বাড়ির কথা ভুলে নতুন সঙ্গীদের মাঝে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

মাঝে মাঝে তারা নির্দ্ধারিত এক একটি দিনে যায় শ্রীমাকে দেখতে —ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন—কাছে টেনে নেন।

এখানে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারেও শ্রীমায়ের নির্দেশ আছে। সব ছেলেমেয়েদের ভর্তির ফর্মের সঙ্গে ছবি পাঠাতে হয়—ছবি দেখে তিনিই নির্দেশ দেন। কাকে নেওয়া হবে। বর্তমানে এখানের উচ্চশিক্ষা নিয়ে কয়েকটি ছাত্র ভারত সরকারের উপপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। I. A. S., I. P. S. পরীক্ষায় এখানের অনেকেই যোগ দেন।

প্রতিটি মানুষের করণীয় কিছু আছে।

সবাই শুচিস্নাত আত্মার—উপলব্ধি করা তাদের ব্রত। কর্মযজ্ঞের মধ্যে তারা নীরবে সেই ব্রত পালন করে চলেছেন।

—খাবার ব্যবস্থাও সুন্দর। সাধারণ খাবার জায়গায় প্রায় যোলশো লোকের খাবার ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমবাসীরা এসে খেয়ে যান যথা সময়ে, অসুস্থ বা কর্মব্যস্ত

মানুষের জন্য গাড়িতে করে খাবার তার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থাও আছে।

আশ্রমের তৈরী জিনিসপত্র, বিক্রয়কেন্দ্র সত্যই দেখবার বস্তু। এখানে এসে এক নজরে বোঝা যায় এদের কাজকর্ম। ষ্টেনলেশ ষ্টিলের বাসনও তৈরী হয় এবং কলকাতার তুলনায় তা দামে বেশ সস্তাও।

বেলা হয়ে গেছে।

ওরা কেনাকাটায় ব্যস্ত। নেত্যবাবু থালা গেঞ্জি চামচ এটাসেটা কিনছে। আর বিজয় মাষ্টার সকাল থেকে আশ্রমের সঙ্গীত বিভাগের কাকে ধরেছেন।

—আজ সন্ধ্যায় একটু গানের আসর হোক।

একেবারে বেহায়ার মত লেগেছে, এখানের কেউ তার দলবলের গান না শুনলে তিনি নিজেই মাঠে ঘাটেই আসর বসাবেন আর কি।

ছাত্র ছাত্রীদের তফাতে এসে বলে।

—আরে হবে না মানে? বিজয় মাষ্টার কি যে সে লোক নাম শুনেই তো ওরা অস্থির। আজ সন্ধ্যায় গান হবে।

যে যার তালে ব্যস্ত।

বিজলী সরখেলের পিছু পিছু রয়েছে সরখেলমশাই, তাকে আজ হাতছাড়া করবে না সে। বোধ হয় স্ত্রী জাতিকে তার বিশ্বাস নেই।

আমরা ফিরে এলাম আশ্রমে।

কটি প্রাণী ওদের এড়িয়েই চলে এসেছি। বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারে। সমাধিবেদীর পাশ দিয়ে ভেতরের চত্বরে গেলাম।

শান্ত শুদ্ধ এ জগৎ!

বাইরের কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রায়ন্ধকার ঘরে মার্বেল পাথরের মেজে, সামনে অন্ধকারে নীলাভ মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের একটি মূর্তি—ধূপের স্নিগ্ধ সৌরভে এখানের বাতাস আমন্থর।

সারা মন সব কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি শুদ্ধ প্রশান্তির

অঞ্চলে বিলীন হয়ে যায়। মেডিটেশন হ'লের উপরেই শ্রীঅরবিন্দের বাসকক্ষ, লাইব্রেরী ঘর, পড়ার ঘর।

মেজেতে পুরু কার্পেট পাতা। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ এক ফালি আলো এসে পড়েছে প্রস্তর মূর্তির উপর। এই কক্ষেই তাঁর সব রচনার কাজ করেছেন, এই নিভৃত কক্ষ থেকেই তাঁর জীবনদর্শনের বাণী ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব মানসে।

অমৃতপথযাত্রী দিব্যলোকের সন্ধান দিয়েছেন এ জগতের। প্রপীড়িত মানবাত্মাকে।

God must be born on earth and be as man.
That man being human may grow ever as God.

অন্তরের নিঃশেষ প্রণতি জানাই ক্ষুদ্র আমি। মনে হয়,

—তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তার? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো?

বাইরে বৃষ্টির অঝোর ধারা চলেছে। সমুদ্রে জেগেছে তুফান। বিরাট প্রকৃতির ওই উতরোল মত্ততার মাঝ দিয়ে স্তব্ধ বিনম্র মন নিয়ে ষ্টেশনের দিকে ফিরলাম।

—বৈকালেই আবার আসবো।

প্রিয়জনের মত রবিবাবু জবাব দিলেন।

—আসুন।

দুপুরে দু'একবার বৃষ্টি থামলো। মনে হয় ফরসা হবে। বৈকালের ম্লান আলো বর্ষণক্লান্ত মেঘের ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে নারকেল

বনে। এলোমেলো বাতাস সেখানে সিমন্তনীর সিঁথির আভাস রচনা করেছে নারকেল কুঞ্জের শীষে।

বিজয় মাষ্টার ইতিমধ্যে তামিল শুরু করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ওয়েটিংরুমেই। যাত্রীর ভিড় এখানে বিশেষ নেই। তাই বিজয় মাষ্টার তা না না সুরু করেছে।

দু'চারজন কৌতূহলী লোকও জুটেছে।

ইতিমধ্যে যাত্রীদের সকলকেই বলা হয়ে গেছে ওর গানের কথা স্বয়ং শ্রীমা নাকি আদেশ দিয়েছেন।

কয়েকটা রিক্সায় করে সপার্ষদ বিজয় মাষ্টার দিক্‌-বের হলো। আরও কারা গেল।

দেখি সরখেলমশাই একপাশে গিন্নীকে কি বোঝাচ্ছে। বিজলী সরখেল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শোভাযাত্রায় যায় নি ইলা।

—যাও নি ?

ইলা চুপ করে ছিল। ক'দিন থেকেই দেখছি বিজয় মাষ্টারের সঙ্গে তার যেন একটা মতান্তর চলেছে। সেই মহাবলীপুরমের ঘটনা নিয়ে বোধ হয় কিছু বলেছে। ইলা জবাব দেয়—

—না, গেলাম না। ওবেলায় বৃষ্টিতে ভিজেছি। শরীর ভাল নেই।

বিমলদার ডাকে ওদিকে গেলাম। ষ্টেশনেই কফির দোকানে দাঁড়িয়ে স্থানীয় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক এখানের রেভিনিউ অপিসে কাজ করেন। সেই লুঙ্গির মত পাট করা সাদা থান, গায়ে বেনিয়ান আর ভাঁজ করা চাদর।

কথা হচ্ছিল আশ্রমের সম্বন্ধেই। তিনি বলেন,

—আশ্রম এখানে সাধারণের কাজও অনেক করে। সহরের কিছু লোকেরও সুবিধা তাতে হয়।

কি রকম ?

ধরুন কোন বাড়ি বিক্রী হচ্ছে সহরে, কেউ সেটা নয় ছয় করে

নিতে চায়, আশ্রম ন্যায্য দাম দিয়েই সে বাড়ি কিনে নেন। রাগ তো তাদের হবেই। কিছু লোককে কাজকর্ম দিয়ে তাদের পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আশ্রম উপকার করেন। মাদারও তাদের সম্বন্ধে সচেতন। তাই স্বার্থপর কিছু লোক দল বেঁধে সেবার আশ্রমকে আক্রমণ করেছিল। অবশ্য তারা সহজে পার পায় নি। আশ্রমবাসীরাও ননীর পুতুল নয়। তারপর কেন্দ্রিয় সরকার এখন পুলিশ পাহারা চেয়েছেন। সে ভাবটাও আর নেই, ওটা সাময়িক উত্তেজনাতেই ঘটেছিল।

রামনাড়ু আবার দেখলাম বেশ লেখাপড়া জানা লোক। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তার পড়াশোনাও আছে। বলে—বুঝলেন পণ্ডিচেরী মানেই আজ ওই আশ্রম। সারা ভারতের মধ্যে এটি একটি তীর্থ।

গল্প করতে করতে চলেছি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এখানের রেডিও রিপোর্টে নাকি ঘোষণা করেছে, সাইক্লোন হতে পারে। বৃষ্টির আভাস শুরু হ'ল।

দেখতে দেখতে কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, এলোমেলো বাতাস বইছে, কাঁপছে গাছ-গাছালি। সমুদ্রের রূপ বদলে গেছে।

কালো-কালো জলভরা মেঘগুলো নেমেছে সমুদ্রে—উত্তাল গর্জনমুখর সমুদ্র, বিরাট ঢেউগুলো এসে ভাঙছে—জল ছিটকে ওঠে। জাহাজগুলোকে অনেক দূর সমুদ্রে নিয়ে গেছে ওরা—আলো জ্বলছে তাতে, আবছা দেখা যায়।

জনহীন আতঙ্কময় সমুদ্রতীর দেখি ছুটি মানুষ দাঁড়িয়ে ভিজছে। বর্ষাতিতেও এ জল মানে না। দেখি নেংটি ইঁদুরের মত সরখেল মশাই ওই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে তার স্ত্রী বিজলীকে সমুদ্রের ঢেউ দেখাচ্ছে পাগলের মত।

—দেখ দেখ—কী ভীষণ! কী সুন্দর! ওই আসছে বিজলী!

বৃষ্টিতে ভদ্রমহিলা ভিজে স্যাপ্‌স্যাপে হয়ে উঠেছেন। মাথা গা বয়ে বৃষ্টি নামছে।

…পণ্ডিচেরীর এককালে ফরাসি রাজ্য ছিল, তাছাড়া বন্দরও। তাই ওখানকার জীবনযাত্রায় একটা বেপরোয়া ভাবই ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় রসিক সজন এখনও আসে। বিদেশী কিছু টানা মাল, মদও নাকি অন্ধকারে এখানে চলে। পথে দেখলাম অনেক বিদেশী মদের দোকান দিশী বস্তুও আছে এখানে ওখানে ঘাপ্‌টি মেরে। রাতের এই পণ্ডিচেরী এখনও রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। কফিখানার বয় এগিয়ে আসে।

—কফি,—বড্ডা!

ছোকরা কলাপাতায় গরম বড়া ভাজা এনে দিয়ে বলে—কাটলেট, এগ্‌স্‌…

আরও কি যেন বলতে গিয়েও থামল সে, অর্থাৎ নিছক কফি বড়ারই দোকান সে করে নি, বর্ষা রাতের অন্ধকারে দরকার হলে চাঙ্গা হবার মতও কিছু আছে। বলে চলেছে সে,

—হামি বাংলা জানে। বালিগঞ্জে কাজ করেছে। কমলাভিলা —কেরল হোটেলে—

কাটলেট খাচ্ছে অনেকে। বেশ বড় কাটলেট চার আনা দাম। ছোকরা বলে ওসব শার্কের কাটলেট।

হাঙ্গর ধরা পড়ে প্রায়ই, হাঙ্গরের মাংসের কাটলেটই চালায় বোধ হয়। তবে সে অভয় দেয়।

—ভালো ফিশ ফ্রাই আছে। ভেটকির ফ্রাই।

ছোকরার কথায় তবু সাহস হয় না। সে বলে চলে।

—আশ্রমের বাবুরাও আসেন এখানে—বাঙ্গালীবাবু। কথাটা সৈবব মিথ্যা। তাঁদের কেউ যে এখানে আসবেন তা মনে হয় না, ওটা চালমাত্র।

ছোকরা তবু কাজ হাসিল হ'লো না দেখে তাক্ খুঁজছে।

—বুঝলেন অন্ধকারে এখানে ভালো বিদেশী মদও আসে। এখানে

—কি করছেন দাদা ?

বিজলী বলে উঠে—দেখুন পাগলামি। ভিজে নেয়ে গেলাম, শীতে কাঁপছি বলে ঢেউ দেখতে হবে।

সরখেল ভিজে ঢোল হয়ে গেছে তবু দাপাচ্ছে—পয়সা দিয়েও কলকাতায় এ দৃশ্য দেখতে পাবেন না মশাই, দেখুন। ওই আসছে, ভাঙলো! ইয়া—দেখ দেখ বিজলী!

বিজলী বলে, তুমিই ছ'চোখ ভরে দেখো। চলুন, ষ্টেশনে যাবেন তো ?

স্ট্যাণ্ডের ধারেই একটা বড় বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালাম, ওটা নাকি পণ্ডিচেরীর এস-ডি-ও কোর্ট। ওপাশে মেয়রের অফিস।

বাতাসের দাপাদাপি চলেছে। রাত্রি নামে শহরে। বৃষ্টির ধমকে পথ জনহীন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ছ'একটা আলো জ্বলছে। শহরের বাড়িগুলোও এমনি যে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার মত আশ্রয় নেই। ভিজতে ভিজতেই ফিরছি।

—স্টেশন কোন দিকে ?

এক ভদ্রলোক আমার ইংরাজী শুনে ছাতার নীচে থেকে জবাব দিলেন। ভাষাটা অচেনা।

—স্পিকিং তামিল।

—নো। ফ্রেঞ্চ!

পণ্ডিচেরীতে এখন ? ফরাসী ভাষায় চল আছে আশ্রমে তো শেখানো হয়ই, বাইরেও কিছু চলে ও ভাষা। শেষকালে ইংরাজীতেই জবাব দিলেন।

বৃষ্টির ধারা প্রবাহে সেই শুকনো বাঁধানো নর্দমায় নদীর স্রোত নেমেছে। শীতে কাঁপুনি ধরে বর্ষায়।

বিজলী সরখেলকে নিয়ে সরখেল মশাই এগিয়ে গেল স্টেশনের দিকে। আমরা একটা কফির দোকানে ঢুকলাম শহরের এদিকের সীমানায়।

ওসব ঢালোয়া, তাছাড়া পোর্ট এরিয়াতো, ওপাশে দেখবেন সব ব্রাহ্মণ গার্ল আছে অনেক!

ছোকরা সেই ব্রাহ্মণত্ব জাহির করছে। এখানে সব ব্যবসার দালালীই যে করে। বিমলদা ধমক দিয়ে ওঠে,

—কফি আনো দিকি, যতো সব বাজে কথা।

তাগাদা দেয়—লে গিলে কুটে লে দিকি। ভিজে কাপড় জামা গায়ে; পথে সর্দি হলে কে দেখবে! এখনও তামাম দক্ষিণ বাকী।

ছোকরা দেখল চোখের সামনে শিকার জাল কেটে বের হয়ে গেল—মুখবুজে কফি এনে দিয়ে সরে গেল।

বৃষ্টি তখনও থামেনি।

ষ্টেশনে এসে দেখি সাজ্ রব পড়ে গেছে। সাইক্লোনের সিগন্যাল আছে, ষ্টেশনমাষ্টার তাই তদারক করে সাইডিং রাখা আমাদের গাড়ি-খানাকে লাইনের সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধার ব্যবস্থা করছেন।

সঙ্গীতশিল্পীর দল তখনও ফেরেনি।

সরখেলমশাই একটা বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে বলে—কি ব্যাপার রে মশায়, বলে ঝড়ে নাকি গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়?

—গেলে তো ভালোই, একেবারে বিনা বাধায় চলে যাবেন।

তবু কিছুই হয় নি। রাতটা ভালোই কেটেছে। মেঘের সেই বাঁধন ছেড়া দল তখনও আকাশে ঘুরছে তবে রোখটা অনেক কম। বেলা ন'টা নাগাদ ভেল্লুপুরমে ফিরে এসেছি।

বেশ বড় ষ্টেশন, তবে খাদ্যাদি সেই এক। তবু এখানে কিছু বিস্কুট কলা পেয়ারা মেলে।

এরপর আসছে ত্রিচিরাপল্লীর গাড়ি।

এখান থেকে ত্রিচিরাপল্লী যাবার দুটো পথ আছে, একটা কর্ড লাইন, সোজা লালগুড়ি হয়ে ত্রিচিরাপল্লী। অন্যটি মেন লাইন হয়ে এই লাইনে পড়ে কুম্ভকোনাম, চিদাম্বরম্, আঞ্জাভুর প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থ।

সোজাপথে গেলে তবু ত্রিচিরাপল্লীতে একটু আগে পৌঁছবো, বিশ্রামের দরকার তাই সোজাপথেই পাড়ি দিলাম। পরে ত্রিচিরাপল্লী থেকে আবার উজিয়ে তাঞ্জোর চিদাম্বরম্ আসতে হবে।

অন্ধ্রের কিছু আগে মাদ্রাজ এবং কেরলে বিশেষ করে মাদ্রাজে দেশলাম চাষের ব্যবস্থা খুবই ভালো। মাঠও উর্বর, তুবার সেখানে বর্ষাকাল। তাছাড়াও মাঠের মাঝে মাঝে রীতিমত ডিপ টিউবয়েলের ব্যবস্থা।

জলের অভাব নেই। তাছাড়া ক্যানেল তো আছেই। বাংলাদেশের মাঠে প্রান্তরে এই দৃশ্য চোখে পড়েনি। মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে এমনি ব্যবস্থা থাকলে এর ফলনও বদলাত, মাঠে অজন্মা হতো না।

ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি। অপরাহ্ন নামতে দেরী নেই। পথের তুদিকে শুরু হয়েছে কলা গাছ, আখের ক্ষেত, ধানতো আছেই। একদিকে সোনা ধানের মঞ্জরী ভারাবনত ধানক্ষেত, ওপাশেই আবার ক্ষেতের বুকে জল লাতে মাথা তুলেছে হাটুভোর সবুজ ধানগাছের দল, বাতাসে কাঁপছে তারা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

দূরে ত্রিচিরাপল্লীর রকটেম্পলের আলোর মালা দেখা যায়। সহর আর দূর নেই। কাবেরী আর তার শাখা নদীর ব্রিজ পার হয়ে এলাম।

একটিতে জল নেই, আসল কাবেরী পূর্ণ যৌবনা। তার পরেই পড়ে শ্রীরঙ্গনাথম্ ষ্টেশন—এর পর আসবে গোল্ডেন ডেক তারপর ত্রিচিরাপল্লী সিটি।

আপাততঃ এই খানেই আমাদের যাত্রা শেষ তু'এক দিনের জন্য। আবার চলবে মুশাফিরও তুদিনের ডেরা ডাঙ্গা তুলে নিরুদ্দেশের পথে।

মাদ্রাজ রামেশ্বরম্ লাইনের অন্যতম বড় জংশন এই ত্রিচিরাপল্লী। বেশ বড় ষ্টেশন। সাইডিং এ ব্যবস্থাও ভালো। জল আলোর অভাব নেই।

সন্ধ্যার পরই একবার শহর ঘুরে আসতে হবে। ষ্টেশনের বাইরে অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তবে কোনটারই মিটার নেই।

—রকটেম্পল যাবে আর আসবে কত নেবে?

একজনের কথা বলবার উপায় এখানে নেই। ষ্টেশনে যাত্রীর ভিড়ও কম। কয়েকজন ট্যাক্সিওয়ালা একপাশে বসে তাস খেলছিল। বোধহয় পয়সার বাজীও চলছিল তার সঙ্গে।

এমন নিষ্কর্মা ট্যাক্সি চালকের দল কলকাতায় দেখা যায় না। একজন এগিয়ে আসে। হিন্দী বোঝে সে।

—বলে—দশটাকা যাতায়াত।

—মোটে ছ মাইল রাস্তা!

—Eight Rupee ব্যস!

—ফাইভ—পাঁচ টাকা। আণ্ড্রু রূপেয়া।

হৈ হৈ করে উঠল তারা একত্রে, যেন মারবে আর কি!

ট্যাক্সিওয়ালাদের এমন কদর্য ব্যবহার কোথাও দেখিনি। বিমলদা বলে।

– চল বাসেই চল।

বাসও ঘন ঘন আসছে, ষ্টেশনের কাছে ফাঁকাই। কন্ডাকটারকে বলতে ভাড়া নিয়ে টিকিট দিয়ে বলে,

—ষ্টপেজ এলে নামিয়ে দোব।

একজন ভদ্রলোক আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে ব্যাপারটা দেখছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

—কামিং ফ্রম ক্যালকাটা?

ঘাড় নাড়ি।

ভদ্রলোক বলেন ওরা নেশা করেছিল, নইলে সাধারণতঃ ওরা এসব করেনা।

হবে!

তিনিই বাস ষ্টপ আসতে নামতে বললেন।

পরিচয় হ'ল, মাদ্রাজের হিন্দু কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা, এমনিতেও লেখেন টেখেন। এখানকার কলেজের অধ্যাপক।

বিমলদা আমার পরিচয় দেন। ভদ্রলোক বেশ সদালাপীই। মাদ্রাজ নিশ্চয়ই বিচিত্র ঠেকবে আপনার কাছে?

—সত্যিই বিচিত্র। বিরাট এর মন্দির। প্রাচীন এর ঐতিহ্য—

ভদ্রলোক বলেন,

—তামিল ভাষা আরও প্রাচীন। আর্যদের আগমনের আগেও এ ভাষা ছিল, এখনও বেলুচিস্থানের ওদিকে এ ভাষার চলন আছে। অবশ্য বর্তমান তামিল ভাষার অনেক রূপ বদল হয়েছে।

বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছি। বেশ ভালো সমৃদ্ধ বাজার, বিস্মিত হই খাবারের দোকান দেখে। এতদিন দক্ষিণের কোথায় এ খাদ্যসম্ভার চোখে পড়েনি। থরে থরে চালকুমড়োর মেঠাই বরফি—পেড়া—কালাকন্দ—শোনপাপড়ী—শোন হালুয়া তো আছেই, আর আছে রকমারি চানাচুর, ছোট বড়া ভাজা, কাজু বাদাম ভাজা।

অধ্যাপক ভদ্রলোক বলেন,

—ত্রিচিনাপল্লীর সংস্কৃতিতে কিছু বেচাল আছেই, মুসলিমও এখানে অনেক আছে। তারাও তাদের সভ্যতা নিয়ে আছে। এসব চাঁদা সাহেব—মহম্মদ আলির রাজ্য, সেই থেকে কিছু মুসলমান প্রভাব এখানে রয়ে গেছে।

ভদ্রলোক বাজারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখান।

—বাঁ হাতে চলে যান, একেবারে মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে হাজির হবেন।

ভদ্রলোক থাকেন ওদিকে, আমাদের পথ দেখাবার জন্যই ঘুরে এসেছেন, বলে চলেন তিনি।

—ওপাশে পাহাড়ের নীচেই তেপ্‌পাকুলম, ওদিকে সেণ্ট জোসেফ চার্চ, তার পাশেই ক্লাইভ থাকতেন।

—এখানেও ক্লাইভ!

হাসেন ভদ্রলোক—ইংরেজ আর ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতে অনেক নাটকেরই অবতারণা করেছিল। রাজায় রাজায় গোলমাল বেঁধেছে ওরা দুজনে দুপক্ষ নিয়ে দুজনকে সাবাড় করে নিজেদের রাজ্য পত্তন করেছে। ওই রক টেম্পল যা দেখেছেন তার পিছনেই এই ইতিহাস। চাঁদা সাহেব আর নবাব মহম্মদ আলি খাঁ দুজনের মধ্যে গোল বাঁধে, ক্লাইভ ইংরেজ সৈন্য নিয়ে হানা দেন, ওই রক ফোর্ট ছিল সেদিন আক্রমণের কেন্দ্রস্থল।

মন্দির পরিণত হ'ল দুর্গে, রক্তাক্ত সংগ্রামের পর ইংরেজরই জয় হল। ত্রিচিনাপল্লী থেকে ফরাসীরা সরে গেল, গেড়ে বসল ইংরেজ। ত্রিচিনাপল্লী প্রথমে ছিল চোলদের রাজধানী, তাঞ্জোর থেকে কাছেই, তাঞ্জোরের চোল রাজবংশ এখানেও থাকতেন তারপর নায়কবংশ—তাঁরা এখান থেকে মাদুরায় তাদের রাজধানী স্থাপন করেন। তবে পৌরাণিক যুগ থেকেই এর খ্যাতি! ওই রক টেম্পলেই দেখবেন দুটি দেবতা, একটি বিনায়ক, গণপতি। তিনি আছেন শীর্ষ চূড়ায়, আর একটি শিবলিঙ্গ! তিনি প্রতিষ্ঠিত হ'ন পরে।

ভদ্রলোক আপ্যায়ন জানান।

—এক কাপ কফি খেতে হবে!

বলে উঠি—তাহলে ওটা আমাদেরই কর্তব্য।

হাসেন ভদ্রলোক।

—না, না। আপনারা অতিথি। বাসায় নিয়ে যেতাম—তা দূরের পথ!

ভালো ঝকঝকে কফির রেষ্টুরেন্ট। এখানে কেকও মেলে। সবই স্থানীয় বেকারীর তৈরী। কফিতে চুমুক দিতে দিতে তিনিই হলেন,

—এ কাহিনী নিশ্চয়ই জানেন আপনারা। শ্রীরঙ্গনাথম বৈষ্ণবদের দেবতা। কথিত আছে অযোধ্যার কাছে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাওয়া যায়—সৃষ্টির আদিকালে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে তপস্যা করে তৃপ্ত করে ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্ত শয়ানে দর্শন পান।

সত্যযুগে অযোধ্যার রাজা ইক্ষাকু বিষ্ণুর তপস্যা করতে থাকেন, তাঁর তপস্যার একাগ্রতায় ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে আবেদন জানান, বিষ্ণু তাকে বলেন—আমি অযোধ্যার ইক্ষাকু বংশে নররূপে অবতীর্ণ হবো, সেখানে থাকার পর কাবেরী নদী তটে চন্দ্রপুষ্করিণীর তীরে সপ্তমন্বন্তরকাল শয়ান থাকবো, তারপর আবার ফিরে আসবো এই স্বর্গ লোকে। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশানুযায়ী ওই মূর্তি অযোধ্যায় দিয়ে আসেন। কথিত আছে ত্রেতাযুগে দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় এই চোলরাজ ধর্মধর্মাকে আমন্ত্রণ করেন, তিনিও অযোধ্যায় আধক্রোশ দূরে এই মূর্তি দর্শন করেন।

এর পরই শ্রীরামচন্দ্র নররূপে অবতীর্ণ হ'ন রাবন নিধনের পর অযোধ্যায় ফিরে শ্রীরামচন্দ্র বিভিষণকে এই মূর্তিটি দেন, সাবধান করেন এই মূর্তিটি যেন মাটিতে কোথাও নামানো না হয়। বিভীষণ কাবেরী নদীতটে এসে দেখেন এক ব্রাহ্মণকুমার দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে এই মূর্তি দিয়ে কাবেরীতে স্নান সারতে নামেন। উঠে দেখেন তখন বালক সেই মূর্তি মাটিতে রেখেছে। আর তাঁকে তোলা যায় না। সেই থেকে ওই মূর্তি শ্রীরঙ্গনাথ নামে পূজিত হন।

ক্রোধে কুপিত বিভীষণ বালককেই তাড়া করে, বালকও দৌড়তে দৌড়তে এসে ওই পাহাড়ের উপর ওঠে। বালকবেশী ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, স্বয়ং বিনায়ক দেবগণপতি। বিভীষণ সেই অবস্থাতেই কুপিত হয়ে ওর কপালের আঘাত করেন। আজও দেখবেন পর্বত শীর্ষে বিনায়কের সেই মূর্তির কপাল একটু বসা, হাজার হোক রাক্ষস, তার জোর যাবে কোথায়।

তখন থেকে তিনি ওখানে পূজিত।

বাধা দিই—বর্তমানে তো শিবলিঙ্গও আছেন?

—হ্যাঁ! পল্লবরাজবংশ অনুমান এগারো শতকে ওই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ওর নাম তায়ুমন্‌বর কোয়েল বা মাতৃভূতেশ্বর দেবতা। ওর শক্তির নাম সুগন্ধি-কুন্তল আম্‌মল। ১৩১০ খৃঃ মালিককাফুর দক্ষিণাপথ

আক্রমণ করে, তখন ত্রিচিনাপল্লীও সে দখল করে, পরে অবশ্য বিজয়নগর রাজবংশ একে দখল করেন। পরে মুসলমান প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদুরার রাজা বিশ্বনাথ নায়ক এই পর্বতমন্দিরকে সুরচিত করেন। এর চারিদিকে দুটি প্রকার শ্রেণী রচিত হয়, পরিখাও খোঁড়া হয়। ওপাশে যে বিরাট পুষ্করিণী তাও ওই রাজাদেরই তৈরী।

রাত্রি হয়ে আসছে, সাড়ে আটটায় মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে, তাই আজকের মত বিদায় নিলাম। তিনিই অনুরোধ জানান—কাল বৈকালে কলেজে এলে খুশী হবো।

অপরিচিত একজন ভদ্রলোক আমাদের জন্য অনেকখানি সময় ব্যয় করেছেন। পথেঘাটে তবু এমন সজ্জন মানুষের অভাব নেই।

মন্দিরের বাইরে ফুল পুজোর আয়োজন নিয়ে বসে আছে। আমরা টিকিট কেটে সিড়ি বয়ে উঠতে লাগলাম।

প্রায় ২৭৩ ফিট উচু এই পাহাড়। সিড়িগুলিও চমৎকার। ধাপে ধাপে উঠে গেছে, একটু উঠেই একটা গুহামন্দির। অতীতে একটা বিস্ফোরণের ফলে সেই মন্দিরের বহু স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে। এটা ছাড়াও আর একটা গুহামন্দির আছে। পল্লবরাজবংশ সেটা স্থাপনা করেন।

রকফোর্টের মূল সিড়ির অতলেও অনেক গুলি খুঁজি গুহতলে আছে, সে কারুকার্য নির্মাণ শৈলী দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

সুন্দর আলোয় সিড়িটা ভরানো।

দেওয়ালে রঙ্গীন ছবি, তারই মধ্যে এই পর্বতের লিঙ্গ দেবতা মাতৃভূতেশ্বরের কাহিনী আঁকা।

কাবেরী তটে শিবউপাসিকা একটি মহিলা রত্নাবতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। ঝড় বাদলের রাত্রি, কাবেরী নদীতে তুফান উঠেছে। রত্নাবতীর মা থাকে নদীর ওপারে, আসার পথ নেই। কাতর প্রার্থনা করতে থাকে নারী মহাদেবের কাছে। দেখা যায় তার মা এসে উপস্থিত হয়েছে। রত্নাবতীর সন্তানও প্রসব হ'ল নির্বিঘ্নে। হঠাৎ

দেখা যায় রত্নাবতীর মা কোনক্রমে কাবেরী নদী পার হয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মহাদেবই পূর্বে রত্নাবতীর কাতর প্রার্থনায় তার মায়ের রূপ ধরে এসে তার বিপদ নাশ করেছেন। সেই কাহিনীকে কেন্দ্র করে জাগ্রত শিবের প্রতিষ্ঠা হয় এই মাতৃভূতেশ্বর নামে।

সিড়ি বয়ে শীর্ষমন্দিরে এসেছি। এখান থেকে রাতের ত্রিচিনাপল্লী সহর ছবির মত ফুটে ওঠে। শীর্ষে বিনায়ক মূর্তি। ওপাশে ঘণ্টা তোরণের ধারে আজকের সহরের জলাধার।

...রাত্রি হয়ে আসছে।

মৃদঙ্গ আর নাদেশ্বরমের সুর ওঠে। শীর্ষ মন্দির থেকে মাতৃভূতেশ্বর দেবতার ভোগমূর্তি চৌদলে করে নামিয়ে আনছে পুরোহিতরা। আসল মূর্তি নাকি পাহাড়েরই একটা অংশ, শীর্ষে ওই মূর্তি, ভোগমূর্তিকে এনে রাত্রে তার শক্তি ওই সুগন্ধি কুন্তল আমমল্ এর মন্দিরে রাখা হয়।

নীচেই শত স্তম্ভ মণ্ডপ। সমস্তটাই পর্বতের গুহা—তাতে থামগুলো উঠে গেছে। সবই পর্বত থেকে খোদাই করা। প্রয়ান্ধকার পরিবেশ, মশাল জ্বলছে—বাজছে নাদেশ্বরম্ আর মৃদঙ্গম্, সেই শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে গুহায়; বিচিত্র একটি অনুভূতি। দিনের পাট শেষ হ'ল।

দেবতা গেলেন বিশ্রামে।...গুহাতলে সেই বাদ্যবাণ্ড মশালের আলো—ধূপের সুরভি সব মিশে মনে একটা বিচিত্র ভাবান্তর আনে, গবাক্ষ থেকে দেখা যায় বহু নীচে সহরের আভাস রেখা, কোন মেঘলোকে, দেবলোকের অসীমে বিচিত্র একটি পরিবেশে আমরা হারিয়ে গেছি।

রাত্রি নামে, আমরাও গুহামন্দির থেকে নেমে এলাম। সহরের পথে তখনও আলো জ্বলছে, দোকানপাট খোলা। ওখানে বোধ হয় দোকান কর্মচারী আইনের এত কড়াকড়ি নেই।

এইবার বুঝতে পারি আমরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এমনি সময় গোল বাধালো আমাদের পুলক।

…ছোট ছেলে, এমনিতেই লাজুক। হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বড় দোকানের পাশে রাখা টবের বাক্সের উপর বসে পড়ে লাইটপোষ্ট হেলান দিয়ে, পরক্ষণেই শুরু হয় হড় হড় করে বমি।

বিপদে পড়ি ওকে নিয়ে। অচেনা জায়গা।

দেখি দোকানদার ভদ্রলোকও বের হয়ে এসেছেন। প্যাণ্ট কোট পরিহিত একটি বয়স্ক লোক।

—কি ব্যাপার?

—আমাদের সঙ্গী একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ!

ভদ্রলোক তক্ষুনিই তার চাকরকে ডেকে বারান্দা থেকে বাক্স পত্র সরিয়ে একটা ম্যাটিং এনে পেতে দিয়ে বলেন—ওকে একটু বিশ্রাম নিতে বলুন, ডাক্তার দরকার হয়—ঠিক আছে।

বলবার আগেই তিনিই একজন লোক পাঠালেন ওপাশের ডাক্তারখানায়, ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল গ্লাশও এনে দেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারও এসে গেলেন। ক্লান্তিতে এমন হয়েছে, খাবার গোলমালও হয়েছে। দুডোজ ওষুধ দিচ্ছি। ঠিক হয়ে যাবে।

পুলকও ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওষুধটাও নিলাম। দাম দিতে যাবো, বাধা দেন দোকানদার ভদ্রলোক।

—ডোণ্ট ইউ ওরি।

কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, সত্যি অনেক করেছ তুমি!

ভদ্রলোক সহাস্তে বলেন,

—বিদেশী তোমরা, এ উপকারটুকু করাতো স্বাভাবিক ধর্ম। ইট ইজ নাথিং মিষ্টার।

ত্রিচিনাপল্লী সম্বন্ধে প্রথমে ষ্টেশনে ট্যাক্সিওয়ালাদের দেখে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা আমার মন থেকে মুছে গেছে। মনে হয় সত্যি

সুন্দর সহর—ভদ্র সহর। এরা আতিথেয়তা জানে। মিঃ চিদাম্বরমকেও দেখলাম—এই ভদ্রলোককেও দেখলাম—ভালো লাগলো।

তারপর ফেরার পথে কিছু কালাকন্দ আর পেড়াও নিলাম, খাঁটি জিনিস, অনেকদিন এ জিনিস জোটেনি।

কাল একফাঁকে তাঞ্জোর—সম্ভব হলে চিদাম্বরম্ অবধি ঘুরে আসবো, ত্রিচিনাপল্লীর বিখ্যাত শ্রীরঙ্গনাথম মন্দির—জম্বকেশর মন্দির দেখবো ওখান থেকে ফিরে এসে।

ত্রিচিনাপল্লী থেকে আমরা উজিয়ে চলেছি ভেল্লিপুরমের দিকে মেন লাইন ধরে, এই পথেই পড়ে তাঞ্জোর, চিদাম্বরম্—কুম্ভকোনাম তীর্থ। এদের মধ্যে তাঞ্জোরই ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

ত্রিচিনাপল্লী থেকে মাইল তিরিশের মধ্যে ট্রেনে যেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় নিল, অবশ্য প্যাসেঞ্জার ট্রেন তার মিটার গেজ।

চারিদিকে সবুজ ধানক্ষেত। ডিসেম্বর মাসেও তা সবুজ—কোথাও স্বর্ণময়। শান্ত স্তব্ধ তাঞ্জোর। রেল কোম্পানীর গাইডে এর নাম থাঞ্জাভুর জংসন।

গাছ-গাছালি ঘেরা ঘন সবুজ ছায়ায় এর পথ সকালের প্রথম আলোর আভাস জেগেছে। সহর ওপাশে রইল, এদিকে জেলা সদরের কিছু কিছু অফিস মাত্র।

পথে যানবাহন বলতে কিছু সাইকেল রিক্সা, আর ঝাণ্ডি, ছই লাগানো গাড়ি তাও ঘোড়া নয়, বলদে না হয় ষাঁড় দিয়ে টানানো হয়।

সুরপতি বলে,—একটা গাড়ি নিই দাদা?

বিমলদা জবাব দেয়।—তার চেয়ে ওই গাড়ি থেকে একটা ষাঁড় খুলে নিয়ে ওতেই চেপে চল। যে দেশে এসেছি রে বাবা সবই মহাদেবের রাজত্ব। নন্দীবাহন হয়ে চলে যা!

হেঁটেই চলেছি। তাঞ্জোর এককালে চোলদের রাজধানী ছিল। দক্ষিণাপথের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পে চোল রাজবংশের

দান অপরিসীম। তারপর আসেন নায়ক বংশ তারপর তাঞ্জোর দুর্গ অধিকার করে মারাঠারা।

পরিখা ঘেরা বিরাট দুর্গ আজ জনহীন পরিত্যক্ত প্রায়। পাথরের তৈরী দেওয়াল প্রাকার কামান বসাবার জায়গা মারাঠারাও এই দুর্গের কিছু রদবদল করেছিল।

আজ সবই পরিত্যক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শুধু নীরব সাক্ষী ওরা!

দূর থেকেই বৃহদীশ্বর মন্দিরের গোল বিমান দেখা যায়, গোপুরম থেকে মূল মন্দিরই বিরাট, ভারতের মধ্যে এইটি অন্যতম বৃহৎ মন্দির। বিমলদা বলেন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়াতেও বলা হয়েছে এইটিই নাকি ভারতের সবচেয়ে বড় মন্দির আর তামিল ভাষাভাষীদেরই বলা হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্দির শিল্পী।

নেত্যকালীবাবু পিছনে ছিল, আমাদের কথা শুনে দৌড়ে আসে। পয়সা খরচ করে এসেছে তাই তামাম সবকিছু দেখবে শুনবে সে।

—কি বলছেন বিমলবাবু, ওগো পা চালিয়ে এসো না?

বিমলদা বল্লেন—এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া—

নেত্যবাবু ফট্ করে ওঠে—যত্তো সব ইংরিজি ব্যাপার আরে মশাই ঠাকুর কেমন জাগ্রত তাই শুনি। মন্দিরতো বিরাট বললাম মশাই মানত করবো বংশ রক্ষা করতে হবে তো, এতবড় মন্দির ঠাকুর।

জবাব দিই—তাতো জানি না!

নেতুবাবু বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে গজরায়।—জানেন ছাই! এসো গো—ধুলোপায়ে মন্দিরে প্রণাম করতে হবে!

বিজয় মাষ্টার নাচের পোজে পথ চলেছে। ইতিমধ্যে সকালে ট্রেনে আসতে হয়েছে, স্নান-টান হয় নি। ভালো করে নাকি কফিও খেতে সময় পায় নি মেজাজটা খারাপ। গজগজ করে বলে,

—বললাম নটরাজের মন্দিরে আগে চলুন চিদাম্বরমে, তা নয় যত্তোসব পড়ো মন্দিরে এলো। নাচের পোজগুলো দেখতে হবে তো সুরপতি ফোড়ন কাটে।

—ওতো দিনরাতই দেখছি মাষ্টার মশায়।

বিজয়মাষ্টারের একটি গুণ সে চটে না। কথাটা শুনে হাসতে থাকে। ওদিকে বিজলীকে দেখে বলে—চলুন বিজুদি, এগিয়ে যাই।

বিজলী জবাব দিল না। বিজয়বাবু অগত্যা ছাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে গেল। তারাও মাষ্টারমশায়কে যেন কলঙ্ক দিতে চায় না।

বিজলী গজগজ করে।

—লোকটা কিন্তু পাকা শয়তান!

ওদের অন্তরালে জীবননাট্যে মন দেবার অবকাশ নেই। আমরা অজ্ঞাতসারেই চারিদিকের বিরাট ইতিহাসের নীরবতার গহনে হারিয়ে গেছি।

গোপুরমের মূর্তিগুলো এখানে বিরাট, পূর্ণ অবয়বের। উপরে কিছু পাথরের কাজ আছে নীচে চুণবালির আস্তরও দেখা যায়, দ্বিতীয় গোপুরমের দ্বাররক্ষীও বিশাল এবং ছবির দৃশ্যও বর্ণাঢ্য।

এর পরই মন্দির চত্বর। এর দৈর্ঘ্য ৫০০ ফিট এবং প্রস্থ ২৫০ শো ফিট। সামনেই বিরাট মন্দির তার সামনে অর্দ্ধমণ্ডপ, তারপরও মহামণ্ডপ তার পিছনে নন্দীমণ্ডপ।

প্রকাণ্ড এক পাথরের একটি ষাঁড় হাটু গেড়ে বসে আছে। এইটি নাকি ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ নান্দী মূর্তি, সব বৃহৎ মূর্তিটি আছে অনন্তপুরে লিপক্ষি মন্দিরে।

বিমলদা বলে মন্দির স্থাপত্য আর শিল্পকলার উন্নতি ক্রমবিকাশের ধারা বেশ বোঝা যায়, প্রথমে মহাবলীপুরমে দেখেছিলে রফ্‌কা মূর্তিগুলো সব আলাদা, পৃথক পৃথক। সেগুলোকে সামঞ্জস্য বিধান করে মন্দিরের গায়ে সাজালে তার অর্থ আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা অঙ্গ বলে ধরা যায় এ কথা ওদের মনে এসেছিল অনেক পরে। চোল অঞ্চলের শিল্পীরাই এটা বোধ হয় সুন্দরভাবে প্রকাশ করে।

জবাব দিই—মনে হয় তাই। বিজলী বলে ওঠে—অক্ষর পরিচয় থেকে কবিতা লেখা—বই তো?

বিমলদা মাথা নাড়ে—ঠিক বলেছেন।—মন্দিরের ভেতরও কয়েকটা রঙীন ছবি আছে।

বিমলদা বলেন—ধীরে ভায়া, ধীরে। সব ফুরিয়ে যাবে। তার আগে মন্দিরের ইতিহাসটাও জানা দরকার।

কিছু কিছু পড়েই বের হয়েছিলাম। তাঞ্জোরের নাম অনেক শুনেছি। শুনেছি চোলরাজাদের কথা। তাই জবাব দিই।

—মহান্ রাজা চোল ৯৮৫ থেকে ১০১৮ খৃঃ অবধি বেঁচেছিলেন, তাঁর আমলেই এই মন্দির তৈরী করা হয়, শুনেছি এ মন্দিরের নির্মাণভার দিয়েছিলেন কাঞ্চীপুরের শিল্পীদের উপরই।

বিমলদা বলে ওঠেন।

—তাহলেই এইবার মনে কর বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরের সূক্ষ্ম কাজ ঠিক বেলেপাথর নয়, খানিকটা শ্বেতপাথরঘেষা জাতের পাথর—আরও কঠিন পাথর নাহলে বেলেপাথরে এ সূক্ষ্ম কার্য টিকবে না—আর ওই ফ্রেসকোর কথা বলছো ওতো অজন্তাতেই চরমে উঠেছিল—তার কিছুটা আভাস পাবে মাদুরায় থিরুমল নায়কের প্রাসাদে; একটা ধারাই সার্থকতার পথ খুঁজে নিয়েছে।

বিরাট পাথরটার দিকে চেয়ে থাকি।

এ মন্দিরের ধাপে ধাপে উঠে গেছে। মাথার উপর দ্রাবিড় শিল্প-শৈলীর মত সমান্তরাল রেখায় কলস বসানো নেই, বসানো আছে বিরাট গোলাকার একটি কারুকার্য শোভিত প্রস্তর। মন্দিরের শীর্ষদেশ প্রায় ২১৬ ফিট উঁচু, আর ওই উপরের পাথরটির ওজন প্রায় আশি টন।

—এত বড় পাথর অত উপরে তুললো কি করে?

বিমলদাই শোনান।

—এখান থেকে চার মাইল দূরে সরপল্লম্ গ্রাম, শোনা যায় বালির স্তূপ দিয়ে ঢালু করে সেখান থেকে এই পাথরটাকে টেনে তোলা হয় ওই মাথায়।

সবই বিরাট এখানে।

বিশাল মন্দিরের একদিন সমৃদ্ধি ছিল, চারিদিকে এর ঘর-বোধহয় অতিথি পূজারীরা থাকতেন। আজ সেখানে জনপ্রাণী নেই।

মন্দিরের পূজাও আজ শুধু প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেবতাও তেমনি বিরাট। বিরাট এক শিবলিঙ্গ। তিনজনে ধরে বেড় পাওয়া যাবে না বোধহয়।

ওপাশেই একটি ছোট মন্দির। এর গঠনশৈলী আরও নিখুঁত। রথের আকারের, অনেকটা উড়িষ্যার কোনারকের রীতিতেও বলা যেতে পারে। পাথরের সূক্ষ্ম কাজও অনেক আছে, ছিদ্রপথের সূক্ষ্ম জালির কাজ এখনও নিখুঁত। একটা ঘাসের শিষ সেই ছিদ্রপথে পুরে বের করা যায়।

বিস্ময় লাগলো দেওয়ালে ক্যাঙ্গারুর মূর্তি দেখে, তখনকার শিল্পী ওই জীবের সন্ধান কি করে পেয়েছিল তাও বুঝলাম না।

মন্দিরের বিরাটত্ব মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। চারিদিকে এখানে বিরাটত্ব আর মুক্তির অবকাশ।

দেবতা এখানে তাই মহান—তাই বোধহয় এর নামকরণ করেছিল সেদিন শিল্পীরা বৃহদীশ্বর।

বিমলদা বলে,

—এমনি মন্দির চোল রাজারা আর একটি তৈরী করেছেন। সেটা হচ্ছে গঙ্গাইকোণ্ডাবোলপুরমে এখান থেকে কিছু দূরে, এককালে চোলদের সেখানেও প্রতিপত্তি ছিল। তবে সে মন্দির এর চেয়ে ছোট।

স্তব্ধ মন্দির পার হয়ে—দেউড়ি দিয়ে কেল্লার বাইরে এলাম, দুপাশে গভীর পরিখা, মাঝখানের পথটা হয়তো ছিলো সেতুপথ, সেপথে ঢুকেছে চোল নায়ক—মারাঠাদের বিজয় বাহিনী আজ সব স্তব্ধ। সেতুপথ ভেঙ্গে পরিখা বুজে গেছে। পিছনে প্রবাহিত কাবেরীর একটি মূল ক্যানেল, তার জলপ্রবাহ একদিন পরিখা পূর্ণ করে রাখতো। আজ সেই ধারাও প্রবেশ করতে ভুলে গেছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে শিবগঙ্গা, বর্তমানে তাঞ্জোরের জলধারাও বলা যায় একে, সংলগ্ন বাগানের প্রতিষ্ঠা করেন সেই চোল রাজ বংশ।

আজ বাগানের চিহ্ন কিছু আছে—সেই বিরাট দিঘীও রয়েছে মানুষের নিজেদের প্রয়োজনে তাকে বহাল রেখেছে।

সহরের প্রধান পথ দিয়ে চলেছি এবার।

কোর্ট-কাছারি, হাসপাতাল, ডাকঘর সবই এখানে। দু একটা বাসও চলছে। তবে বেশীর ভাগ সেই বাণ্ডিই।

বেলা বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সদর সহর কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এরপর গতিপথ আমাদের প্যালেস। সেইখানেই তাঞ্জোর মিউজিয়াম।

১৭৭৯ খৃঃ তখন তাঞ্জোরের রাজপদে রয়েছেন মারাঠারা, রাজা সরবোজী তখন সিংহাসনে। উনি Rev. C. V. Schwartz নামে একজন ড্যানিস মিশনারীর খুব ভক্ত ছিলেন। রাজা সরবোজী ছিলেন তাঁর অনুরক্ত ছাত্র। সেই মিশনারীর নামে নির্মিত এই গির্জা তৈরী করান।

প্যালেস-এর আশে পাশে এখনও সেই পুরাতন আমলের ছাপ দেখা যায়। সুরক্ষিত প্রাসাদ, তোরণের পর তোরণ পার হয়ে যেতে হয়। আজ সেখানে রাজভক্ত নেই, সারা প্যালেসের মধ্যে কিছুটা মিউজিয়াম, কিছুটা অস্ত্রশালা, কিছুটা মণ্ডপ, অন্যদিকে সরকারী অপিস, প্রাসাদ সংলগ্ন ময়দানে আজ বসেছে তাঞ্জোর জেলার একটা কৃষি, কুটিরশিল্পের এবং গৃহপালিত নানা প্রাণীর প্রদর্শনী। এই প্রাসাদেই চোল রাজবংশ নায়ক রাজবংশ এবং মারাঠারা বাস করতেন। কোডাগোপুরম্ এখন অস্ত্র-সংগ্রহশালা আর মদ্‌মাল্লিগাই অর্থাৎ প্রহরা গম্বুজ এখনও টিকে আছে সেই অতীতের গৌরবের সাক্ষী হয়ে।

নায়ক রাজাদের দরবার মারাঠা দরবার হল এখনও টিকে আছে। চারিদিকে এর মহান্ গাম্ভীর্যময় পরিবেশ—অতীতের একটি গৌরবময় যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

একতলায় প্রশস্ত হলে মিউজিয়াম।

তার মধ্যে ব্রোঞ্জ তাম্রমূর্তি অনেক রয়েছে। তাঞ্জোরের সেদিনের শিল্পীদের নিখুঁত সাধনার অনেক মূল্যবান সংগ্রহে এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ।

কয়েকটি নটরাজের বিভিন্ন ধরণের মূর্তিও রয়েছে।

শিল্পকথা—মন্দির স্থাপত্যে রাজাদের অবদান ছাড়াও শিক্ষাদীক্ষা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে স্বরস্বতী মহাপাঠাগারের সংগ্রহ দেখলে। চোল—নায়ক—মারাঠা রাজাদের একত্রীভূত সংগ্রহে রয়েছে প্রায় ৩০,০০০ হাজার বহু মূল্যবান গ্রন্থ, সংস্কৃত তামিল তেলেগু মারাঠি এবং ইংরাজী গ্রন্থও রয়েছে।

আর আছে সঙ্গীত মহল, সেকালের তৈরী প্রাসাদে সঙ্গীতশিল্পের চর্চাও হোত, আজ তাকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করে রাখা হয়েছে মাত্র।

বেলা হয়ে গেছে। ষ্টেশনে ফিরেই আবার এগোতে চিদাম্বরম্-এর দিকে। বিমলদা তাড়া দেয়।

—চল!

স্বরপতি জবাব দেয়।

—এবার ওই ষাঁড়ের গাড়িতেই চড়ে ফিরবো দাদা, পেটে দানাপানি নেই। ওই মুসাম্বির চুষে আর পেয়ারা চিবিয়ে তিনমাইল পথ হাঁটতে পারবো না।

বাণ্ডিই নিলাম একটা তিনজনে। পিছনে ওরা এইবার গাড়ি নিচ্ছে। খিদেও লেগেছে বেশ। বলি।

—ইড্‌লি দোসাই খেতে হবে বিমলদা, খিদের মুখে কাঁকর পাথরই হজম হবে, ওতো তবু খাদ্য বস্তু। নইলে চিদাম্বরম্-এর যে নৃত্য পেটে সুরু হয়েছে তাতে তাঁর চরণ অবধি আর পৌঁছতে পারব না।

বিমলদা হাসে।

দুপুরের রোদ জেগে ওঠেছে, বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছে বাণ্ডিখানা।

তাঞ্জোর থেকে চিদাম্বরমের দূরত্ব অনেক, পথও সম্পূর্ণ উল্টো

দিকে ; ওটা ভেল্লিপুরম থেকে এই পথে আসলেই কাছে হতো, কিন্তু এখন আর সময় নেই।

তাই কাছাকাছি তীর্থ কুম্ভকোনাম সেরেই ত্রিচিনাপল্লীতে ফিরতে হবে। চিদাম্বরম হতে পারে একেবারে রামেশ্বরম থেকে ফেরার পথে।

বিজয় মাষ্টার ষ্টেশনে এইসব কথা শুনে তো অগ্নিশর্মা। দাপাতে থাকে।

—তখনই জানতাম, আসল কাজের জায়গাগুলোই বাদ দিয়ে ঘুরবেন। আরে মশাই শিল্পী মানুষ আমরা মহাদেবের নটরাজ মূর্তিই দেখবো না দক্ষিণে এসে ?

নেত্যবাবুও তাক খুঁজছিল। বলে ওঠে।

—ঠিক কথা ?

বিমলদা বলেন,

—এত চটছেন কেন ? যে ট্রেনে কুম্ভকোজানে নামবো, সেই ট্রেনেই আরও বিয়াল্লিশ মাইল গেলে চিদাম্বরম্ দেখে কাল সন্ধ্যা নাগাদ ত্রিচিনাপল্লী ফিরবেন !

—তাহলে ত্রিচিনাপল্লীর রঙ্গনাথ জম্বুকেশ্বর মন্দির দেখবো কখন ?

শেষ অবধি ত্রিপতি ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার আসতে তাতেই উঠলাম। চিদাম্বরম্ পৌছবে বৈকাল ৩টা নাগাদ, দেখে শুনে রাত্রি ৮টার ট্রেনে উঠল ভোর বেলাতেই ত্রিচিনাপল্লী ফিরতে পারবো।

—নিদ্রা !

বিমলদা বলে—ভায়া ওটা ভেল্লুপুরম ত্রিচনাপল্লী প্যাসেঞ্জার, খালিই থাকে। তাছাড়া শেষ হবে ত্রিচিতেই, ঘুমলেও ক্ষতি নেই।

সবুজ মাঠ আর ধান ক্ষেতের বুক চিরে লাইন চলেছে। মাঝে মাঝে কাবেরী নদীর শাখা, ক্যানেল ইত্যাদি। কাবেরী দক্ষিণ ভারতের একটি মাতৃস্বরূপিনী নদী। শিবসমুদ্রম্-কৃষ্ণরাজ সাগর। ড্যাম এর জলধারা, বিদ্যুৎ তৈরী হয় এর থেকে। দক্ষিণ মাদ্রাজের ক্ষেতে ক্ষেতে এর পুণ্যধারা। শুধু তাই নয় দুর্গ প্রাকারের নীচে কাবেরী এদের

পরিখার কাজ করেছে, ক্ষেতে ফল-ফসল ফলিয়েছে, এর জলবিদ্যুৎ দক্ষিণকে সমৃদ্ধ করেছে—সৌন্দর্যময় করেছে।

তাই কাবেরী পুণ্যতোয়া।

ট্রেনে কথা হচ্ছিল সহযাত্রী মিঃ আয়ারের সঙ্গে। কুম্ভকোনামের কোন এক অফিসে কাজ করেন তিনি। অফিসের কাজে বাইরে গেছলেন, ফিরছেন। কুম্ভকোনাম সম্বন্ধে বলেন,—

—কাবেরী নদী সহরের মধ্যে প্রবাহিত। কথিত আছে বারো বৎসর অন্তর ওই কাবেরী নদীতে কুম্ভযোগের পুণ্য সূচিত হয়, তখন অনেক যাত্রী আসে পুণ্য-স্নানে।

প্রশ্ন করি তাঞ্জোর থেকে কি এ সহর বড় ?

মিঃ আয়ার মাথা এক দিকে নাড়েন। অর্থাৎ তা নয়। ওদের মাথা নাড়ার ভঙ্গীতে হাঁ না দুই-ই বোঝায়। তাঞ্জোর জেলার সদর সহর, কুম্ভকোনামও অবশ্য বহু পুরোনো দিনের সহর। তা ছাড়া কাবেরীর ধারে আছে কুম্ভকোনাম কলেজ, আর আছে ভগবান শঙ্করাচার্যের মঠ কামকোটিপীঠম্। এই খানেই আছে মহামোক্ষম্ পুষ্করিনী। ট্রেন চলেছে। কুম্ভকোনাম আসতে দেরী নেই।

চারিদিকে এর নারকেল আর পানের বরুজ। এ বরুজ আমাদের দেশের মত এত যত্ন নিতে হয় না, শুধু কাঠি পুঁতে তাই দিয়েই পানের লতাগুলো উঠেছে।

মিঃ আয়ার বলেন।

—কুম্ভ কোনামের পান দেখেছেন। মাদ্রাজে এর খুব কদর। তা ছাড়া এখানে পিতল কাঁসা তামার কাজও খুব উঁচু দরের।

কুম্ভকোনাম স্টেশন পার হয়ে চলেছি চিদাম্বরমের দিকে। স্টেশনেই পাওয়া গেল পাউরুটি আর কলা—সেই সঙ্গে পেয়ারা আর মুসাম্বির। তাই দিয়েই দুপুরের লাঞ্চ সারলাম।

আর মায়াপুরম জংসনে কফি জুটল।

পথে ছোট্ট একটা স্টেশন ত্যাগরাজপুরুম পার হ'ল। যাত্রীদের

অনেকেই ইংরাজী বোঝে না—হিন্দী তো নয়ই। কোন ক্রমে বোঝা গেল সাধক এবং সঙ্গীতকার ত্যাগরাজ নাকি এই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন।

বিজয় মাষ্টার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এইবার মুখ খুলছে।

—বললাম একটু কড়া হলেই সব সিধে! চিদাম্বরম্ যাবেন না? মাইরি আর কি!

বিজলী সরখেল ধমক দেয়!

—যাচ্ছেন তো ব্যস। তবে বকছেন কেন? এই মন নিয়ে দর্শন করবেন?

…কথাটায় চুপ করে গেল বিজয় মাষ্টার।

বিমলদাই বলেন—দক্ষিণ ভারতে প্রধানতঃ শৈব এবং বিষ্ণুরই প্রভাব বেশী, বিশেষ করে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে হিসাব নিলে দেখা যাবে অনুমান এই দক্ষিণাত্যে প্রায় ১২ জন বিশিষ্ট বৈষ্ণব এবং প্রায় ৬২ জন শৈব মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে কেরালার নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য। ইনি প্রচার করেন অদ্বৈতবাদ, তামিলনাদের রামানুজ, ইনি প্রচার করেন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, তেলেগু ব্রাহ্মণ রামানন্দ, ইনি ওই রামানুজ পন্থী, কবীর ছিলেন এঁরই শিষ্য, মহীশূরের ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য, ইনি প্রচার করেন দ্বৈতবাদ। এ কালের অন্যতম মহাপুরুষ মহর্ষি রমণ, এঁর আশ্রম রয়েছে অরুণাচলমে। এর মধ্যে শৈব সাধকদের অন্যতম পুণ্য তীর্থ এই চিদাম্বরম্।

শঙ্করাচার্য ছাড়া এই রামানুজ ছিলেন প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দক্ষিণাপথ ভ্রমণে আসেন তখন তিনিও ছিলেন এখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

এই রামানুজ হয়সালরাজ বিট্টল দেবকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। বিট্টলদেব পূর্বে ছিলেন জৈন ধর্মের সমর্থক, কিন্তু রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি পরম বৈষ্ণব হন। পরে বেলুরের বিখ্যাত বিষ্ণুমূর্তি চেন্ কেশব এর প্রতিষ্ঠা করেন।

বলে উঠি—মহর্ষি রমণের কথাও শুনেছি। ইংরেজ সাহিত্যিক সমারসেট মম্‌ও নাকি কিছুদিন তাঁর আশ্রমে ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেনও। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দর্শনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা জন্মে এই খানেই।

বিজলী সরখেল শোনায়।

—ওর রেজার্স এজও পড়েছি। তখনও কথাটা মনে হয়েছিল, কিন্তু এ খবর জানা ছিল না।

ইলা প্রশ্ন করে—অরুণাচলম্‌-এ যাচ্ছি না আমরা?

—না···ওটা ভেল্লিপুরম কাটজাদি লাইনে তিরুবণনামালৈ স্টেশনে নেমে যেতে হয়। বহু প্রাচীন মন্দির। মহর্ষি রমণ ওখানেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন?

কথাটা মনে হয় সারা দাক্ষিণাত্যের ধূলিকণায় আছে পুণ্যরজ, ওর প্রতিটি লোকালয় জনপদ সেই মন্দিরের স্পর্শে পুণ্যময়। মাত্র কিছু দিনের ভ্রমণে ওখানের সব মন্দির স্পর্শ করা যায় না, দেব দর্শন—মনন —চিন্তন তো দূরের কথা!

বিজয়বাবু গুণগুণ করে চলেছে।

—প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্‌।

চিদাম্বরম মন্দিরের গোপুরম দেখা যায়। ওরা খুশীভরে এগিয়ে চলে। বিরাট মন্দির।

চেলি পাণ্ডু এবং নায়ক রাজারা এই মন্দিরের নানা উন্নতিবিধান করেন। চিদাম্বরম্‌ পুণ্য তীর্থে নন্দানর, তিরুনীলকান্তর, মাকেণ্ড থেবর প্রভৃতি মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। তামিল কাব্য জগতের তৎকালীন প্রখ্যাত কবি মানিকা ভাসাগর, অরুণ মৌলি থেবর—সেকৃকিলার প্রভৃতি কবিও এখানেই বাস করে নটরাজ শিবের প্রাসাদে কবিতা রচনা করেছেন।

বিশাল মন্দির—এর দুই দিকেই নদী, মধ্যে প্রায় ৩২ একর পরিমাণ জমির উপর প্রাকার বেষ্টিত এই গ্রানাইট পাথরের মন্দির। আশপাশে

কোথাও পাথরের কিছু মাত্র নেই। অনুমান পঞ্চাশ মাইলের ওদিক থেকে এ পাথর সবই আমদানী করতে হয়েছিল। দুটি সুন্দর গোপুরমে মহাদেবের বিভিন্ন নৃত্যরত মূর্তি। তার সংখ্যা বোধ হয় ১০৮ টি।

গোপুরমের প্রতিটি নৃত্যছন্দ সুঠাম—অর্থবহ।

অন্য সব মন্দিরের মধ্যেও দু' একটা মণ্ডপ আছে। এখানের মন্দিরে ওই মণ্ডপগুলি প্রসিদ্ধ এবং অপূর্ব অলংকরণময়।

মন্দিরে চারটি মণ্ডপ আছে, তারমধ্যে প্রধান এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে রাজসভা– বা সহস্র মণ্ডপ। এটি প্রায় ৩৫০ ফুট দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ২৬০ ফিট।

বিমলদা বলে—এতবড় মণ্ডপ শ্রীরঙ্গনাথম—আর মীনাক্ষী মন্দিরেই আছে। এ ছাড়াও আছে দেবসভা মণ্ডপ, চিৎসভা মণ্ডপ, কনকসভা আর নৃত্যসভা মণ্ডপ।

বিমলদা বলে চলেন—শিবকে পঞ্চভূতের মধ্যেই কল্পনা করা হচ্ছে। ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম! এখানের নটরাজ মহাদেবকে এরা পূজা করেন আকাশময় ভগবানরূপে, অরুণাচলমে প্রতিষ্ঠিত আছে তেজোময় ভগবানরূপে, অপোময় ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন জম্বুকেশ্বরে। কনকসভা মণ্ডপের গঠনপ্রণালী অপরূপ, এর বিমানটি স্বর্ণমণ্ডিত। কণকসভায় দেবতার দিকে চেয়ে থাকি। সেখানে শিব নটরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত। মহাছন্দে সৃষ্টি প্রলয় সেখানে বিধৃত।

নৃত্যসভায় অপরূপ এই, শিল্পশৈলী মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। এক কথায় চিদাম্বরণকে শিল্পশৈলী শৈবমন্দিরগুলির মধ্যে বোধহয় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক।

তেপ্পাকুল্লমের ওপাশে রয়েছে সুব্রামণ্যম্ মন্দির, এর মন্দির-গাত্রের কারুকার্যও অত্যন্ত সুন্দর। বলে উঠি।—এই মন্দির পাণ্ডু রাজবংশের তৈরী। এই মন্দিরের নাম নাগুনার সুবাম্বল মন্দির। এই চিদাম্বরম্ সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে।

—কি সেটা! বিজলীই প্রশ্ন করে।

—উত্তর ভারতের রাজা সিংহবর্মা একবার দক্ষিণাপথে তীর্থ পরিক্রমায় এসেছিলেন। তখন এ সব জায়গা বনে ঢাকা ছিল। মন্দিরের ওই তেপ্‌পাকুল্লম তখন বনের মধ্যে একটা পুষ্করিণী মাত্র, তাতে স্নান সেরে উঠতেই রাজা দেখেন তার দেহে সোনার একটা আস্তরণ পড়ে গেছে। সেই থেকে তাঁর নাম হয়েছিল হিরণ্য বর্মা। ওই যে কণকসভার চূড়ায়, সোনা রয়েছে সে সোনা এই পুষ্করিণী থেকেই তোলা হয়েছিল।

বিজলী বলে—একবার ডুব দেবো নাকি ?

জবাব দিই—ও কালির অঙ্গ সোনায় মুড়ে দেবার ক্ষমতা দেবতারও নেই।

বিজলী কৃত্রিম গম্ভীর হয়ে বলে।

—খুব বেয়াড়া হচ্ছেন কিন্তু মাঝে মাঝে ?

হাসতে থাকি।

বিজয়মাষ্টার তখন নৃত্যসভার দেওয়ালে চোখ রেখে হাত-পা ছুড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তার শীর্ণ প্যাকাটির দেহ আর মাথার বাবরি চুল তেমনি বিচিত্র ছন্দে দুলে উঠছে।

নটরাজের আনন্দ তাণ্ডব থেকে শুরু করে রুদ্র তাণ্ডব পর্যন্ত সব সে ধাতস্থ করে নিচ্ছে আর কি।

দু'একজন কৌতূহলী যাত্রীও ওকে দেখছে, বিজয় মাষ্টারের সে খেয়াল নেই।

সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে মন্দিরের চত্বরে।

বিজয় মাষ্টারের অন্য ছাত্রছাত্রীরা এদিক ওদিক ঘুরছে, বিজয়ের খেয়াল নেই।

—ও মশাই ! যাবেন না ?

—এ্যাঁ! বিজয় চমকে ওঠে। বলে।

—যেতে বলছেন ? যাবো না। পড়ে থাকবো এইখানেই। সারাজীবন কাটিয়ে দোব। আহা—

হঠাৎ এদিক ওদিক দেখে মাষ্টারের খেয়াল হয়, ছাত্রীরা নেই। তার প্রিয় ছাত্রী মলিনাকে নিয়ে বিশু মল্লিক তখন মন্দিরের বাইরে দু-একটা দোকানে কি দেখছে। ইলা চলে এসেছে আমাদের এখানে।

বিজয় মাষ্টার এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে।

পূজারী ব্রাহ্মণই বলেন।

—নৃত্যশাস্ত্র, বিশেষ করে ভারতনাট্যমের এককালে পীঠস্থান ছিল। এখনও মাঝে মাঝে অনেক নৃত্যশিল্পী আসেন।

কথাটা মনে পড়ল। মাদ্রাজের প্রখ্যাত ভারতনাট্যমের শিল্পী বিজয়লক্ষ্মীর অনুষ্ঠান দেখেছি, নাচবার সময় বিরাট এক নটরাজ মূর্তির জ্যোতি মণ্ডপে প্রদীপ জ্বেলে তাঁরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বিশু মল্লিক আর মলিনা স্টেশনে ফেরে একটু পরে। মলিনার হাতে একটা ছোট নটরাজ মূর্তি। দাম প্রায় তিরিশ টাকা।

বিশু মল্লিক খুশীভরে বলে চলেছে।

—আরে মশাই এতো শুধু নটরাজ; ধিঙী দেবতার নাচ। জ্যান্ত নাচ দেখতে চান চলুন লাফটতে। পিয়ারী গুলনম বাইজীর নাচ দেখলে ধাত ছেড়ে যাবে মশাই। সেবার ভাইপোর বিয়েতে এসেছিল মুজরো নিয়ে—

বিজয় মাষ্টার মলিনাকে ওর সঙ্গে ফিরতে দেখে প্লাটফরমের ওদিকে সরে যায়। ঘনঘন সিগারেট টানতে থাকে।

বিজলী হাসে—নাটকটা দেখবেন না?

ওর দিকে চাইলাম। বলে উঠি।

—সরখেল মশাই তোমাকে খুঁজছে।

—খুঁজুকগে। বুঝলেন জীবনের অর্থ যেদিন বুঝিনি সেদিন ওকে বিয়ে করতে হয়। তারপর থেকেই সংসারের বোঝা একই ভাবে বইছি। কোনকিছুতেই নেই শুধু শাসন—এটার অধিকার তাকে কে দেবে বলতে পারেন? কারো ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে চাইনা।

চারিদিকেই সে এক অতৃপ্তি আর শূন্যতার হাহাকার। ওটা কিছু নতুন নয়, ওকে তাই ভুলতেই চাই।

একশো ছাপান্ন কিলোমিটার পথ ত্রিচিরাপল্লী। রাতের অন্ধকারে আবার কুম্ভকোনাম তাঞ্জোর স্টেশন পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম ত্রিচিনাপল্লীতে। রাত্রি তখন ভোর হয়ে আসছে। প্রায় ফাঁকা গাড়ী, তাতেই ঘুম দিয়েছিলাম। বিজয়মাষ্টার বোধহয় ঘুমোয়নি। তার ডাকেই ঘুম ভাঙলো। ট্রেন তখন গোল্ডেন রক্ পার হয়ে ত্রিচনাপল্লী সিটির দিকে এগোচ্ছে।

বাকী ঘুমটুকু সেরে যখন উঠলাম তখন বেলা বেশ হয়ে গেছে। কর্মব্যস্ত শহর। লোকজন সব কাজে বের হয়েছে।

• আজ সারাদিন ত্রিচিরাপল্লীতে থেকে রওনা হবো রাত্রে মাত্বরার দিকে।

বিজলী বলে—মন্দির দেখে দেখে সব মন্দিরময় হয়ে গেল। আজও মন্দির দেখবো। শ্রীরঙ্গনাথম্ আর জম্বকেশ্বর।

—মাত্বরায়?

জবাব দিই—এবার গিয়ে মাত্বরার মন্দির দেখবো না, সোজা যাবো কোদাই কানাল, সেখান থেকে ফিরে ত্রিবাস্ত্রম হয়ে রামেশ্বরম ফেরার পথে মাত্বরায় মীনাক্ষী দর্শন করবো।

স্নান খাওয়ার পাট সেরে একটু জিরিয়ে নিয়ে বের হলাম শ্রীরঙ্গ-নাথম্ মন্দিরের দিকে। পুলক বলে।

—সেদিন রাত্রে রকটেম্পলের ছবি নেওয়া হয়নি।

জবাব দিই, আজ দিনের আলোতে নোব। পথে একবার কলেজে খোঁজ করে সেই অধ্যাপক ভদ্রলোককে পাই কিনা দেখবো।

আলো ঝলমল দিন। ট্যাক্সিওয়ালা আজ কোন গোলমালই করেনি। স্টেশন থেকে রকটেম্পল—সেখানে কিছু ফটো তুলে পিছনের বিরাট সরোবরের পাশ দিয়ে একটু দূরেই পেলাম সেই জোসেফ কলেজ, ওখানেই কাছাকাছি লর্ড ক্লাইভ থাকতেন। তার বসতবাড়ী আজ একটা ছাত্রাবাস, নাম ক্লাইভ হোটেল।

আরও কিছু দূরে ন্যাশন্যাল কলেজ। সেখানে খোঁজ করতেই সেই ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। বেশ খুশি হয়েছেন আমাদের দেখে।

—এসেছেন তাহলে ?

—নিশ্চয়ই। বলুন এবার আপনাকেই গাইড হতে হবে। শ্রীরঙ্গনাথম আর জম্বকেশ্বর মন্দির যাবো।

একটু পরেই আসছি।

—ভদ্রলোকের ক্লাশ বোধহয় অন্য কারো ঘাড়ে চাপল আজ।

—ভদ্রলোক তবু বের হয়ে এলেন। ...গাড়ী এইবার সহরের সীমানা ছাড়িয়ে কাবেরীর দিকে চলেছে। একটু গিয়েই পড়ে কাবেরীর সেতু, নীচে দিয়ে ঘোলা জল বয়ে চলেছে, বেশ টান, ব্রিজের এ পারে নারকেল গাছ ঘেরা শান্তপল্লীর সীমানায় এসে গেছিলাম।

এদিকে ব্রিজে ওঠার জন্য বাস-গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম মাদুরা-মাদ্রাজ লাইনের বাসও আছে, তাছাড়া ত্রিচিনাপল্লী সিটি বাসও এইদিকে আসে, একেবারে জম্বকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত যায়।

ওপাশে কাবেরী আর এদিকে কলিরুণ নদী, মাঝখানে একটি বদ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত এই শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির।

কাবেরী এবং কলিরুণ নদীকে পৃথক করে একটি বৃহৎ বাঁধ তৈরী করেন চোলরাজারা একাদশ শতকে, কাবেরীর জলধারাকে ওই বাঁধ থেকে সেচের জন্য তাঞ্জোরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই বাঁধ প্রায় ১০৮০ ফিট লম্বা আর ৬০ ফিট প্রশস্থ। পরে Sri Aurther Cotton ও ১৮৩৮ খৃঃ এই বাঁধের সংস্কার এবং সংযোজন করেন।

চোল রাজাদের সেই বাঁধ আজও শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরকে রক্ষা করে চলেছে।

বলে উঠি—ট্রেনে আসবার সময় দুটো ব্রিজ পার হতে দেখলাম। একটি মূল কাবেরী অন্যটি ওই কলিরুণে।

ছায়াঘন পল্লী অঞ্চল। পিচঢালা রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে। মাঝে মাঝে যাত্রীদলও দেখা যায়। অধ্যাপক ভদ্রলোকই বলেন,—খুব ভালো সময়ে আপনারা এখানে এসেছেন। বৈকুণ্ঠ একাদশীর সময় শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে বড় উৎসব হয়।

—একাদশীর দু'একদিন এখনও বাকী।

তা হোক, উৎসব এবং যাত্রীদলের সমারোহ কিছু আগে থেকেই শুরু হয়। দক্ষিণ ভারতের বিদাশ্বরম্ যেমন শৈব সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির তেমনি বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্র এই শ্রীরঙ্গনাথম্ মন্দির। মহাভক্ত এবং ধর্মপ্রচারক শ্রীরামানুজ এই মন্দিরের দেবতাকে অর্চনা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া পুরাণের সেই কাহিনী তো জানেন?

—বিভীষণের আনীত এই মূর্তি তো?

—হাঁ।

—শ্রীরঙ্গনাথম্ সবদিকে দক্ষিণ ভারতের একটি স্মরণ দেবতা, স্মরণীয় দর্শনযোগ্য মন্দির শুধু নয়, মন্দির দুর্গও বলা যায় একে।

অধ্যাপক ভদ্রলোক শোনাল।

অবশ্য দুর্গ হিসেবে আগেও এটা ব্যবহৃত হয়েছে। ওই চাঁদ সাহেব আর মহম্মদ আলির মধ্যে সংঘাতের সময়, ইংরেজ মহম্মদ আলির পথ অবলম্বন করে আশ্রয় নেয় ত্রিচিনাপল্লীতে আর রকফোর্টে, এদিকে চাঁদা সাহেব ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে তার মূল শিবির স্থাপন করে কাবেরীর অপর পারে ওই শ্রীরঙ্গনাথম্ মন্দিরে।

—দেবতা?

—হাসেন অধ্যাপক মশাই, বলেন। মানুষের উন্মত্ততার কাছে দেবতা চিরকালই স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ট্যাক্সি এসে থামল উৎসব সাজে সজ্জিত মন্দিরের বাইরের তোরণে। দোকানপসার আছে—আরও দোকান বাজার রয়েছে মন্দিরের প্রাকারের মধ্যে।

বিশাল প্রাকার। চারিদিকে শুধু ছোট বড় গোপুরম্। প্রথম প্রাকারের দৈর্ঘ্য ৩০০০ ফিটেরও বেশী, প্রস্থ ২৫০০ ফিট। ভিতরে ঢুকেই অবাক হই। দোকান-বাজার এমনকি বাসগৃহও রয়েছে।

প্রথম প্রাকারের পর গোপুরম্ আবার দ্বিতীয় প্রাকার। সেখানেও তাই। তৃতীয় প্রাকারেও দোকানপাঠ রয়েছে। এইবার বোঝা যায় সুরক্ষিত একটি দুর্গ ই। এর ভিতরেই জীবন ধারণের সব আয়োজন থাকতো। চারিদিকে উচ্চপ্রাকার দিয়ে সুরক্ষিত একটি নগরী। মন্দিরনগরীরই বলা যেতে পারে একে।

চতুর্থ প্রাকার থেকে মূল মন্দিরের সীমানা। এর প্রাকার দৈর্ঘা প্রায় ৪১২ গজ এবং প্রস্থে ২৮৩ গজ।

এতক্ষণ আমরা যেন একটা নগরের মধ্যেই ছিলাম, এবার শুরু হল মন্দির। জুতো রেখে প্রকাণ্ড পিতলের ভারি দরজা আর চৌকাঠ পার হয়ে মন্দির সীমানায় ঢুকলাম।

চারিদিকে কলরব মুখর পরিবেশ। উৎসবের সুর ওঠে। কথা হচ্ছিল মাদুরা নির্মাণশৈলী। অধ্যাপক মশাই দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দির ঘুরেছেন, দেখেছেন শিল্পীমন নিয়ে। বিশ্লেষণ-যুক্তি তথ্য বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বলেন।

—পাণ্ড্যরাজারা ১১৫০ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাদের নির্মাণশৈলী সীমাবদ্ধ ছিল গোপুরম্ ইত্যাদিতে, তারপর এলেন নায়করাজ বংশ। এঁরা মন্দিরকে সামগ্রিক ভাবে উন্নত ধরণে তৈরী করেছিলেন, দ্রাবিড় সভ্যতার শেষ নিদর্শন রেখে গেছেন ওই নায়করাই। তাঁদের নির্মাণশৈলীকে বলা যেতে পারে মাদুরা রীতি। এই রীতিমতে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে পড়ে মীনাক্ষী মন্দির, শ্রীরঙ্গম, কামেশ্বরম, চিদাম্বরম, শুচীন্দ্রম ইত্যাদি। তবে মীনাক্ষী মন্দির সবদিক থেকে বড়। এখানে মূল দেবতা পদ্মনাভ বিষ্ণু, সেখানে সুন্দরেশ্বর মহাদেব আর মীনাক্ষী দেবী।

শ্রীরঙ্গমে সর্বমোট সাতটি প্রাকার ও একুশটি গোপুরম। ভিতরে

গিয়ে দেখবেন এবং মূলমন্দির ছোট, আড়ম্বর বিহীন। সেটা অনুমান একাদশ শতকে তৈরী, কিন্তু তারপর মণ্ডপ বা গোপুরম ইত্যাদি তৈরী হয়েছে সপ্তদশ শতকে।

চতুর্থমণ্ডপে আমরা এসে দাঁড়ালাম সহস্র মণ্ডপে। এর থামগুলি বিশাল, সবই গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরী। মূর্তিগুলো আরও সজীব, সেই অশ্বারোহী মূর্তি এখানে আরও নিখুঁত।

চতুর্থ মণ্ডপ পার হয়ে ভিতরের তৃতীয় মণ্ডপ। মণ্ডপটিকে বলা হয় গরুড় মণ্ডপ। এইখানে রয়েছে সূর্য পুষ্করিনী, এই প্রাকারের উত্তর দিকে চন্দ্রপুষ্করিনী। পুরাণে কথিত আছে এই চন্দ্রপুষ্করিনীর তীরে ভগবানবিষ্ণু মহামন্বন্তর অবধি অনন্তশয্যায় শয়ান থাকবেন।

ভিতরে মূলমন্দির তার সামনে কম্বমণ্ডপ্ম্। এইখানে রঙ্গনায়কীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক ভদ্রলোক বলেন।—এই মণ্ডপে প্রখ্যাত তামিল কবি কম্‌বন্‌ মূল রামায়ণ শোনাতেন দেবীকে।

সেইখানেই বহু নরনারীর ভিড়।

এপাশে মূলমন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি। সামনের মণ্ডপে জনতার ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিতলের রেলিং আর চেন দেওয়া। দেবদর্শনের জন্য দর্শনী চারআনা—অবশ্য তার জন্য রসিদ আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই মন্দিরের দিকে।

ছোট মন্দির, বিমানটি স্বর্ণ নির্মিত। মন্দিরের বৈভবও প্রচুর। তাই সশস্ত্র রক্ষীর ব্যবস্থাও আছে। মণিমুক্তার সংগ্রহও কল্পনাতীত।

প্রায়ন্ধকার মন্দির। ছোট্ট একটি চৈত্যের মত, একসঙ্গে দশজনের বেশীর স্থান নেই। প্রদীপের আলোয় দেখা যায় বিরাট মূর্তি সহস্রফণা বাসুকী দেবতার শিররক্ষা করছে। সবকখানাই স্বর্ণ নির্মিত। সমস্ত মূর্তিকে ঘিরে সোনার স্তূপ, পা হাত সবই স্বর্ণ নির্মিত।

প্রায়ান্ধকার মন্দিরে উঠছে ধূপের সুবাস, রহস্যময় মহাদেবতা অনন্তশয়ানে রয়েছে নাভিকুণ্ডল থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্বর্ণপদ্ম।

যেমন বিরাট মন্দির তেমনি এই দেবতা। ভয় বিস্ময় এবং আনন্দে মন ভরে ওঠে। এই মহারূপের কল্পনাও করা যায় না।

বের হয়ে এলাম, পিছনে আরও বহু দর্শক ভক্ত আছেন। ওদিকে কম্বমণ্ডপে তখন নাদেশ্বর মৃদঙ্গের সুর ওঠে। নরনারীর মেলা তাই ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

রামায়ণের পালা শুরু হয়েছে উৎসবের মাঝে।

সঙ্গে বাদ্য ভাণ্ড আর নৃত্যও।

মন্দিরের পূজারীদের অনেকেই আজও এই ভারতনাট্যমের চর্চা রাখেন, এ তাঁদের দেবসেবার একটি অঙ্গ।

বহু দর্শকের ভীড় জমেছে। আমরাও একদিকে বসে পড়লাম। বড় সানাই-এর মত বাঁশীকে বলা হয় নাদেশ্বরম্। বেহালা আর মৃদঙ্গের তালে তালে দু'জন নর্তক নেচে চলেছেন।

পরে শুনলাম একাদশী দেবীর অসুর বিজয় পালার একটি নৃত্যানুষ্ঠান। গানের ভাষা বুঝলাম না, তবে নাচের মুদ্রা তাল লয় মান নিখুঁত ধরণের। মন্দিরের বাইরে এ-সব নৃত্যের অনুষ্ঠান বড় একটা হয় না।

এইসঙ্গে দক্ষিণী বৈষ্ণব কবিদের বন্দনা গানও গাওয়া হচ্ছে। অধ্যাপক মশাই বৈষ্ণব কবি পোয়গী অ্যাল্‌ভয়ের একটি পদের অনুবাদ করে শোনালেন।

—শ্যাম মহাবিষ্ণু এখানে শ্রীরঙ্গনাথ নামে পূজিত, পবিত্র বেদেই তার গুণ বর্ণনা করতে পারে না, সেই অনন্ত মহিমাময় ভগবান আমাকে ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদান করুন।

অন্যান্য বৈষ্ণব সন্তদের রচিত আরও অনেক পদ আছে। এই মহাদেবতার গুণগান প্রসঙ্গে।

মন্দির মণ্ডপ থেকে বের হয়ে আসছি। ভিড়ও বাড়ছে যাত্রীদের। বড় মণ্ডপ ভর্তি হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক ভদ্রলোক বলে চলেছেন।

—ত্রিচিনাপল্লীতে তখন মালিক কাফুর হানা দিয়েছে। শ্রীরঙ্গনাথম,

মন্দিরের দেবতাকে সেদিন পূজারীরা মহীশূর রাজ্যে লুকিয়ে নিয়ে যান। সেখান থেকে ত্রিরুপতির পার্বত্য মন্দিরে এঁকে রাখা হয়। পরে ১৩৭১ খৃঃ মুসলমান প্রভাব এখান থেকে কমে গেলে দেবতাকে এইখানে এনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

একটার পর একটা চত্বর পার হয়ে আসছি। বাইরের চত্বরে তখন মেলা বসে গেছে। দেখি শীতকাল ডিসেম্বর মাস, তখন প্রচুর পাকা কাঁটাল বিক্রী হচ্ছে।

তাছাড়া আম—তালশাঁসও আছে।

—এখন এখানে এসব হয়?

—অধ্যাপক ভদ্রলোক জবাব দেন।

—কোদাই যাচ্ছেন, ত্রিবান্দ্রম কন্যাকুমারীও যাবেন। দেখবেন সেখানে এসব ফল এখন প্রচুর ফলে।

শ্রীরঙ্গনাথম্ মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম।

সত্যি বিরাট একটি মন্দির। সারা দক্ষিণভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবায়তন।

—এরপর যাবেন জম্বুকেশ্বরে?

অধ্যাপকই আমাদের পথপ্রদর্শক। গাড়ীটা আবার সবুজ গাছ-নারকেলকুঞ্জের পাশ দিয়ে চলেছে। ক্রমশঃ জনবসতি এখানে ঘন হয়ে উঠেছে।

ট্যাক্সি এসে বাধা পেল রেলওয়ে লেবেলক্রসিং-এ। ফটক বন্ধ। আরও ট্যাক্সি বাস পিছনে এসে জমেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেখা গেল ট্রেনটা।

দু বগির একটা গাড়ী, ছোট ডিজেল ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলেছে। লোকাল ট্রেন।

পথ পেয়ে আবার ওপারে মন্দিরের দিকে চললাম। অধ্যাপক ভদ্রলোক বলে চলেছেন।

—রঙ্গনাথম্ দেখলেন বৈষ্ণব মন্দির, আর জম্বুকেশ্বর তেমনি শৈব

মন্দির। পুরাণেও এর উল্লেখ আছে। জম্বুকেশ্বরের এই অঞ্চলে তখন ঘন অরণ্য, অরণ্যের মধ্যে একটা হাতী প্রস্তরের লিঙদেবতাকে কাবেরী থেকে শুঁড় দিয়ে জল এনে রোজ পুজো-অভিষেক করতো। আর এক মাড়সাও ছিল শিবের ভক্ত। সে রোজ জালবুনে রাখতো শিবের মাথার উপর, যাতে বনের কোন পাতা বা ময়লা দেবতার উপর না পড়ে।

হাতীর একদিন নজরে পড়তেই হাতী রেগে গেল, সে ভাবলো দেবতার মাথার উপর মাকড়সা থাকবে জাল বুনে—এ কেমন কথা। শুঁড় দিয়ে সব ভেঙ্গে দিতেই শিবভক্ত মাকড়সাও তার শুঁড়ের ভিতর ঢুকে এমন কামড় দিল যে হাতী তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য শুঁড়টাই আছড়াতে লাগলো। এই করে তুজনেই দেহত্যাগ করে। শিব তখন ওদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ওদের মোক্ষ প্রদান করেন। কথিত আছে চোল রাজবংশের অন্যতম রাজা কোচ্‌সেনগহ্‌ শিবের আশীর্বাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে চোলরাজারাই এই দেবতার উপাশক ছিলেন। এখনও মহাদেব জাগ্রত বলে পূজিত।

বিরাট গোপুরমের সামনে এসে হাজির হয়েছি।

এই পল্লীর মত অঞ্চলে অপরাহ্নের আলো নামছে। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে বিরাট সুন্দর এই মন্দিরে এসে ভালোই লাগলো। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের মত কোলাহল ভিড় এখানে নেই।

স্তব্ধ শান্ত পরিবেশ।

এ মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৪০০ ফিট, প্রস্থও প্রায় ১৫০০ ফিট। এর প্রাকার সংখ্যা পাঁচটি। বহিপ্রাকারকে বলা হয় তিরুকন্‌ নিত্তি প্রাকারম। কথিত আছে মন্দিরের দেবতা স্বয়ং এই প্রাকারের নির্মাণ কার্য পরিচালনা করেন। দিনান্তে শ্রমিকদের এক পুরিয়া করে ভস্ম দেওয়া হত। বাড়ি ফিরে পুরিয়া খুললে শ্রমিকরা দেখতো তাদের দিনকার মজুরি রয়েছে তাতে।

ওর ভিতরে আইরক্‌ল মণ্ডপম্, এখানে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপও বিখ্যাত। বিমলদা বলে।

—এর কাজকর্ম কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম।

বলি—তা সত্যি। তবে ও মন্দিরের এক একটা থাম এক পাথরের তাও প্রায় চল্লিশ ফুট অবধি আছে। এখানে ছোট তাই তাতে কাজও আরও নিখুঁত।

অধ্যাপক মশাই তার পরের মণ্ডপে ঢুকে কি খুঁজছিলেন। সেটা পেয়ে যেতেই আমাদের ডাকছেন। বলেন সামনেই অকিলাণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির, এখনও ওখানে মাধ্যাহ্নিক পূজার সময় পূজারীকে নারীবেশ ধরে পূজা দিতে হয়, এই এখানকার রীতি।

ওপাশেই একটি অপূর্ব খোদিত মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। অপূর্ব মূর্তি! পাথরের মধ্যেও যেন সজীব হয়ে রয়েছে। অধ্যাপক মশাই বলেন—একপাদ ত্রিমূর্তি! একপাদ মহাদেব মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, দুই দিকে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, তাদের বাহন নন্দী, হংস এবং গরুড়ও রয়েছে। এক প্রবাদ আছে অতীতে এই মূর্তি এত জাগ্রত ছিল যে কোন ভক্ত অশুচি মন নিয়ে এর পূজা দিলেই তার কোন না কোন ক্ষতি হ'ত। ভগবান শঙ্করাচার্য নিজে ওই মূর্তির দুই কানে চক্র সমেত টোড়ু প্রতিষ্ঠা করেন—তারপর থেকে দেবতার সেই কোপপ্রভাব প্রশমিত হয়।

তবে মূর্তিটি শিল্পশৈলীর দিক থেকে অনুপম।

মূল মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই। চারিদিকে এর জল, চাতাল একটু নীচে, পায়ের পাতা ডুবে যায় জলে। জলের মধ্যেই ছোট একটি গর্ভগৃহ—মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়, গর্ভগৃহের সামনে ছোট একটি মন্দির মত, একটি জম্বুগাছের নীচে এই অপর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

লিঙ্গের চারিদিক থেকে জল বের হয়, সেই জল উপছে পড়ে গর্ভগৃহে নীচের চাতালে। জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পুজো অর্চনা করতে হয়। অন্ধকার যেন ছোট্ট মন্দিরের মাঝে ঘনীভূত, প্রদীপের আলোয় দেবতাকে সামান্য দেখা যায় মাত্র। প্রণাম করে বের হয়ে এলাম।

···পাশেই এক ভদ্রলোক, মুখ চেনাচেনা। তিনিও সপরিবারে এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে ওই মন্দিরের দেবতাকে পূজো দিচ্ছিলেন। পরনে সেই সাধারণ লুঙ্গি আর কামিজ, অধ্যাপক মশাই বলেন। ওকে চেনেন ?

জবাব দিই ঠিক চিনি না, তবে মনে হয় চেনা মুখ।

—উনি তামিল চিত্রজগতের নাম করা অভিনেতা শিবাজী গণেশন্। দেবমন্দিরে পূজো দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

মন্দিরের ভিতরে তখনও আমরা ঘুরছি, বিরাট মণ্ডপের থামগুলোয় মনোরম কাজ। মাঝে মাঝে দু একটা শিলালিপি। অধ্যাপক মশাই জানান।

—ওসব চোলরাজাদের দানপত্র, মন্দিরকে তারা যা দান করতেন তা প্রকাশ্যে রাখা হ'ত। মঁন্দিরেই একটি গোপুরমের সামনে মন্দিরের একটি হাতী দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণের অনেক মন্দিরে রেওয়াজ এখনও আছে।

কাঞ্চীপুরে একাম্রনাথ মন্দিরেও হাতী দেখেছি, রঙ্গনাথ মন্দিরেও রয়েছে। বিমলদা বলে।

—ওটা একটা বৈভবের চিহ্ন। দেবতার বৈভব তো দেখছো।

মীনাক্ষীদেবীর ও নিশ্চয়ই হাতী আছে।

অধ্যাপক মশাই সায় দেন—তা নিশ্চয়ই আছে।

মাহুতও পাশে রয়েছে। কে একটা তিন পয়সা দিতে হাতী সেটাকে উঠিয়ে যে দিয়েছিল তার গায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল ; একটা দশ পয়সা দিতে তবে হাতীবাবাজার মন ওঠে ; সেটা তখন কুড়িয়ে নিয়ে মাহুতের হাতে দিল।

—মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম।

এবার ফেরার পালা। অধ্যাপক বন্ধু এবার বলেন।

—গরীবের বাড়ী হয়ে যেতে হবে, বিগ্‌বাজার কাছেই।

ছোট্ট সুন্দর বাড়ীটি। অধ্যাপক মশাই এর গৃহসজ্জা আধুনিক, কিন্তু ভিতরের দিকে ওদের সাবেকীপণা ঠিকই আছে।

কথা হচ্ছিল তামিল সাহিত্য নিয়ে। অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজের ভাষা সম্বন্ধে বেশ সজাগ। তবু নিরূপণ দৃষ্টিতেই কথাগুলো বলেন।

বর্তমান তামিল পত্র-পত্রিকার মধ্যে নাম করা যেতে পারে দিনমণি, দিনশ্রী, কল্কী এবং আনন্দ নিকেতন ইত্যাদি। বর্তমান তামিল সাহিত্যে এদের দান অনেক।

বিমলদা বলে।

—তা সত্যি, তবে সাহিত্য যদি সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাওয়ালাদের কব্জায় গিয়ে পড়ে তাহলে সাহিত্যেরও দুর্ভাগ্য। আজকের সাংবাদিকতায় কতখানি সাধুতা সত্যবাদিতা আছে তা আপনি কি জানেন না?

হাসেন অধ্যাপক মশাই।

ইতিমধ্যে প্লেটে বড়া ভাজা, আলু বক্তা আর ডালমুট এসে গেছে, বাড়ীতেই ভাজা। টাট্‌কা। তাই মন্দ লাগেনা। বলেন অধ্যাপক মশাই।

—আমরা মিষ্টি কম খাই, তামিলনাদের সুইটস্ বলতে পারেন ওই মহীশূর পাগ্।

বর্তমান তামিল সাহিত্যের মধ্যে আশার আলো কতখানি পান্!

—সাহিত্য কৃতির মধ্যে নিরাশ হবার নিশ্চয়ই নেই। এখনতো শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। বাংলা সাহিত্যেও কি স্থায়ী পেয়েছেন এই ভাঙ্গনের যুগে। তবে কি জানেন, তামিল সাহিত্যের ও একটা মহান ঐতিহ্য আছে। বাংলাভাষায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তেমনি তামিল সাহিত্যেও ছিলেন সুব্রাহ্মণ্যম্ ভারতী। ইনি তামিলকে সনাতন রীতি থেকে বের করে এনে মহান সাহিত্য সৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত করেন।

দেশপ্রেমের ভাবে তিনি ছিলেন উদ্বুদ্ধ; তিলক-লালা লাজপথ

রায়—শ্রীঅরবিন্দের সমসাময়িক এই প্রতিভাবান লেখক তামিল সাহিত্যের উদ্‌গাতা।

বর্তমান তামিল সাহিত্য তারপর অনেক সৃজনধর্মী লেখকের অবদানে সমৃদ্ধ। কে. এস. ভেঙ্কটারমণির নামও এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। তাছাড়া আছেন সুধানন্দ ভারতী, নরসিংহ স্বামী, কে. ডি. পিল্লাই আরও অনেকে।

দক্ষিণের নাট্যজগতের দিকপাল সম্‌বন্‌ও মুডালিয়ার, তাছাড়াও আছেন নাটেশ আয়ার, মাধবাইয়া, তামিল সাহিত্যে অনুবাদও প্রচুর হচ্ছে। বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের তারাশঙ্কর বাবুর লেখাও আসছে আমাদের ভাষায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় আকাশের মাথায় রকটেম্পলের নীলাভ বাতিগুলো।

অধ্যাপক বন্ধু রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। পথের পরিচয়, তবু মনে হয় মানুষ এক জায়গাতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে কোথায় বদ্ধ। সেখানে সে মানুষের প্রীতি-বন্ধুত্ব কামনা করে।

তাই দু'দিনের পরিচয়ে ওকে আপনজন—বন্ধু বলে মনে হয়েছে, তাঁরই অনুরোধে তার নামটা এখানে প্রকাশ করতে পারলাম না। তবে তেমনি একটি মানুষকে সহজে ভোঁলা যায় না।

বিগ্‌বাজারে কিছু কেনাকাটা সেরে সোজা স্টেশনে।

বিমলদা বলে,

—আবার সেই মহাবুভুক্ষার রাজ্যে গিয়ে পড়বো, চল কিছু প্যাড়া আর কালাকাঁদ কিনে নিই।

—ফলও এখানে সস্তা। পুলক বলে,

কলা, মুসাম্বির, আঙুর, কমলালেবু। ভালো লেবু টাকায় আটটা—

বিমলদা বলে,

—কাল মাদুরা হয়ে কোদাই যাবো, সেখান থেকেই এসব

আসে। ফল কেনার দরকার নেই। ওই মিষ্টিই কিছু নে, দু'চারদিন থাকবে।

তবু পুরুষ্ট মর্তমান কলা দেখে লোভ লাগে। দর হাঁকে—দেড় টাকা ডজন।

—কলকাতায় নিদেন তিন টাকা হবেই দাদা!

—বাজারে আমাদের দু'একজনকে দেখলাম। বিশু মল্লিক রিক্সা নিয়ে বের হয়েছে, সঙ্গে রয়েছে বিজয় মাষ্টারের ছাত্রী মলিনা।

একটা ষ্টেশনারী দোকানের সামনে কি দর করছে তারা! জিনিসটা বিচিত্র, দেখে এগিয়ে গেলাম।

মাথার চুল বেশ পাঠ করে সাজানো। দাম বলছে বারো টাকা।

—ব্যাপারটা জানা ছিল। বলি,

—তিরুপতি বালাজীর মন্দিরে মানসিক দেওয়া চুল?

—দোকানদার মাথা নাড়ে। বলে,

—এসব বিদেশেই বেশী চালান যায়। বেশী দামে বিক্রী হয় সেখানে।

সরে এলাম, মলিনা আমাদের দেখে একটু যেন অপ্রতিভ বোধ করে। বিমলদা বলে,

—তোর নজর সবদিকে। যা কিনছে কিনুক না ওরা। বিশু মল্লিকের অনেক টাকা, কিছু খসাক পাঁচজনে!

মিষ্টির দোকানে এসে বাকী খাওয়াটা শেষ করলাম। রাতের খাওয়া এই দিয়েই হোল, দেখা যাবে মাদুরায় কাল সকালে।

স্টেশনে ফিরলাম।

সারা শরীর এইবার ক্লান্তিতে ভেসে আসছে। কাল রাত থেকে ভালো ঘুম হয়নি। তাছাড়া সারাদিনের গ্লানি।

এইবার ঘুমে চোখ বুজে আসছে।

তবু ত্রিচিনাপল্লীকে ভালো লেগেছিল, দক্ষিণের অন্যসব সহরের

তুলনায় এইটিকে মনে হয় সুন্দর। ইতিহাস-পুরাণ আর কাবেরী নদী একে গৌরব দান করেছে। মহান করে তুলেছে।

এখানকার দু'একটি মানুষকেও ভালো লেগেছে। তাই পথচলতি মানুষ ক্ষণিকের জন্য বিদায়ী ত্রিচিনাপল্লীর দিকে চেয়ে থাকে।

ট্রেন চলেছে মাদুরার দিকে। মাদুরা মাদ্রাজের দ্বিতীয় নগরী।

রাত্রি হয়ে আসে।

ঘুম জড়ানো চোখে বাইরের দিকে চেয়ে দেখি—বাইরে তখন জোছনার আলো পড়েছে, সবুজ ক্ষেত—নারকেল বন-সীমা ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে পর্বতের সীমারেখা।

অচলা আঁধারিতে তারা কালো অচলমূর্তির মত আকাশ ছুঁয়েছে, তারাজ্বলা আকাশসীমা।

পথে পড়ে কোডাইকানাল রোড ষ্টেশন। মাদ্রাজ থেকে ২৮২ মাইল দূর। এই কোডাইকানাল রোড ষ্টেশন থেকে নেমে বাসে কোদাইকানাল পঞ্চাশ মাইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। হঠাৎ পাহাড়মুলুকে এসে পড়েছি। শীতও বেশ পড়েছে। তাছাড়া সকাল ছাড়া কোন বাসও ছাড়বে না। আমরা মাদুরার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সেইখান থেকে বাসে সোজা কোদাইকানাল যাবো, আরও তিরিশ মাইল পথ বেশী পড়বে। বিমলদা বলে—তা পড়ুক। তবু আরামেই থাকবো।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। রাতভোর হয়ে গেছে। মিটার গেজের ইঞ্জিন আমাদের রেলটাকে ঠেলাঠেলি করে স্টেশনের একপাশে সাইডিং প্লাটফরমে রেখে গেছে।

ভোরবেলায় উঠে আবিষ্কার করা গেল স্টেশনটা। এই ক'দিন আমাদের একটা কাজ বেড়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আমাদের জন্য রেলকোম্পানীর রাজকীয় ব্যবস্থা কোথাও নেই, থাকে না। আশা করা অন্যায়। অথচ স্নান প্রাতঃকৃত্য সবই সারতে হয়। তাই কোন

স্টেশনে আমাদের কামরাটাকে সাইডিংএ দিলে প্রথমে স্টেশনসা
করতে হয়। স্নানের জায়গা-পায়খানার ব্যবস্থা দেখে নিই।

কোথাও বেআইনি ভাবেই প্রথমশ্রেণীর প্রতীক্ষালয় ব্যবহা
করি। কোথাও প্লাটফরমে, কোথাও তাক্ বুঝে ইঞ্জিনের ওয়াটা
কলমে গাড়ীর ওয়াটারিং শেড এর কলমুখে। তাতেই স্নান সেরে নিই

এটা একটা সমস্যা—তবে আটকায় না।

মাদুরা স্টেশন দেখলাম পিল্‌গ্রিমস প্লাটফরমে আলাদা কল বাথরু
—ল্যাট্রিন রয়েছে। রান্নাখাবার জন্য শেডও রয়েছে।

স্নান সেরে জলখাবারপর্ব চুকিয়ে বাসে উঠলাম। সহরের সীমা
ছাড়িয়ে ভোগী নদী পার হয়ে বাস পিচ বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ছু
চলেছে। ডান পাশে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম দেখা যায়
দূর থেকে দেবীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালাম।

আজ নয় ফেরার পথে তোমাকে প্রণাম জানাবার সুযোগ হবে।

বাস ছুটে চলেছে সমতল ভূমির উপর দিয়ে, দুপাশে ধানক্ষেত
নারকেল বীথি, ক্রমশঃ দূরদিগন্তের নীল পর্বতসীমা দেখা যায়।
এগিয়ে আসছে।

একপাশে পালনী রেঞ্জ অন্যদিকে শ্রীমাল্লাই। তামিল ভাষ
মাল্লাই-এর অর্থ পর্বতশ্রেণী। পথের মধ্যে পড়ে ডিন্‌ডিগ্‌ল, বেশ
মোকাম। বাস চলেছে; পর্বতশ্রেণী এইবার কাছে এসেছে। ক্রম
দুদিকেই ছড়িয়ে পড়ে তার বিস্তার।

পিছনে কোদাইকানাল রোড স্টেশন ছাড়িয়ে এসেছি, এর আ
রেল লাইন ছিল আমাদের পাশে পাশে, সেটাও হারিয়ে গেছে।

পাহাড়ের রাজত্বে আমরা ঢুকে পড়েছি।

লোকালয় ছাড়িয়ে এবার দূরে পাহাড়ের দিকে চলেছি। প
দুধারে আম তেঁতুল গাছের প্রহরা। নারকেল গাছ কমে এসে
বাঁদিকে দূর থেকে দেখা যায় একটা জলাধার। ছোট্ট জনপদ।

পাহাড়ের বুক থেকে বেশ বড় একটা জলধারা সাদা রেখার

নীচে নেমেছে, তাছাড়া পাহাড়ের বুকে মাঝে মাঝে ক্ষতের মত গভীর দাগ রয়ে গেছে, বর্ষার জলধারাও ওইসব পথ বয়ে নীচে নামে।

এখন সে সব ধারাপ্রবাহ শুষ্ক, মৃত। তাদের নূপুর নিক্কণও স্তব্ধ।

একপাশে বসে আছে বিজয় মাষ্টার। তার মুখচোখ গম্ভীর। সেই কল কল ভাব তার নেই। পিছনের সিটে ইলা আর বিজলী। অনেকেই জানালার ধার নিয়ে বসেছে। কে জানে যদি বমির বেগ আসে।

এইবার আমরা পাহাড়ের বুকে উঠছি। রাস্তাটা তবু বেশ সোজা। পাহাড়ের কোঠরে তাকের মত লম্বা টানা রাস্তা চলে গেছে, অল্পসময়ের মধ্যেই মনে হয় পালনি পর্বতমালা সাদরে আকাশের বুকে টেনে নিয়েছে, নিয়ে চলেছে কোন রহস্যলোকের পানে।

বিশু মল্লিক নেহাৎ বেহায়ার মতই মলিনার পাশে বসেছে। গায়ে তার ভুর ভুর আতরের গন্ধ। মনের খুশীতে বেসুরো গান গাইছে। হিন্দী ফিলমের কোন কাশ্মীরের পটভূমির গান।

পাল্নী আর কাশ্মীরকে সে কল্পনার জগতে একাকার করে গাইছে।

—দিওয়ানা হুয়ী বাদল॥

বিজলী একবার আমার দিকে চেয়ে চোখ নামাল। ওর ঠোঁটে রহস্যময় হাসির আভা।

আজ মন্দির—সেই ভক্তি আর বাঁধনের বেড়া নয়। আজ আমাদের মুক্তির দিন। দক্ষিণ ভারতের পথে জনপদে মন্দিরের এই বাঁধন ছাড়িয়ে আজ আমরা নির্জন পার্বত্য প্রকৃতির গহনে চলেছি।

বাঁ পাশে বিশাল জলপ্রপাত মন্চলর। প্রায় দুহাজার ফিট উপর থেকে নামছে ও জলধার। নীচে সেই জলধারাকে বাঁধদিয়ে জলাধারা করা হয়েছে।

ছোট্ট খেলাঘরের সাজানো মডেলের মত মনে হয় ওই জলাধার আর আশপাশের ঘর-বাড়ীগুলো।

বাস উঠে চলেছে উপরের দিকে।

এই রাস্তাটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কর্ণেল ল' নামে এক যুদ্ধ বিভাগের ইউরোপীয়ান ইন্‌জিনীয়ার এই রাস্তাটির পরিকল্পনা করেন। সোজা পাহাড়কে বরাবর বাঁক দিয়ে এটা ছোট ছোট বাঁকের সৃষ্টি করে উপরে ওঠেনি। এটা উঠেছে পাহাড়ের গা বয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি জমিয়ে, তাই এ পথে উঠতে কোন কষ্ট নেই। কোনরকম হিল্ সিক্‌নেস্‌ও হয় না।

রাজস্থানের পার্বত্যশহর মাউণ্ট আবু, শিলং-দার্জিলিংএর রাস্তায় বহু ছোট বাঁক আছে, মুসৌরীর রাস্তায় তো আছেই। তাই অনেকের কাছে সে পথ পীড়াদায়ক। হয় ওঠা না হয় নামার সময় ওই ঘনঘন বাঁকের মোড়ে গা গুলিয়ে আসে। তার তুলনায় এপথ অনেক বিজ্ঞান সম্মত। এই পথের নামও ল'জ কার্ট রোড।

কটডক্‌কানল শব্দের অর্থ মৃগতৃষ্ণার উপহার। কথাটার অর্থ সত্যিই সুন্দর। কোডাইকানালের পথে তা সবদিক দিয়ে প্রজোয্য। এখন ফল ফসলের সময়, তাই চারিদিক সবুজ সুন্দর।

কিন্তু মাদ্রাজের গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত উষ্ণ। চারিদিক তখন শূন্য রিক্ত নিঃস্ব। সেই পরিবেশের মধ্যে কোদাই এর সবুজ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য তখন তৃষ্ণার শান্তি আনে সারা মনে।

পাল্‌নী পর্বতমালা পূর্বঘাট-পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পর্বতশ্রেণী। প্রথমে বাইরে থেকে মনে হয় নিঃস্ব এ পর্বত।

কিন্তু যত ভিতরে এর রূপময় জগতে ঢুকছি ততই মনে হয় এ পর্বত সবুজ, ঘন সবুজ সুন্দর এর গাছপালা, প্রভূত বৃষ্টিপাতের ফলে এর বুকে ছোট বড় অসংখ্য ঝরনার রাজ্য, গাছগুলো পাহাড়ের বুক ঠেলে আকাশের দিকে উঠেছে। পাহাড়ের এ বাঁকে সে বাঁকে গজিয়েছে বনস্পতির দল, কোথাও জবা গাছের ঘন বন,—লাল ফুলের মেলা বসেছে। গাছের মাথায় অসংখ্য পরগাছার রাজ্য। ইংরাজীতে ওদের বলে—Trichomoues Filioula.

পাহাড়ের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। পথের ধারে বোর্ডে নিশানা

রয়েছে তিন হাজার ফিট। বাকী এখনও অনেক পথ। কোদাইকানাল প্রায় ৭৬০০ ফিট উঁচু। সহর প্রায় সাত হাজার ফিট উঁচুতে।

পথের দুদিকের গাছ গাছালীর রূপ বদলে গেছে। শুরু হয়েছে কলাগাছের বাগান। সবুজ পাহাড়ের বন জঙ্গল পরিষ্কার করে ওরা কলা-কমলালেবুর চাষ করেছে।

কোদাইয়ের পথে তাই দেখা যায় কমলালেবুর বাগান। কালো গাছগুলোর ডাল ছেয়ে ফেলেছে বেশ বড় সাইজের কমলালেবু, কোনটা গাড় হলুদ কোনটা সবুজে হলুদে মেশানো।

আর রয়েছে কাঁটালের গাছ। পথের দুধারে ঘন সবুজ গাছগুলোয় এসেছে ফলের সমারোহ, পাহাড়ের গায়ে ওরা মাথা তুলেছে। ফলের সার্থকতায় ভরে উঠেছে।

…পথের মাঝে ছোট্ট একটা বসতি। কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী এখানে জিরোবে। এত উপরে ঠেলে উঠেছে ইঞ্জিনকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

মেয়েরাই যেন এখানের সমাজের কর্ত্রী। ছোট ছোট ঝুপড়ির বাইরে রাখা আছে পুরুষ্ট টাটকা পেঁপে, কমলা লেবু আর কলা, এ কলার জাত আলাদা। লাল রং এর বেশ বড় সাইজের অগ্নিসার কলা।

কত করে ডজন?

—মেয়েটি হাত দেখিয়ে জানায়—তিন টাকা।

ওটা ট্যুরিষ্ট রেট। কষাকষি করে দু টাকায় নামে। তিন চারটে কলায় একজনের লাঞ্চ সারা হতে পারে। কমলা লেবু বেশ ভালো সাইজ—টাকায় দশটা।

পেঁপে তা প্রায় এক কিলো ওজনের—একটা নিলাম চার আনায়।

…ওরা কফির দোকানে ভিড় জমিয়েছে। উপরের আশপাশের পাহাড়ে কফির চাষ হয়।…টাটকা কফি, তাই বোধ হয় গন্ধটা একটু কড়া। তবু মন্দ লাগে না। পুলক বলে—শীত শীত করছে।

বিমলদা জানায়—এতদিন তো পাঞ্জাবী উড়িয়েছে, এ যে ছিল স্টেশন রে, কোট সোয়েটার চাপাও।

বড় এলাচও হয় এদিকে। কোডাইকানাল পাহাড়ে সব ফল ফসলই নীচে চলে যায় মাদুরায়—ত্রিচি না হয় মাদ্রাজের দিকে। গোলাপ ফুল আর গাঁদা ফুলের বসত। তার থেকে টুকরি বোঝাই ফুল ট্রাকে করে নীচে নামছে, ফুলের চাহিদা প্রচুর। মাদ্রাজ সহরের ফুল যোগায়, এই কোডাইকানাল পাহাড়।

ট্রাক বোঝাই কাঠ বাঁশও চলেছে বনজসম্পদে পাল্‌নী পর্বতমালা সমৃদ্ধ। এখানের ওই বনান্তরের মানুষ পাহাড়ের অরণ্য গভীরে তাই দিয়েই দিন যাপন করে নিভৃত শান্তির পরিবেশে।

আবার যাত্রা শুরু।

পথ এবার উঠছে উপরের দিকে। কিছু গহন বন পড়ে পথে, এদিকে বাঘ ভালুকও আছে। তবে উপরের পাহাড়ে এ বনের তত প্রসার নেই।

এবার গাছ-পালার শ্রেণী বদলাচ্ছে। পাহাড়ের বুক পরিষ্কার করে লাগান হয়েছে কফির বাগান।

এঁকে বেঁকে চলা পথের ধারে এবার দেখা যায় ছোট বড় ইউক্যালিপটাস গাছের দল। মেঘলোকের নীল আঙ্গিনায় মেঘ পরীদের নাচের মজলিস বসেছে, দু'একখানা মেঘ ঠেলে উঠছে পাহাড়ের মাথায়।

উজ্জ্বল দিনের আলোয় কোদাই যেন স্বপ্নময়ীর রূপ ধরেছে। এখনও সে মেঘ রাজ্যে। প্রায় ছ'হাজার ফিট এসে গেছি আমরা।

সুরপতি বলে—কোদাই আবিষ্কার কে করেছিল দাদা! এই বন পাহাড় ঠেলে তখন আসা তো সোজা ছিল না।

জবাব দিই—তা ছিল না, তবু কিছু ঘর পালানো মানুষ থাকে।

জরিপের কাজে প্রথম এখানে লেঃ বি, এস্, ওয়ার্ড নামে একজন ভদ্রলোক আসেন, তাঁর ভালো লাগে জায়গাটা। সে খবর পেয়ে

Mr. Ronghton আর Mr. Cotton নামে দু'জন আমেরিকান এসে এখানে নীড় বাঁধলেন। তারপর মাদুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. V. H. Levengiও এখানে আসেন। এ জায়গায় অনেক উন্নতি বিধানের মূলে ছিলেন তিনি। অবসর নিয়ে তিনি আর দেশে ফেরেন নি। এই কোডিতেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান।

এখন অবশ্য অনেক আমেরিকান এখানে আছে।

ইউক্যালিপটাস দু' একটা সরল পাইন গাছ এবার মাথা তুলেছে। পাখীগুলো ডাকছে বনে বনে।

হঠাৎ কলগর্জন শুনে ওদিক চাইলাম। বাসটা বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডান পাশে পাহাড়ের মাথা থেকে স্তরে স্তরে লাফ দিয়ে নামছে জলস্রোত, রূপালী জলধারায় পড়েছে সূর্যের আলো। ঝকঝক করছে।

জলপ্রপাতের নাম Silver Cascade.

ওপাশে একটু স্তর মত জায়গায় লাগান রয়েছে গোলাপ ফুলের গাছ। গাছগুলো স্তরে স্তরে সাজানো, ফুলে ফুলে জায়গাটা ভরে আছে। লাল ঘন লাল ফিরে হলুদ বাদমী জাফরান সব রং-এর মেলা বসেছে ওই রূপালী জলধারার পাশে। ক্যামেরা নিয়ে লাফ দিয়ে পড়েছে ওরা।

বিজয় মল্লিকের ক্যামেরা মলিনাকে নিয়ে ব্যস্ত। মলিনাই ডাকে

—বিজয়দা আসুন একটা ছবি তুলি।

—না। তুমিই তোল।

বিজয় মাস্টার সরে গেল। ইলাও হি হি করছে।

—পুলক ভাই!

নেংটি ইন্দুরের মত সরখেলমশাই পুলককে ডাকছে। পুলক তার ক্যামেরা নিয়ে নেমেছে। সরখেলমশাই বলে।

—আমাদের একটা ছবি তুলে দাও ভাই। তোমার বৌদির আর আমার একসঙ্গে।

পুলকের ডাকে বিজলী নেহাৎ অনিচ্ছাসত্বেও এগিয়ে এল ক্যামেরার সাম্‌নে।

সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমি আর বিমলদা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

জলধারা আবর্তের সৃষ্টি করে রাস্তার নীচে দিয়ে গিয়ে বনভূমির সবুজ গহনে লাফিয়ে পড়ছে। বাতাসে ওঠে তারই একটানা শব্দ, পাখীর ডাক মিশেছে ওই জলধারায়। পাইনবনে মধুর সুর তোলে।

একটি চির কল্পনার রাজ্য। দার্জিলিং-শিলং চিরসবুজ কালিম্‌পং-মুশৌরী মাউন্ট আবু সব পাহাড়ই যেন একটি অসীম রূপের সাগরে স্নাত। মানুষ বারবার সেই রূপসাগরে ডুব দিয়ে কি পেতে চায়!

তার জন্যে অঞ্জলি কতটুকু পূর্ণ হয় তা জানি না, তাই বোধহয় বার বার সে আসে।

দক্ষিণ ভারতের বিচিত্র রূপ। কোথায় উর্মিমুখর সমুদ্র, রুদ্রতেজে এসে নিষ্ফল গর্জনে বেলাভূমিতে আঘাত হানে। কোথাও শূন্য প্রান্তর আবার শস্যক্ষেত্র, কোথায় পর্বতসীমা। নীলা বনরাজি সমাবৃত তার অঙ্গ।

চারিদিকে পাহাড়গুলো মাথা তুলেছে, আকাশের মেঘস্তর নীচে এসে হানা দেয়।

হঠাৎ কার হাসির কলকাকলিতে ফিরে চাইলাম। ইলার হাতে ক্যামেরা। সে হাসছে। বলে।

—আপনাদের দুজনের একটা ছবি নিলাম। মেঘগুলোর দিকে চেয়ে কি ভাবছিলেন?

জবাব দিই মেঘদূতের কথা! যদি ওরা কলকাতার দিকে উড়ে যায় খবরটা দিতাম।

—ইস্‌! হাসতে থাকে ইলা।

এবার সহরের দিকে এগিয়ে চলেছি।

পথে সাজানো ইউক্যালিপটাস—তার্পিন আর পুরোনো পাইন

গাছের সীমারেখা। পথটাকে ছায়ান্ধকারে ভরে রেখেছে। ওপাশে একটা গির্জার চূড়া মাথা তুলেছে আকাশে। মাঠে নধর গরুগুলো চরছে।

এরা খেতে পায় তাই সতেজ, সুন্দর।

বাস সহরের এদিক ওদিক হয়ে এসে লেকের পাশে দাঁড়াল। ওপাশেই একটু চড়াই-এর পাশে বাজার।

ছোটখাটো সুন্দর সহর। নির্জন-ভিড় নেই, রাস্তা-ঘাটও ঘন পাইন, দেবদারু গাছে ঢাকা। দুপাশে ছবির মত সুন্দর সাজানো বাড়ি।

ওদিকে আমেরিকান স্কুল।

মাঝে মাঝে টাউন এর নক্সাও আঁকা আছে।

বাজারের কাছে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, কয়েকটা হোটেল। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ওদিকেও হয়।

চৌরাস্তার বাঁহাতে একটু নীচের ধাপে ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউস। চারিদিকে পাইন গাছের প্রহরী, সামনের লনে ফুলের সমারোহ, দোতলা বাড়িটায় আস্তানা মিলে গেল।

কোদাইকানালে এসেছি অসময়ে। রেষ্ট হাউসের ইন্‌চার্জ বলেন, আপনাদের লাক্ খুব ভালো, কাল অবধি কোদাই মেঘে ঢাকা ছিল। দিনরাত বৃষ্টি হয়েছে। আজ সানি ডে, দুএকটা দিন এমনই থাকবে বোধহয়। এসময় কোদাইতে এই আবহাওয়া পাওয়া ভাগ্যের কথা।

ঘরটাও মন্দ নয়। বেশ শীত করছে। কন্‌কনে শীত। তবু রোদের তাপে একটু আরাম বোধ হয়। ভোরেই মাদুরাতে স্নান সেরে বের হয়েছি, তাই খেয়ে নিয়ে বেরুলাম।

ভাত, সম্বরম্—আর ফাউল কারি সঙ্গে টমাটোর চাটনী। বহুদিন পর মুখ বদলাতে পারা গেল। পুলক বলে ওঠে, তবে মুরগীর মাংসেও সেই নারকেল রয়েছে দাদা।

···ছোট্ট রেষ্ট হাউসটি। ইতিমধ্যে আমাদের অনেকেই বাজারের

কাছে অন্য কোন হোটেলে উঠেছে। ইলা সরখেলমশাই সস্ত্রীক আরও দুএকজনকে এনে ঠাঁই দিয়েছি।

আর ঘর নেই। নেত্যকালীবাবু সস্ত্রীক বিজয়মাষ্টারের দল বাজারের কাছে কোথাও উঠেছে। বিশু মল্লিকও নাকি রয়েছে ওই দলে।

কাল বৈকালের বাসে আবার সবাই একত্রে মাদুরায় ফিরবো। আজ সম্পূর্ণ পথের মানুষ—চারিদিকে ছিটিয়ে পড়েছি।

কোদাই এর লোকসংখ্যা মাত্র পনেরো হাজার, তাও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। সেইজন্যেই এর রাস্তা নির্জন-ছায়া-সবুজ।

দুপুরের খাওয়ার পর বের হ'লাম এদিক ওদিক ঘুরতে। কোদাইকানালের অনেক গল্প শুনেছি আমার বন্ধু ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে। তার কাছে কোদাই সব থেকে সুন্দর হিল স্টেশন, আর একটি মানুষের কথাও শুনেছিলাম। এখানে সাধারণ একটি মানুষ।

ইলাও তৈরী হয়ে বের হয়েছে আমাদের সঙ্গে।

প্রশ্ন করে—কার কথা?

—চুক্কাইলিঙ্গম্। এই রেষ্ট হাউসের কেয়ার-টেকার ছিল। সামান্য কর্মচারী হতদরিদ্র বৃদ্ধ লোক। বন্ধুবর ফেরার সময় তাকে বকশিস্ দিতে চান্, সে টাকা ফেরৎ দিয়ে সেই লোকটি জীর্ণ একটা খাতা বের করে বলেছিল—যদি কোডিকে ভালো লেগে থাকে—এতেই লিখে দাও। লিখো তোমার মাতৃভাষা বাংলায়, কলকাতায় ফিরে তোমার বন্ধুদের বলো—তারা এদিকে এলে যেন কোদাই এ আসে।

আমি তাই কোদাই এ এসেছি, কিন্তু চুক্কাইলিঙ্গম্ আজ নেই। সেই বৃদ্ধ এইখানেই মারা গেছে।

ছায়া নেমেছে পথে পথে। ইলা আমার দিকে চাইল। গভীর আয়ত তার চোখের চাহনি।

—কবি সাহিত্যিকরা মানুষের অনেক কথাই মনে রাখে না?

—কেন ?

—নইলে চুক্কাইলিঙ্গমকে ভোলেননি ? আমাদের কথা কি মনে থাকবে ? আমার কথা ?

ওর দিকে চাইলাম। ইলা বলে চলেছে।

—এমনি ঝাউ পাইন বনের ভিতর একটি অলস দুপুরে পা ফেলেছিলাম, আরও কি বলতে গিয়ে ইলা নিজেই থামল।

নিজেকে সামলে নেয় সেই রহস্যময়ী নারী।

—ট্যাক্সি !

কোদাই এর পথে ট্যাক্সির ভিড় নেই। তবু এদিক ওদিক অনেক বিউটি স্পষ্ট আছে। চড়াই ভাঙ্গতে হবে, হাঁটতে হবে দীর্ঘ পথ। তাই ট্যাক্সি নিলাম।

প্রশান্তের কাঁধে ক্যামেরা। আমার বাইনাকুলারটা হাতে নিয়েছি। বিমলদা এখানে এসে যেন কেমন নিস্পৃহ হয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

—হিলস্টেশনে এসে তোদের মেজাজ দেখছি সাহেবী হয়ে গেছে, তা লাঞ্চের পর একটু কফি হবেনা ?

ওটা পরে হবে। আপাততঃ চলো দিকি।

ইলাও এসে জুটেছে। ট্যাক্সিটা বড় ধরণের পাঁচজনের ঠাঁই অনায়াসেই হবে। ট্যাক্সিওয়ালাতো রীতিমত টুরিষ্ট চড়িয়ে খায়।

ওকে ধরতেই সে পকেট থেকে ট্যাক্সি এসোসিয়েশনের একটা ফর্দ বের করে শোনায়।

—টাইগার শোলা ফরেষ্ট, বিয়ার শোলা ফল্‌স, গ্লেন ফল্‌স, পাম্বুর ফল্‌স, ফেয়ারী ফল্‌স, সুইট পাইন, পিলার রক্‌স, ডলফিন নোজ, কোকারস, ওয়স্ক তামাম সব ঘুরিয়ে দেখাবে তারপর আসবে মানমন্দির, ফেরৎ আনবে বাজারে—দর্শনী লাগবে পঁয়ত্রিশ টাকা। থার্টি ফাইভ রূপিজ।

ছোট্ট জায়গা, ট্যাক্সিও নেই। ও ছাড়া সব ঘোরা সম্ভবও নয়।

তাই করকরে শেষতক তিরিশ টাকায় দাঁড়াল।

বিমলদা বলে—তোদের দরাদরী ভাবটা গেল না?

ইলা হাসে—বুঝলেন, উনি খুব চালাক লোক কিনা। সবকিছু বাজিয়ে নিতে চান। যাতে না ঠকেন।

একটু থেমে বলল—অবশ্য এরাই বেশী ঠকেন।

কথার জবাব দিলাম না। গাড়িটা আমাদের নিয়ে বাজারের উপরের স্তরের পথটা দিয়ে চলবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি! ডাকছে নেত্যবাবু। পিছনে বিজয় মাষ্টারের দল। নেত্যবাবু দেরিতে এসে হাঁপাচ্ছে। তার আগেই গাড়িতে আমাদের দখল নিতে দেখে থামল। বিজয় মাষ্টার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশ থেকে আরো কয়েকটি বোম্বাইয়া ছেলেও এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা তাক্‌মত ট্যাক্সিটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম।

বিমলদা বলে—ভায়া তুমিই জিতেছো।

ইলা জবাব দেয়—আপাততঃ। পরে দেখা যাক।

আমি বলি—তোমার কাছে জয়ের গৌরব আমার নেই। চিরকাল তোমরাই জয়ী হও—পরাজয় মেনেই খুশী থাকবো।

হাসতে থাকে বিমলদা।

কোক্‌রস ওয়াক। খানিকটা উঠে একটা সরু পথ সুরু হয়েছে। অর্ধচন্দ্রাকারে পিকটাকে ঘুরে ওমাথায় গিয়ে আবার মিসেছে বড় রাস্তায়।

গাড়িটা আমাদের নামিয়ে চলে গেল ওমুখের দিকে। আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। নীচে ওদিকে পাহাড়ে মেঘ উঠছে, সাদা পুঞ্জ রূপালী মেঘস্তর। পাহাড়ের অতল থেকে ওরা আকাশে উঠছে, আলো ঝলমল পাহাড়গুলোয় বসতি, কফি বাগান—আর পাইনবন সেই আলোয় রঙ্গীন। সবুজ হলুদ রং-এর ঘোর লেগেছে।

—বাঃ।

বাইনাকুলারের লেন্সে ফুটে ওঠে রঙ্গীন কোন প্যানরমিক ছবির আয়তন। এ ছবি সজীব প্রাণবন্ত বর্ণময়।

সারা পথটায় আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। অখণ্ড নির্জনতার মাঝে বিশাল পাহাড় রাজ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ক'টি প্রাণী।

—অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী।

গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী, নীলম্বু রাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী, অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

ইলা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে মুখে বিস্ময় আনন্দ আতঙ্ক। বলে, মনে হয় এ যেন কোথায় এসে হারিয়ে গেছি।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে সারা শরীরে। রোদের কবোষ্ণ তাপে একটি মিঠে স্বপ্নময় আমেজ। পথের ধারে ধারে ফুল ফুটেছে, কোথায় গজিয়েছে অযত্ন বর্দ্ধিত লতানে গোলাপ, কেউ ওকে বসায়নি, আপনা থেকে এই সুন্দরের রাজ্যে সেও এসে হাজির হয়েছে।

গুণগুণ সুর ওঠে ওর মনে।

পায়ে পায়ে হেটে চলেছি। বিমলদা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এমাথায় এসে দেখি ছোট সুন্দর একটা গাছগাছালি ঘেরা বাংলোর ধারে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বাংলোগুলো এখন জনহীন, মালি বা কেয়ারটেকারই রয়েছে। ট্যাক্সিওয়ালা বলে, এ সব বাংলো ভাড়া দেওয়া হয়।

—এরকম বাংলোর ভাড়া কত?

ট্যাক্সিওয়ালা জবাব দেয়, তিন মাস এপ্রিল মে জুন-এর জন্য প্রায় পাঁচশো টাকা। এখন তো এর সিজন্।

মাঝে মাঝে কোড়ির উচ্চতা দার্জিলিং-এর চেয়েও বেশী, নাইনিতালের চেয়েও। তবু হিমালয়ের হিমরেখার কাছাকাছি নয় বলেই এখানে এ সময়ও তুষারপাত হয় না, শীত থাকলেও তেমন অসভ্য নাক ফাটানো শীত এ নয়।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছড়ানো বাংলো—ছু একটা অপিস ইত্যাদি। পথে পড়ে আমেরিকান মিশনারীদের স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকই বিদেশীও রয়েছে। তবে মনে হয় ওরা যে সব ঘর থেকে এসেছে তারা ভাবে ভারতে জন্মানোটাই ভুল হয়ে গেছে। তাই মনে প্রাণে ছেলেমেয়েদের সাহেব করে তোলার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ট্যাক্সি চলেছে পাইন-ফার-ইউক্যালিপটাস ঘেরা পথ দিয়ে। মাঝে মাঝে দু একটা ইউক্যালিপটাস গাছ চোখে পড়ে, বিরাট। তাদের গুড়িগুলোও তেমনি। তেল বের করা হয় বোধহয়। শুনলাম এখানে ওই তেলও বিক্রী হয়।

পথ নির্জন। ঘর বাড়িও কমে আসছে। পথে পড়ে কোদাই-কানাল গল্‌ফ ক্লাব।

গল্‌ফ ক্লাব দেখেছিলাম শিলংএ। দুটো পাহাড়ের সীমা দিয়ে ঘেরা বিরাট সবুজ একটা মাঠ, ওপাশে রেস কোর্স। শুনেছি এত সুন্দর গল্‌ফ লিংক্স ভারতে আর কোথাও নেই।

তার তুলনায় কোদাই গলফ মাঠ পাহাড়ের উপর খানিকটা টেবল্ ল্যাণ্ড অধিত্যকার ওপরেই বলা যায়। ধাপে ধাপে নেমে গেছে গলফ্ হোলগুলো। তবু মুক্ত উদার পরিবেশে আকাশের চাঁদোয়ার নিচে জায়গাটা সত্যই সবুজ সুন্দর।

ওপাশেই শুরু হয়েছে বন বিভাগের গাছপালা। পথের দুধারে গাছগুলো ঘন ছায়া বেষ্টনের রচনা করেছে, পথটাকে আর্টের মত ঘিরে রেখেছে। দিনের রোদ এখানে বিসর্পিল রেখায় কি অজানা কাব্য রচনা করেছে।

পথটা এসে মুক্ত পাহাড়ের শীর্ষে ঘুরে গেছে। এইখানেই গাড়ি থামল।

বাঁ পাশে ধাপে ধাপে সাজানো একটা বাগান মত, জিনিয়া-ডালিয়া-পিটুনিয়ার ফুলে জায়গাটা বর্ণময় হয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা দাঁড়াবার মত ছাতার আকারের শেড।

সমস্ত পাহাড় এতদূর এসে এইখানে যেন থেমে গেছে, ওপাশেই দেখা যায় বিচিত্র একটা দৃশ্য।

নীচে একটা বিরাট পাহাড়ের নীচে থেকে মাটির স্পর্শ মুছে গেছে। খাড়া তিন চারটে লালচে কালো গ্রানাইটের স্তর পাতাল থেকে মেঘলোক পর্যন্ত স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের শীর্ষদেশে সবুজ গাছগুলোকে তারা ধরে রেখেছে। আর ওপাশে তেমনি খাড়াপাহাড়ের গ্রানাইটের কালো গা বেয়ে নামছে চঞ্চলা একটা ঝর্ণা নীচে শূন্যলোকে তার সাদা ফেনায় আর সাত রং বাহারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—এ দৃশ্য কোথাও দেখিনি।

চমকে উঠে···ক্যামেরায় একে ধরবার চেষ্টা করছি। আলো ঝলমল চারিদিক। হঠাৎ সাদা মেঘের অন্তরালে সব ঢেকে গেল।

মেঘগুলো বহু নীচে উন্মুক্ত পাহাড়ের গায়ে এসে দল বেঁধে হানা দিয়ে জল না পেয়ে রুদ্র আক্রোশে সোনা সাদা বাষ্পের আকারে উঠছে।

ওই শিলার বুকে ঝরণায় আমরা সব ঢেকে গেলাম উন্মত্ত মেঘের রাজ্যে। ভিজে ভিজে লাগছে। ছুটে আসি ছাওার দিকে। পথ ঠাওর হয় না পিছল পথ, জুতো সমেত ফসকে গেছে, হঠাৎ একটা হাত আমার পাঞ্জাকে চেপে ধরে কাছে টেনে নেয় ওই। মেঘের কালো রাজ্যে দেখি ইলা? সেই-ই আমার হাতটা ধরেছে। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগে, একটি মুহূর্ত! দু'জনে চকিতের কোন কল্পলোকে হারিয়ে গেছি। এগিয়ে এলাম।

ওপাশে একটা ঝরণা এতক্ষণ সুর তুলে চলেছিল। ঝর-ঝর সুর! পায়ে পায়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেলাম।

গাছগাছালির ভিরে জলধারা কোন সলজ্জকুমারীর মত লুকিয়ে আছে।

দু'দিকে কালো পাতায় ঢাকা ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার শীর্ষের পাতাগুলো লাল ফলে ঢাকা।

একটা ডাল নুইয়ে পারলাম একগুচ্ছ ফুল—বাঃ! চমৎকার!

ইলাই হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নিয়ে খোঁপায় গোঁজে। ইলা চকিতকণ্ঠে বলে, ছিল প্রকৃতির বুকে, এ'ল নারীর মাথায়?

···প্রকৃতি আর নারী তুই-ই রহস্যময়ী, এই যা সান্ত্বনা! ইলা হাসতে থাকে। বলি—এই হাসছো—আবার গুম হয়ে যাবে। ওই পিলার রকের মতই।

ওই মেঘে-মেঘে আবার ঢেকে গেল, ওর সহজ সুন্দর রূপটিকে আবার সরিয়ে নিল চোখের সামনে থেকে।

ইলা চুপ করে থাকে।

পায়ের নীচে পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে চঞ্চল ঝর্ণা স্রোত বয়ে চলেছে। ইলা বলে, এখানে আমাদের মত মেয়ে বেমানান। মানায় ওই লাবণ্যের মত মেয়েদের। মনে পড়ে—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙীন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরাণে ছড়ায়, আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষায় মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য—
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত॥
নাই আমাদের কনক চাঁপার কুঞ্জ—
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলকুঞ্জ
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়
প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে শিখরে রডডেনড্রন্ গুচ্ছ"।

সবই নিছক কল্পনা মাত্র। শুধালেন ফিরতে হবে সেই কলকাতায়, জীবন সেখানে হাঁপিয়ে ওঠে পথ পাই নি শুধু পথ খুঁজেই মরি। যা করেছি এত দিন মনে হয় সবই ভুল!

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাতাসে বাতাসে ওই বাঁধনহারা জলধারার সুর। আমারও মনে হয় কথাগুলো এ জীবন এই আনন্দস্বপ্ন এ ক্ষণিকের। আবার সেই কাজ আর কাজের মধ্যে ফিরতে হবে দিনান্তে পরিশ্রমে আহরণ করতে হবে জীবিকার অন্ন। দলাদলি নীরবতার মধ্যে বাস করে তবু বাঁচার স্বপ্ন দেখতে হবে।

বলি এই জীবনের বিড়ম্বনা ইলা আমরা কেউ কার থেকে বাদ যাই না। তবু বাঁচার স্বপ্ন দেখি। চকিতের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই।

ইলা বলে, তাই মনে হয় বাঁধন পিছুটান ফেলে উধাও হয়ে যাই।

এটা সাময়িক মাত্র।

ইলা ধমকে ওঠে, থামুন দিকি, জীবনটাই চিরস্থায়ী নয়, সাময়িক মাত্র। তবে ভুলগুলো কেন চিরন্তন হতে যাবে? জীবনের এই প্রাচুর্যের মাঝে এসে মনে হয় কি পেলাম আর কি পাইনি। মনে হয় কিছুই পাইনি। তাই হাহাকার জাগে। মনের এই সার্থকাতরতার সংবাদ জানি। তাই চুপ করে রইলাম।

ইলা বলে—বাবা বিষয় আশয় কিছু রেখে গেছেন, মা ও অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় কি জানো একটা অতি বড় ভুল তারা করেছিলেন আমার জীবনে। সেই ভুলের জন্য আমি দায়ী ছিলাম না। তবে তার জন্য দুঃখ কেন পাবো?

মেঘে মেঘে আবার ঢেকে গেছে ওই মুক্ত পর্বতশ্রেণী রঙীন পাহাড়গুলো বহু নীচে পাহাড়ের কালো স্তব্ধ ঢেউগুলোও। গাছের পাতা থেকে জমা জলকণা পড়ছে টপটপ ছন্দে ওই ঝরণার জলে।

ইলা বলে চলেছে।

অনেক ভেবেছি। কিন্তু পথ পাইনি। মানুষের মত মানুষের দাবী নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমার নেই?

তীর্থে বের হয়েছিলাম। মা ও মত দিয়েছিল। কিন্তু মানুষের গড়া দেবতার সান্নিধ্যে শান্তি পাইনি। প্রকৃতির অসীম সান্নিধ্য এসে

দেখলাম আমার মনের সেই অতল শূণ্যতা ওই উপত্যকার মতই কান্নাভরা আলোকটুকু ওখানে মিথ্যা স্বপ্ন।

বিমলদার গলা শোনা যায়। সে আবৃত্তি করে চলেছে উপনিষদের একটা ছত্র।

পশ্য দেবস্য কাব্যম্
ন মমার না জীর্যতি।

দেখ ভায়া ভগবানের রচিত কাব্য দেখ; সবুজ প্রাণময় বর্ণময় অসীম, এ ছবি কোনদিন তুলিতে কলমে আঁকতে পারবে ভায়া?

মনে হয় প্রকৃতির এই রহস্যময়তাই মানুষের জীবনকেও বর্ণময়-রহস্যময় করে তুলেছে। তাকে ফোটানো অতি কঠিন কাজ।

চুপ করে এসে গাড়িতে উঠলাম।

ট্যাক্সিওয়ালাই বলে, বেলা পড়ে আসছে। ডলফিন নোজ যাওয়া এখন ঠিক হবে না, বন মেঘ আছেই পথও ভালো নয়। আজ এদিক ঘুরে, কাল সকালে ওখানে যাওয়া ভালো। তখন এত মেঘ থাকবে না, তাছাড়া ডলফিন নোজ যেতে গেলে হাটতে হবে খানিকটা, প্রায় আট হাজার ফিটেরও বেশী ওর উচ্চতা।

ইলাই সায় দেয় তাই ভালো।

ছায়া কুঞ্জ পার হয়ে একটু দূরে এসে গাড়ি থামল। পাশে দুএকটা বসতি। কফির ক্ষেতে মাথা তুলেছে বেগুনী রং-এর বাঁধাকপি আর গোলাপ ফুলের গাছ।

নেমে একটু এগিয়ে চড়াই এ উঠতেই বোর্ড নজরে পড়ল। —Beware Dangerous fall.

একটা সাদা পাথরের প্রাচীর মত তোলা রয়েছে। এদেশের লোক ওকে বলে সুইট নাইন্‌স্‌।

সামনেই পাহাড়সীমা শেষ হয়ে গেছে, সোজা অতলে নেমেছে ওই খদ।...নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। বোধহয় তিন হাজার

ফিট সোজা নেমেছে পাহাড়টা। বহু নীচে দেখা যায় পাইন বন—মেঘে মেঘে ঢাকা। ওই নীচে ওদের মাথায় মেঘের দল জমেছে।

সামনে সেই খাদের নীচে উপত্যকা পালানি রেঞ্জের ছোট বড় পাহাড়গুলো সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউ-এর মত এসে ওর পায়ে ঠেকেছে। চলন্ত একটা সমুদ্র কার ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে মেঘলোকের অতলে হারিয়ে গেছে।

আমরা শিখর দেশে দাঁড়িয়ে আছি।

···নির্জন স্তব্ধ শান্তিময় একটি রাজ্য। পিছনে পাইন বন। তার্পিন গাছে কোথায় সাদা ফুল ফুটেছে। ওদের উগ্র সুবাসে বাতাস ভরপুর।

এখান থেকে বাইনাকুলারে দেখা যায় দূরে পাহাড়ের চূড়ায় মান মন্দিরের টাওয়ার গুলো।

পড়ন্ত···আলোয় সাদা বাড়িগুলো রঙীন হয়ে উঠেছে।

···মুক্ত আকাশসীমায় পাহাড় রণরাজ্যে আমরা দাঁড়িয়ে। পুলকের কণ্ঠে তাই সুর জাগে।

—আকাশভরা সূর্যতারা,

বিশ্বভরা প্রাণ—

ইলা আজ নিজেকে যেন কি সুরে ভুলে গেছে। পুলকের সঙ্গে গলা উসকিয়ে সেও সুর তোলে।

—অসীম প্রাণের যে হিল্লোলে

জোয়ার ভাটায় হৃদয় দোলে—

এবার আবার লোকালয়ের দিকে ফেরার পালা। ···গাড়িটা এগিয়ে আসছে, ডানহাতে পড়ে রইল লেক, অনেক নীচে পাইন গাছের মাথার উপর দিয়ে দেখা যায় সবুজ তরু বেষ্টনীর মাঝে সেই জলধারা-টুকুকে।

আমরা পাহাড়ের পথ ধরে উপরের দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে

দেখা যায় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সাজানো বাংলো, একটা দেখলাম বেশ বড় আর তেমনি মনোরম।

ট্যাক্সিড্রাইভার জানায়, ছাটস্ জেমিনি বাংলোর!

মাদ্রাজের প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক জেমিনিদের ওই বাংলো। আরও উপরে চলেছে।...পথে-ঘাটে বন-বিভাগের দু'একটা ছোট অফিস।

...একটা জিপ পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। বন-বিভাগের জিপ্! নামলাম।

এইখানে দেখা হ'ল একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে। মিঃ ঘোষ দীর্ঘদিন সরকারী কাজে হিমালয় অঞ্চলে ঘুরছেন।

বর্তমানে এইখানেই আছেন। বলেন, জায়গাটায় মন বসে। ইচ্ছে আছে রিটায়ার করে এইখানেই থেকে যাবো। শান্ত একটি দেশ। তাছাড়া পাহাড়ের ওদিকে জমিজমা ত কিছু করেছি। ফল পাকড় কিছু হবে—চেষ্টা করলে ধানও জন্মাবে। আর একজন বাঙ্গালী আছেন অবজারভেটরীর ইনচার্জ। ডক্টর ভট্টাচার্য। তিনিও চেষ্টা করছেন এইখানে থাকবার জন্য।

মিঃ ঘোষের কথাগুলো ভালো লাগলো। তিনি বলেন, আজ বাঙ্গালীর উচিত, বাইরে যে যেখানে ঠাঁই পায় থেকে যাক। তাতে নিজেরাও বাঁচবো—বাংলা দেশও বাঁচবে।

আজ কাজে বের হচ্ছেন। আমন্ত্রন জানান, কাল আসুন এদিকে আলোচনা হবে।

পথটা এবার সোজা!

মানমন্দিরের উচ্চতা হচ্ছে সাত হাজার আটশো ফিটেরও বেশী। এইটিই কোদাই এবং উচ্চতম স্থান। সেখানে গাড়ীতে ওঠা যায়। তাও বেশ খানিকটা নীচে বোর্ড দেওয়া। গাড়ি এখানেই ছেড়ে রাখতে হবে। মানমন্দিরের সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতি আছে গাড়ির স্পন্দনে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এখানের পিছন দিকে গভীর বন। বিশাল পাইন গাছগুলোর

গুড়িও তেমনি বিরাট। আট—শ ফুট পরিধি হবে উচ্চতায় প্রায় দেড়শ ফুট। সোজা উপরে মাথা তুলেছে তারা।

বিমলদা বলে, ১৮৯৯ খৃঃ এই মানমন্দির তৈরী হয়। পথ বেশ খাড়া, তাছাড়া উচ্চতার জন্যে মাথা ঝিমঝিম করে। কানে তালাও লাগে মাঝে মাঝে। একটু হাঁটলেই ক্লান্তি আসে।

বনের মাঝে অবজারভেটরীর কোয়াটারগুলো। পর্বতের শীর্ষে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মানমন্দির। বাগানে নানা ফুলের রাজ্য।

এখান থেকে দেখা যায় কোদাই-এর সবটাই সামনের মাঠে একটা রাডার বসানো। মানমন্দিরে টেলিস্কোপ এর টাওয়ারগুলোয় রোদের আভা পড়েছে, চিক্‌চিক্‌ করছে।

একজন কর্মচারীই ওসব দেখালেন।

ছটা টেলিস্কোপ্‌ আছে, এইখানের টেলিস্কোপ্‌ ছিল ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখন মুসৌরীতে নাকি বড় টেলিস্কোপ্‌ বসানো হয়েছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য তখন ছিলেন না। ইনিই অবাক কথা জানালেন। প্রশ্ন করি।

—ভূমিকম্প হয় না এখানে ?

ভদ্রলোক হাসেন—হয়। তবে আমরা সলিড রকের উপর আছি। সে সব কোন ভয় বিশেষ নেই। সাধারণ কাজকর্ম ছাড়া এখানের বিশেষ কাজকর্ম সবই গবেষণামূলক, তিনি জানান।

—গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণাও চলে, বিশেষ কাজ হয় সোলার সিস্টেম নিয়ে।

তারা আশা করেন ভারতের গবেষণার ক্ষেত্রে কোদাইকানাল মানমন্দিরের কায একটি বিশিষ্ট ধারায় চলেছে যার মূল্য অনেক।

দু'একটা টেলিস্কোপ টাওয়ারের মাথার আবরণ খুলে গেছে—তারই শীর্ষ দিয়ে দেখা যায় টেলিস্কোপের সন্ধানী দৃষ্টিপথ।

তারাকিনী রাতের অন্ধকারে ওরা সজাগ হয়ে ওঠে। অদূরে কোন

মহাজগতের সন্ধানে সে জগত এ পৃথিবী থেকে অনেক অনেক ঊর্দ্ধে নীহারিকার রাজ্যে।

বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে। পাখীগুলো ডাকছে। অনেক নীচে লেকের কাছে এসে পড়েছি আমরা চারিদিকে শুধু পাহাড় বন আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাংলো—তারই পরিবেশে এই প্রাকৃতিক লেকটি মনোরম।

একটা ছোট নদীকে বাঁধ দিয়ে এই লেকের সৃষ্টি। এঁকে বেঁকে জমেছে জলধারা। চারিদিকের ওই বঙ্কিম বেষ্টনী আর গাছ গাছালির নীচে দিয়ে চলেছে রাস্তাটা।

মাঝে মাঝে দু একটা বোটও দেখা যায়।

লেকের ধারে ফুলের সমারোহ; ক্যানা জিরানিয়া বোগেনভিলা কোথাও ডালিয়া ফুলের বেড।

স্যার ভেরে লেপ্তে এই লেকের পরিকল্পনা করেছিলেন। চারিদিকের রাস্তা প্রায় তিন মাইল।

বোট ক্লাবের ওদিকেই ছায়া নির্জনে দেখলাম হোটেল কার্লটন। কোদাই-এর নাম করা হোটেল। এখন প্রায় শূন্য। সেই আনন্দমুখর পরিবেশ এখন নেই।

লেকের জলে বোটে দেখি বিশু মল্লিক আর কে একজন মেয়ে মলিনাই বোধহয়। ওদের গানের সুর শোনা যায়। ওপাশে বশে আছে সরখেলমশাই আর সস্ত্রীক নেত্যবাবু। আমাদের দেখে একবার চেয়েই গম্ভীর হয়ে গেল।

বুড়ি দুই ঠোঁট বুজে বকের মত বসে আছে।

—খুব ঘুরছেন এ্যাঁ।

বিমলদা বলে, এলাম ঘুরে।

ওদিককার একটা গাছের নীচে ওয়াটারপ্রুফ পেতে বসেছে বিজয়মাষ্টার, হাতে একটা নোটবই। ওটা মাঝে মাঝে বের করে কি লেখে। আজও লিখছে। মুখ থমথমে।

ইলা বলে—মাঝে মাঝে উনি গানও রচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সেইসব গানও গাইতে হয়।

বিমলদা জিজ্ঞাসা করে।

—তাহলে বিজয়মাষ্টার আসলে কি? নাট্যকার-কবি-গীতিকার-সুরকার-নৃত্যকার—ইলা যোগান দেয় মোটরকার অবধি।

বলি—গুরু নিন্দা মহাপাপ।

—গুরু। ইলা একটু যেন চটেই ওঠে।

পুলক বলে—একটু চায়ের দরকার দাদা, খিদেও পেয়েছে। কাছেই বাজার। ওইদিকেই যাচ্ছি।

রেষ্ট হাউসের পাশ দিয়ে ওপারের রাস্তাটা ধরে বাজারে গিয়ে নামলাম, তখন কোদাইকানালে সন্ধ্যা নামছে। আলোগুলো জ্বলছে। ফিকে কুয়াশার আবরণে নেমেছে কনকনে শীতের আমেজ। এ শীত চামড়া নয় একেবারে হাড়ে গিয়ে বেঁধে, কনকনিয়ে দেয়।

সূর্য যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ বেশ লাগছিল।

গরম জামাকাপড়ের বিশেষ দরকারও ছিল না। একটা সোয়েটার জহরকোটেই যথেষ্ট। শীতকালের কলকাতার মতই একটু কন্-কনানি ঠাণ্ডা, কিন্তু সূর্যের আলো নিভে যেতেই শীতের সৈন্যদল যেন পাহাড় তল থেকে দল বেঁধে উঠে ধারাল নখ দন্ত বের করে আক্রমণ শুরু করেছে।

পায়জামা ফুলস্লিভ গেঞ্জি সোয়েটার কোট তদুপরি ওভার কোট হাতে দস্তানা মাথায় হনুমান টুপি, নিদেন জবরদস্ত মাফ্‌লার পায়ে মোজা; বেশ জবরজং অবস্থাতেই বাজারে বের হলাম।

পথ এমনিতেই জনহীন। কালো কালো পুরানো গাছগুলো অন্ধকার। রাস্তার আলোও যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। বাজারে তখনও কিছু লোক রয়েছে।

ফলের দোকানেই বেশী বাহার।

কেসাবি কলা, আনারস, আম, কমলালেবু মুসাম্বি তো আছে, আছে আপেল আর কমলালেবু।

দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেয়াডি আপেল?

আপেল গাছ এখানে বিশেষ নেই, হয় না। ওসব সিমলা কুলুভ্যালির আপেল। কিছু আমেরিকান আছেন। তারাই এর বাঁধা খদ্দের।

এ ছাড়া বিরাট আকারের নোনা আতাও দেখলাম। তবে চলতি ভাষাতেই সামিল। দোকানদার বলে।

পেরিক্কায় অনন্নাসিপ্পলম, বালয়পরালন্ দিবাক্সাপ্পলম্, পলাপ পপ্লম্; অর্থাৎ ওদেশী একরকম নাশপাতি, আনারস, কলা আঙ্গুর আর কাঁঠালও রয়েছে।

বিরাট কাঁঠাল—মিষ্টি সুগন্ধ বের হয়। দাম দু টাকা বললে।

—ওটা কি?—ওইগুলো?

দেখতে ছোট্ট বেগুনের মত, তবে কাঁটা নেই। টুকটুকে লালচে রং।

দোকানদার ইলার কথায় জবাব দেয়।

—ট্রি ট্যামোটো। কাঁচাও খাওয়া যায়, কি কষা স্বাদ, তবে ভালো চাটনী হয়। আর কোডি গ্রেপসা দু রূপিয়া কিলো।

চায়ের দোকানেই বসলাম কিছু ফল কিনে নিয়ে। চা পনেরো পয়সা, কফি কুড়ি পয়সা। তবে দেখলাম দুধ বেশীই দেয়। দুধটা এরা খায়। আর আছে লার্ডে অর্থাৎ চর্বি দিয়ে ভাজা কাটলেটও মেলে।

এখানে মাংসের ব্যাপারে যেন কড়াকড়ি একটু শিথীল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা মাংস খায় না। বাকী যারা যায় তারা বোধ হয় মাংসের সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী নয়।

বাজারে বিফ্ বেশী চলে। তাই ফাউল ছাড়া অন্য মাংস খাওয়া

হয়তো ঠিক হবে না, ঠকবার সম্ভাবনা। তাই ফাউল কারিই বানাতে বললাম।

ফাউল আর গরম ভাত।

বেশী ঝালে এই ঠাণ্ডায় মন্দ লাগল না। খেয়ে দেয়ে যখন বের হলাম বাজার তখন বন্ধ হবো হবো করছে।

আশপাশের রকে বিরাট পথের কুকুরগুলো শোবার ঠাঁই খুঁজছে। পথের কুকুর, কোন মালিকানা নেই। তবে তার মধ্যেও বেশ কুলীনত্ব আছে। যেমন বিশাল দেখতে তেমনি বড় বড় লোমে ঢাকা তারা।

রাস্তায় কুটোকটা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অনেকে আগুন পোয়াচ্ছে। কোডিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে, নেমেছে রাত্রির স্তব্ধতা।

দু'একটা তারা ঊর্দ্ধাকাশে স্থির উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্বলছে। মনে হয় আকাশ বেয়ে নামছে হিমধারা। জোছনার আলোটুকু এইবার জমাট হিমানী প্রবাহে পরিণত হবে।

সামনেই বিজয় মাষ্টারকে দেখে আসলাম।

—আপনি!

বিজয়বাবু মাথায় একটা হনুমান টুপি চড়িয়েছে—সর্বাঙ্গ ঢেকেছে কালো একটা র‍্যাপারে। চেনা যায় না। আমাকে দেখে বলে।

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল মশায়?

ওরা এগিয়ে গেছে।

—বলুন।

বিজয়মাষ্টার বলে—আপনাদের ওখানে রাত কাটাবার মত একটু জায়গা দিন।

—কেন? আপনার হোটেলে?

—ওখানে থাকবো না। আমি মশাই সোজা কথার মানুষ।

একটা ডাল নুইয়ে পারলাম একগুচ্ছ ফুল—বাঃ। চমৎকার!

ইলাই হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো নিয়ে খোঁপায় গোঁজে। ইলা চকিতকণ্ঠে বলে, ছিল প্রকৃতির বুকে, এ'ল নারীর মাথায়?

…প্রকৃতি আর নারী দুই-ই রহস্যময়ী, এই যা সান্ত্বনা! ইলা হাসতে থাকে। বলি—এই হাসছো—আবার গুম হয়ে যাবে। ওই পিলার রকের মতই।

ওই মেঘে-মেঘে আবার ঢেকে গেল, ওর সহজ সুন্দর রূপটিকে আবার সরিয়ে নিল চোখের সামনে থেকে।

ইলা চুপ করে থাকে।

পায়ের নীচে পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে চঞ্চল ঝর্ণা স্রোত বয়ে চলেছে। ইলা বলে, এখানে আমাদের মত মেয়ে বেমানান। মানায় ওই লাবণ্যের মত মেয়েদের। মনে পড়ে—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙীন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরাণে ছড়ায়, আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষায় মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য—
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত॥
নাই আমাদের কনক চাঁপার কুঞ্জ—
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলকুঞ্জ
হঠাৎ কখন সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়
প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে শিখরে রডডেনড্রন্ গুচ্ছ"।

সবই নিছক কল্পনা মাত্র। শুধালেন ফিরতে হবে সেই কলকাতায়, জীবন সেখানে হাঁপিয়ে ওঠে পথ পাই নি শুধু পথ খুঁজেই মরি। যা করেছি এত দিন মনে হয় সবই ভুল!

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাতাসে বাতাসে ওই বাঁধনহারা জলধারার সুর। আমারও মনে হয় কথাগুলো এ জীবন এই আনন্দস্বপ্ন এ ক্ষণিকের। আবার সেই কাজ আর কাজের মধ্যে ফিরতে হবে দিনান্তে পরিশ্রমে আহরণ করতে হবে জীবিকার অন্ন। দলাদলি নীরবতার মধ্যে বাস করে তবু বাঁচার স্বপ্ন দেখতে হবে।

বলি এই জীবনের বিড়ম্বনা ইলা আমরা কেউ কার থেকে বাদ যাই না। তবু বাঁচার স্বপ্ন দেখি। চকিতের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই।

ইলা বলে, তাই মনে হয় বাঁধন পিছুটান ফেলে উধাও হয়ে যাই।

এটা সাময়িক মাত্র।

ইলা ধমকে ওঠে, থামুন দিকি, জীবনটাই চিরস্থায়ী নয়, সাময়িক মাত্র। তবে ভুলগুলো কেন চিরন্তন হতে যাবে? জীবনের এই প্রাচুর্যের মাঝে এসে মনে হয় কি পেলাম আর কি পাইনি। মনে হয় কিছুই পাইনি। তাই হাহাকার জাগে। মনের এই সার্থকাতরতার সংবাদ জানি। তাই চুপ করে রইলাম।

ইলা বলে—বাবা বিষয় আশয় কিছু রেখে গেছেন, মা ও অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় কি জানো একটা অতি বড় ভুল তারা করেছিলেন আমার জীবনে। সেই ভুলের জন্য আমি দায়ী ছিলাম না। তবে তার জন্য দুঃখ কেন পাবো?

মেঘে মেঘে আবার ঢেকে গেছে ওই মুক্ত পর্বতশ্রেণী রঙীন পাহাড়গুলো বহু নীচে পাহাড়ের কালো স্তব্ধ ঢেউগুলোও। গাছের পাতা থেকে জমা জলকণা পড়ছে টপটপ ছন্দে ওই ঝরণার জলে।

ইলা বলে চলেছে।

অনেক ভেবেছি। কিন্তু পথ পাইনি। মানুষের মত মানুষের দাবী নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমার নেই?

তীর্থে বের হয়েছিলাম। মা ও মত দিয়েছিল। কিন্তু মানুষের গড়া দেবতার সান্নিধ্যে শান্তি পাইনি। প্রকৃতির অসীম সান্নিধ্য এসে

দেখলাম আমার মনের সেই অতল শূণ্যতা ওই উপত্যকার মতই কান্নাভরা আলোকটুকু ওখানে মিথ্যা স্বপ্ন।

বিমলদার গলা শোনা যায়। সে আবৃত্তি করে চলেছে উপনিষদের একটা ছত্র।

পশ্য দেবস্য কাব্যম্
ন মমার না জীর্যতি।

দেখ ভায়া ভগবানের রচিত কাব্য দেখ; সবুজ প্রাণময় বর্ণময় অসীম, এ ছবি কোনদিন তুলিতে কলমে আঁকতে পারবে ভায়া?

মনে হয় প্রকৃতির এই রহস্যময়তাই মানুষের জীবনকেও বর্ণময়-রহস্যময় করে তুলেছে। তাকে ফোটানো অতি কঠিন কাজ।

চুপ করে এসে গাড়িতে উঠলাম।

ট্যাক্সিওয়ালাই বলে, বেলা পড়ে আসছে। ডলফিন নোজ যাওয়া এখন ঠিক হবে না, বন মেঘ আছেই পথও ভালো নয়। আজ এদিক ঘুরে, কাল সকালে ওখানে যাওয়া ভালো। তখন এত মেঘ থাকবে না, তাছাড়া ডলফিন নোজ যেতে গেলে হাটতে হবে খানিকটা, প্রায় আট হাজার ফিটেরও বেশী ওর উচ্চতা।

ইলাই সায় দেয় তাই ভালো।

ছায়া কুঞ্জ পার হয়ে একটু দূরে এসে গাড়ি থামল। পাশে দুএকটা বসতি। কফির ক্ষেতে মাথা তুলেছে বেগুনী রং-এর বাঁধাকপি আর গোলাপ ফুলের গাছ।

নেমে একটু এগিয়ে চড়াই এ উঠতেই বোর্ড নজরে পড়ল। —Beware Dangerous fall.

একটা সাদা পাথরের প্রাচীর মত তোলা রয়েছে। এদেশেও লোক ওকে বলে সুইট নাইন্‌স্।

সামনেই পাহাড়সীমা শেষ হয়ে গেছে, সোজা অতলে নেমেছে ওই খাদ।...নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। বোধহয় তিন হাজার

ফিট সোজা নেমেছে পাহাড়টা। বহু নীচে দেখা যায় পাইন বন—মেঘে মেঘে ঢাকা। ওই নীচে ওদের মাথায় মেঘের দল জমেছে।

সামনে সেই খাদের নীচে উপত্যকা পালানি রেঞ্জের ছোট বড় পাহাড়গুলো সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউ-এর মত এসে ওর পায়ে ঠেকেছে। চলন্ত একটা সমুদ্র কার ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে মেঘলোকের অতলে হারিয়ে গেছে।

আমরা শিখর দেশে দাঁড়িয়ে আছি।

…নির্জন স্তব্ধ শান্তিময় একটি রাজ্য। পিছনে পাইন বন। তার্পিন গাছে কোথায় সাদা ফুল ফুটেছে। ওদের উগ্র সুবাসে বাতাস ভরপুর।

এখান থোক বাইনাকুলারে দেখা যায় দূরে পাহাড়ের চূড়ায় মান মন্দিরের টাওয়ার গুলো।

পড়ন্ত…আলোয় সাদা বাড়িগুলো রঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

…মুক্ত আকাশসীমায় পাহাড় রণরাজ্যে আমরা দাঁড়িয়ে। পুলকের কণ্ঠে তাই সুর জাগে।

—আকাশভরা সূর্যতারা,

বিশ্বভরা প্রাণ—

ইলা আজ নিজেকে যেন কি সুরে ভুলে গেছে। পুলকের সঙ্গে গলা উসকিয়ে সেও সুর তোলে।

—অসীম প্রাণের যে হিল্লোলে

জোয়ার ভাটায় হৃদয় দোলে—

এবার আবার লোকালয়ের দিকে ফেরার পালা। …গাড়িটা এগিয়ে আসছে, ডানহাতে পড়ে রইল লেক, অনেক নীচে পাইন গাছের মাথার উপর দিয়ে দেখা যায় সবুজ তরু বেষ্টনীর মাঝে সেই জলধারা-টুকুকে।

আমরা পাহাড়ের পথ ধরে উপরের দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে

দেখা যায় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সাজানো বাংলো, একটা দেখলাম বেশ বড় আর তেমনি মনোরম।

ট্যাক্সিড্রাইভার জানায়, ছাটস্ জেমিনি বাংলোর!

মাদ্রাজের প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক জেমিনিদের ওই বাংলো। আরও উপরে চলেছে।...পথে-ঘাটে বন-বিভাগের দু'একটা ছোট অফিস।

...একটা জিপ পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। বন-বিভাগের জিপ্! নামলাম।

এইখানে দেখা হ'ল একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে। মিঃ ঘোষ দীর্ঘদিন সরকারী কাজে হিমালয় অঞ্চলে ঘুরছেন।

বর্তমানে এইখানেই আছেন। বলেন, জায়গাটায় মন বসে। ইচ্ছে আছে রিটায়ার করে এইখানেই থেকে যাবো। শান্ত একটি দেশ। তাছাড়া পাহাড়ের ওদিকে জমিজমা ত কিছু করেছি। ফল পাকড় কিছু হবে—চেষ্টা করলে ধানও জন্মাবে। আর একজন বাঙ্গালী আছেন অবজারভেটরীর ইনচার্জ। ডক্টর ভট্টাচার্য। তিনিও চেষ্টা করছেন এইখানে থাকবার জন্য।

মিঃ ঘোষের কথাগুলো ভালো লাগলো। তিনি বলেন, আজ বাঙ্গালীর উচিত্, বাইরে যে যেখানে ঠাঁই পায় থেকে যাক। তাতে নিজেরাও বাঁচবো—বাংলা দেশও বাঁচবে।

আজ কাজে বের হচ্ছেন। আমন্ত্রন জানান, কাল আসুন এদিকে আলোচনা হবে।

পথটা এবার সোজা!

মানমন্দিরের উচ্চতা হচ্ছে সাত হাজার আটশো ফিটেরও বেশী। এইটিই কোদাই এর উচ্চতম স্থান। সেখানে গাড়ীতে ওঠা যায়। তাও বেশ খানিকটা নীচে বোর্ড দেওয়া। গাড়ি এখানেই ছেড়ে রাখতে হবে। মানমন্দিরের সূক্ষতম যন্ত্রপাতি আছে গাড়ির স্পন্দনে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

এখানের পিছন দিকে গভীর বন। বিশাল পাইন গাছগুলোর

গুড়িও তেমনি বিরাট। আট— শ ফুট পরিধি হবে উচ্চতায় প্রায় দেড়শ ফুট। সোজা উপরে মাথা তুলেছে তারা।

বিমলদা বলে, ১৮৯৯ খৃঃ এই মানমন্দির তৈরী হয়। পথ বেশ খাড়া, তাছাড়া উচ্চতার জন্যে মাথা ঝিমঝিম করে। কানে তালাও লাগে মাঝে মাঝে। একটু হাঁটলেই ক্লান্তি আসে।

বনের মাঝে অবজারভেটরীর কোয়াটারগুলো। পর্বতের শীর্ষে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মানমন্দির। বাগানে নানা ফুলের রাজ্য।

এখান থেকে দেখা যায় কোদাই-এর সবটাই সামনের মাঠে একটা রাডার বসানো। মানমন্দিরে টেলিস্কোপ এর টাওয়ারগুলোয় রোদের আভা পড়েছে, চিক্‌চিক্ করছে।

একজন কর্মচারীই ওসব দেখালেন।

ছটা টেলিস্কোপ্ আছে, এইখানের টেলিস্কোপ্ ছিল ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখন মুসৌরীতে নাকি বড় টেলিসকোপ্ বসানো হয়েছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য তখন ছিলেন না। ইনিই অবাক কথা জানালেন। প্রশ্ন করি।

—ভূমিকম্প হয় না এখানে?

ভদ্রলোক হাসেন—হয়। তবে আমরা সলিড রকের উপর আছি। সে সব কোন ভয় বিশেষ নেই। সাধারণ কাজকর্ম ছাড়া এখানের বিশেষ কাজকর্ম সবই গবেষণামূলক, তিনি জানান।

—গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণাও চলে, বিশেষ কাজ হয় সোলার সিস্টেম নিয়ে।

তারা আশা করেন ভারতের গবেষণার ক্ষেত্রে কোদাইকানাল মানমন্দিরের কায একটি বিশিষ্ট ধারায় চলেছে যার মূল্য অনেক।

একটা টেলিস্কোপ টাওয়ারের মাথার আবরণ খুলে গেছে— তারই শীর্ষ দিয়ে দেখা যায় টেলিস্কোপের সন্ধানী দৃষ্টিপথ।

তারাকিনী রাতের অন্ধকারে ওরা সজাগ হয়ে ওঠে। অনন্ত কোন

মহাজগতের সন্ধানে সে জগত এ পৃথিবী থেকে অনেক অনেক উর্দ্ধে নীহারিকার রাজ্যে।

বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে। পাখীগুলো ডাকছে। অনেক নীচে লেকের কাছে এসে পড়েছি আমরা চারিদিকে শুধু পাহাড় বন আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাংলো—তারই পরিবেশে এই প্রাকৃতিক লেকটি মনোরম।

একটা ছোট নদীকে বাঁধ দিয়ে এই লেকের সৃষ্টি। এঁকে বেঁকে জমেছে জলধারা। চারিদিকের ওই বঙ্কিম বেষ্টিনী আর গাছ গাছালির নীচে দিয়ে চলেছে রাস্তাটা।

মাঝে মাঝে দু একটা বোটও দেখা যায়।

লেকের ধারে ফুলের সমারোহ; ক্যানা জিরানিয়া বোগেনভিলা কোথাও ডালিয়া ফুলের বেড।

স্যার ভেরে লেপ্তে এই লেকের পরিকল্পনা করেছিলেন। চারি-দিকের রাস্তা প্রায় তিন মাইল।

বোট ক্লাবের ওদিকেই ছায়া নির্জনে দেখলাম হোটেল কার্লটন। কোদাই-এর নাম করা হোটেল। এখন প্রায় শূন্য। সেই আনন্দ-মুখর পরিবেশ এখন নেই।

লেকের জলে বোটে দেখি বিশু মল্লিক আর কে একজন মেয়ে মলিনাই বোধহয়। ওদের গানের সুর শোনা যায়। ওপাশে বশে আছে সরখেলমশাই আর সস্ত্রীক নেত্যবাবু। আমাদের দেখে একবার চেয়েই গম্ভীর হয়ে গেল।

বুড়ি দুই ঠোঁট বুজে বকের মত বসে আছে।

—খুব ঘুরছেন এ্যাঁ!

বিমলদা বলে, এলাম ঘুরে।

ওদিককার একটা গাছের নীচে ওয়াটারপ্রুফ পেতে বসেছে বিজয়-মাষ্টার, হাতে একটা নোটবই। ওটা মাঝে মাঝে বের করে কি লেখে। আজও লিখছে। মুখ থমথমে।

ইলা বলে—মাঝে মাঝে উনি গানও রচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সেইসব গানও গাইতে হয়।

বিমলদা জিজ্ঞাসা করে।

—তাহলে বিজয়মাষ্টার আসলে কি? নাট্যকার-কবি-গীতিকার-সুরকার-নৃত্যকার—ইলা যোগান দেয় মোটরকার অবধি।

বলি—গুরু নিন্দা মহাপাপ।

—গুরু। ইলা একটু যেন চটেই ওঠে।

পুলক বলে—একটু চায়ের দরকার দাদা, খিদেও পেয়েছে। কাছেই বাজার। ওইদিকেই যাচ্ছি।

রেষ্ট হাউসের পাশ দিয়ে ওপারের রাস্তাটা ধরে বাজারে গিয়ে নামলাম, তখন কোদাইকানালে সন্ধ্যা নামছে। আলোগুলো জ্বলছে। ফিকে কুয়াশার আবরণে নেমেছে কনকনে শীতের আমেজ। এ শীত চামড়া নয় একেবারে হাড়ে গিয়ে বেঁধে, কনকনিয়ে দেয়।

সূর্য যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ বেশ লাগছিল।

গরম জামাকাপড়ের বিশেষ দরকারও ছিল না। একটা সোয়েটার জহরকোটেই যথেষ্ট। শীতকালের কলকাতার মতই একটু কন্-কনানি ঠাণ্ডা, কিন্তু সূর্যের আলো নিভে যেতেই শীতের সৈন্যদল যেন পাহাড় তল থেকে দল বেঁধে উঠে ধারাল নখ দন্ত বের করে আক্রমণ শুরু করেছে।

পায়জামা ফুলস্লিভ গেঞ্জি সোয়েটার কোট তদুপরি ওভার কোট হাতে দস্তানা মাথায় হনুমান টুপি, নিদেন জবরদস্ত মাফলার পায়ে মোজা; বেশ জবরজং অবস্থাতেই বাজারে বের হলাম।

পথ এমনিতেই জনহীন। কালো কালো পুরানো গাছগুলো অন্ধকার। রাস্তার আলোও যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। বাজারে তখনও কিছু লোক রয়েছে।

ফলের দোকানেই বেশী বাহার।

কেসাবি কলা, আনারস, আম, কমলালেবু মুসাম্বি তো আছে, আছে আপেল আর কমলালেবু।

দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেয়াডি আপেল?

আপেল গাছ এখানে বিশেষ নেই, হয় না। ওসব সিমলা কুলুভ্যালির আপেল। কিছু আমেরিকান আছেন। তারাই এর বাঁধা খদ্দের।

এ ছাড়া বিরাট আকারের নোনা আতাও দেখলাম। তবে চলতি ভাষাতেই সামিল। দোকানদার বলে।

পেরিক্কায় অনলাসিপ্‌পলম, বালরৈপরালন্ দিবাক্সাপ্‌পলম্, পলাপ পপ্‌লম্; অর্থাৎ ওদেশী একরকম নাশপাতি, আনারস, কলা আঙ্গুর আর কাঁঠালও রয়েছে।

বিরাট কাঁঠাল—মিষ্টি সুগন্ধ বের হয়। দাম দু টাকা বললে।

—ওটা কি?—ওইগুলো?

দেখতে ছোট্ট বেগুনের মত, তবে কাঁটা নেই। টুকটুকে লালচে রং।

দোকানদার ইলার কথায় জবাব দেয়।

—ট্রি ট্যামোটো। কাঁচাও খাওয়া যায়, কি কষা স্বাদ, তবে ভালো চাটনী হয়। আর কোডি গ্রেপসা দু রূপিয়া কিলো।

চায়ের দোকানেই বসলাম কিছু ফল কিনে নিয়ে। চা পনেরো পয়সা, কফি কুড়ি পয়সা। তবে দেখলাম দুধ বেশীই দেয়। দুধটা এরা খায়। আর আছে লার্ডে অর্থাৎ চর্বি দিয়ে ভাজা কাটলেটও মেলে।

এখানে মাংসের ব্যাপারে যেন কড়াকড়ি একটু শিথীল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা মাংস খায় না। বাকী যারা যায় তারা বোধ হয় মাংসের সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী নয়।

বাজারে বিফ্ বেশী চলে। তাই ফাউল ছাড়া অন্য মাংস খাওয়া

হয়তো ঠিক হবে না, ঠকবার সম্ভাবনা। তাই ফাউল কারিই বানাতে বললাম।

ফাউল আর গরম ভাত।

বেশী ঝালে এই ঠাণ্ডায় মন্দ লাগল না। খেয়ে দেয়ে যখন বের হলাম বাজার তখন বন্ধ হবো হবো করছে।

আশপাশের রকে বিরাট পথের কুকুরগুলো শোবার ঠাঁই খুঁজছে। পথের কুকুর, কোন মালিকানা নেই। তবে তার মধ্যেও বেশ কুলীনত্ব আছে। যেমন বিশাল দেখতে তেমনি বড় বড় লোমে ঢাকা তারা।

রাস্তায় কুটোকটা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অনেকে আগুন পোয়াচ্ছে। কোডিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে, নেমেছে রাত্রির স্তব্ধতা।

ছ'একটা তারা উর্দ্ধাকাশে স্থির উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্বলছে। মনে হয় আকাশ বেয়ে নামছে হিমধারা। জোছনার আলোটুকু এইবার জমাট হিমানী প্রবাহে পরিণত হবে।

সামনেই বিজয় মাষ্টারকে দেখে আসলাম।

—আপনি!

বিজয়বাবু মাথায় একটা হনুমান টুপি চড়িয়েছে—সর্বাঙ্গ ঢেকেছে কালো একটা র‍্যাপারে। চেনা যায় না। আমাকে দেখে বলে।

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল মশায়?

ওরা এগিয়ে গেছে।

—বলুন।

বিজয়মাষ্টার বলে—আপনাদের ওখানে রাত কাটাবার মত একটু জায়গা দিন।

—কেন? আপনার হোটেলে?

—ওখানে থাকবো না। আমি মশাই সোজা কথার মানুষ।

গানবাজনা নিয়ে থাকি বটে, তবে বেলাল্লাপনা করি না। ওসব দেখতেও পারি না। জায়গা না দেন—পথে এই শীতেই কোথাও বসে থাকবো তবু ওখানে যাবো না।

এহেন বীরকে আর শীতের রাতে ছেড়ে আসতে বাধল।

—চলুন।

—আসছি।

বিজয়মাষ্টার ওই আবছা অন্ধকারেই কোথায় জুটল, দাঁড়িয়ে আছি। দেখি একটা পুটলি বগলে বিজয়মাষ্টার ওপাশের চড়াই বেয়ে উঠছে। বলে চলেছে—ঢের হয়েছে মশায় দেশভ্রমণে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।

ক্রমশঃ কথাগুলো বের হয়।

ঘরের ছুটো খাটকে এক করে তাতেই তিনজনের শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইলা একবার দেখে গেল মাত্র চুপ করে।

ওদিকে শুনছি সরখেলমশাই গিন্নীকে কি বলছেন মিন্ মিন্ করে। লোকটা এমনিতেই ভীতু, তাছাড়া স্ত্রীর রোজগারে তাকে দিন কাটাতে হয়, তাই স্ত্রীকে কড়া কথা বলার যো নেই।

আজকের নৌবিহারের বিষয়েই কিছু বলছিল বোধহয়। বিজলী কার সঙ্গে নৌকায় উঠেছিল লেকে সরখেলমশাই তীরে দাঁড়িয়ে তাই দেখেছেন। এই নিয়েই কথাটা।

বিজলী ধমকে ওঠে।

—আমাকে কি বলছ? ওদের বলতে পারো না? যত কথা এইখানে? যদি উঠেই থাকি তাতে কি এসে গেল?

কাঠের পার্টিশানমত অনেক কথাই কানে আসে। ওরা পথে বের হয়েছে, সেই সঙ্গে মনের সব কালিমাগুলোকেই পুষে এনেছে।

বিমলদা বলে—ঘরবার ওরা ভুলে গেছে দীপু, তাই যত জ্বালা।

ওদিকে বিজয়মাষ্টার গজ গজ করছে।

—বুঝলেন দীপুবাবু, এ ছুনিয়ায় কারো ভালো করতে নেই।

কে চিনতো ওদের! আমিই ওদের গাইয়ে করে দিলাম ও রেকর্ড-রেডিওতে চান্স করে দিই। আজ কিনা—আচ্ছা!

বিমলদা ক্লান্ত হয়ে লেপের তলে ঢুকেছে। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে আমিও ক্লান্ত। বিমলদা বলে—অ মাষ্টার! তোমার লেকচার ওই ছাত্রীদের শুনিয়ো, এখন একটু ঘুমুতে দাও দিকি! অসুবিধা হয়—হোটেলেই যাও।

বিজয় চুপ করে বিছানায় বসে গুম হয়ে একটার পর একটা বিড়ি টানতে থাকে।

ওপাশে ঘর থেকে বিজলী সরখেলের ফোঁস ফোঁস চাপা কান্নার আওয়াজ আসে। বিজয়মাষ্টার খানিকটা গুম মেরে থেকে জিজ্ঞাসা করে—বিশে মল্লিকের ক'খামা বাড়ি আছে মশাই? কি তার গুণ?

বিমলদা ধমক দেয়।

—এইবার কাঁথা-কম্বল সমেত তোমায় ঘরের বাইরে করে দোব মাষ্টার। শীতের ধমকে তখন বদখেয়াল ছুটে যাবে, আলো নিভাও।

রাত নামে কোদাইকানালে।

পাইন বনে মাতাল হাওয়ার আনাগোনা চলেছে।

সকালের আলোটুকু এসে পড়েছে কাঠের জানলার সীমা পেরিয়ে। পাখীগুলো ডাকছে। শীতের ধমকে ওদের ভীরু সুর কোথায় হারিয়ে যায়।

বিমলদা সকালেই স্নান সারবার আয়োজন করছে। গরম জল মেলে।

বেয়ারা স্নানের ঘরে গরম জল দিয়ে যায়। বিমলদা বলে—স্নান সেরে নে।

বিজয়মাষ্টার সকালে উঠেই বুচকি-বোচকা বগলে আবার নিজের হোটেলে ফিরে গেছে।

পুলক বলে—ও বোধহয় একটু বাতিকগ্রস্থ।

বিমলদা জবাব দেয়—একটু নয় বেশীই। এ ছুনিয়ার সবাই কমবেশী বাতিকগ্রস্থ।

সকালেই চায়ের পর বের হচ্ছি। পাশেই কো-অপারেটিভ মিল্ক স্টোর। পাষ্ট্যারাইজ মিল্ক প্লান্ট বসানো। ছুধ মেসিনে গরম হয়ে মাখন তোলা হচ্ছে, বাকী ছুধ কিছু এখানে সাপ্লাই করা হয়। বাকী ছুধ থেকে পনীর তৈরী করে।

পনীরও বিক্রী হয় এখানে।

এক গ্লাস গরম ছুধ চার আনা। কুপন কেটে ছুধ খেয়ে উপরে উঠলাম। সকালের আলো তখন ঘন গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে।

শান্ত, ছবির মত সুন্দর একটি নির্জন শৈল সহর।

নীচ থেকে কাঠুরিয়া মেয়ের দল কাঠের বোঝা নিয়ে বাজারে আসছে। গির্জার ঘণ্টা বাজে ঢং-ঢং-ঢং।

সেই মধুর শব্দটা দিক দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে কোন কল-কারখানা নেই, মানুষের জীবনে তার প্রভাবও আসেনি।

আপনার জগতে এরা মেঘলোকের প্রশান্তিতে সুপ্ত, অভাব কই আছে? তা নিয়ে আন্দোলনের ভণ্ডামি নেই।

বিলাসবৈভব দেখবার মত স্নবের দল এখন কোদাই-এর পথ ভুলে গেছে। তাই শান্ত সমাহিত সুন্দরী কোদাইকানালের সেই সত্য রূপটিকে দেখতে পেয়েছে।

গ্লেন ফল্‌স্ হয়ে যাবো ডলফিন নোজে।

কোদাই পাহাড়ের মধ্যে ওইখানটা সব থেকে উঁচু। গাড়ি ততদূরে যায় না নেমে খানিকটা হাঁটতে হয়।

ব্রেকফাষ্ট বলতে ওমলেট আর মাখন পাউরুটি। ওমলেট এরা বানায় কেমন পোড়া পোড়া; বলেও বোঝাতে পারলাম না কি করে ওটা নরম ও একটু কাঁচা রাখা যায়। ঘাড় নাড়ে।

—ইয়েস।

কলাপাতায় যখন আনে তখন সেই সরুচাকলী। সারা মাদ্রাজ প্রদেশেই দেখেছি খাবার-দাবার পরিবেশন করা হয় কলা পাতায় করে। হোটেলে ওই শ্বাদম্ রসমও কলাপাতায়, ইড্‌লি দোসাও তাতেই। সবই পাতার প্রান্ত দেশের অংশ, যাকে বলে আগট কলাপাতা সেই টুকুতেই পরিবেশন করা হয়।

বাজার একটু বেলায় বসে।

তরী-তরকারীও বেশ আমদানী হয়। আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটর শুঁটি ও টমাটো। তাছাড়া স্কোয়াশ, ছোট কুমড়োও আছে। তবে ফুলকপি, বাঁধাকপির সাইজ ছোটই। তবে প্রায় বারো মাসই হয় সেগুলো।

পালনি হিলস্-এর শীর্ষ দেশে এই ডল্‌ফিন্ নোজ। পথ এবার তেমন ভালো নয়। দু'একদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে খুব, সেই বৃষ্টির জলে মাটি পথ সব স্যাঁৎসেতে। মাটিতে শেওলা জন্মেছে।

গাড়ি থেকে হাঁটছি। চড়াই-এর বন।

ওপাশে ঘন পাইন বন, হঠাৎ একটা শব্দে ফিরে চাইলাম, জুতো সমেত পিছল শেওলায় পিছলে প্রশান্ত ছিটকে পড়েছে। সঙ্গের ক্যামেরাও।

ইলা হাসিতে ফেটে পড়ে।

প্রশান্তের প্যান্টে লেগেছে নরম শেওলা। ধড়মড় করে উঠে নিজের দিকে না চেয়ে দামী ক্যামেরাটা দেখতে থাকে। বিমলদা জিজ্ঞাসা করে—ঠিক আছে তো?

নিশ্চিন্ত হলাম।—না ওটার কিছু হয় নি।

স্তব্ধ দিগন্ত। পাহাড়-সীমা এখানে ফুরিয়ে গেছে। বহু দূরের উপত্যকা ছায়া-ছায়া ধোঁয়াটে দেখায়।

এর পরই আমার পালা একটা ইউক্যালিপটাস গাছের ডাল ধরেও

সামলাতে পারি না, ডালের প্রান্তদেশ নিয়ে পড়েছি। ডল্‌ফিন্‌ নোজ তখনও উঁচুতে।

বিমলদাই বাধা দেয়।

সোজা পাহাড়ে উঠতে হবে। তোদের মত এলেমদারদের এইবার ত্রিশূল অভিযানে যেতে হ'ত বুঝলি। আর এগোলে এইবার আস্ত থাকবি না, ফিরে আয় বাবারা। তবু সাবধানে চলার চেষ্টা কর।

ইলাই প্রশ্ন করে—কাল বিজয়বাবু ওখানে ছিলেন ?

সায় দিই।

ইলা বলে—লোকটা হিপক্রিট্‌। ভণ্ড। ওর রাগের কারণ অনেক কিছু।

জবাব দিলাম না।

—ওকে পাত্তা দেবেন না অনেক অভিনয় জানে ও। আসলে কাল কেন এসেছিল জানেন ?

ওর দিকে মুখ তুলে চাইলাম। ক্লান্তিতে হাঁফাচ্ছে ইলা।

বলে—আমি এখানে আছি। কি ভাবে আছি তাই দেখে গেল। রাগটা আরও হয়েছে মলিনার জন্যে। বিশু মল্লিকের সঙ্গে ঘুরছে।

বিজয়বাবুই মলিনার কলকাতায় থাকার খরচ দেন, পড়ছে কোথায় সে সব খরচও দেন।

—তা হলে জেনে শুনে মলিনারও এসব করা অন্যায়, যখন উনি পছন্দ করেন না।

ইলা শোনায়—মলিনাও পছন্দ করে না বিজয়বাবুকে। ওযে ওর মায়ের কাছে টাকাপত্র দেয় তার জন্য মলিনাও এটা চায় না। সে চায় ছোট্ট একটি ঘর-সংসার। বিজয়বাবু ওকে শোনান বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা। ওসব তো কোনদিনই হবে না ওর, মলিনাও জানে।

মলিনার উপর অভিমান করে ও কাল এসেছিল এখানে।

বিরাট বিশ্বের প্রশস্ত সমাবেশে এসে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবী আর

আকাশ যেন এখানে এক স্থানে বাঁধা পড়ছে। পাখী-ডাকা মুক্ত অঙ্গন।

এখানে মানুষের ওইসব তুচ্ছ পাওয়া না পাওয়ার কথা নিয়ে ভাবতে চাই না। কোদাই আমার কাছে রহস্যময়ী সুন্দরী কোন পর্বত কন্যার মোহময়ীরূপে দেখা দিয়েছে।

এ চোখে কোন উজ্জ্বল নগরীকে দেখিনি।

এখানে মানুষ আগে পাহাড় আর মেঘের খেলা দেখত, সাক্ষী ওই নীরব পাইন বট গাছগুলো। উইপিং উইলোর লম্বা লম্বা ডালগুলো স্তব্ধ কোন শোকাতুরা নারীর সাজে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে শুধু প্রকৃতির রহস্যেই মানুষ আসে তার লীলানিকেতনে। তীর্থ নেই, মন্দির নেই—আছে আকাশরূপী মহাদেবতা। যে যাকে দর্শন-মননের সীমাপারে অসীম অনন্ত আনন্দলোকে।

ট্যাক্সির কাছে ফিরলাম তখন বেলা হয়ে গেছে অনেক। সকালের সেই ওমলেট রুটি কখন হজম হয়ে গেছে। ইলাই বাস্কেট থেকে বের করে রুটি, জেলি আর সেই লাল বিরাট কলাগুলো।

আজ বেশ তৈরী হয়েছে।

ওর শাঁসটাও লালচে আর বেশ সুঘ্রাণময় তেমনি মিষ্টি। ড্রাইভারকেও দিলাম।

সে রুটি জেলিই নিল, কলাটা নিল না। বলে—কোডি পাহাড়ের লোকরা অনেকে ওই কলা খায় না।

—কেন?

—আমাদের ওটা সহ্য হয় না। দেখেননি কোডির বাসিন্দারা বিশেষ কলা খায় না। ওসব তাই এত বেশী চালান যায় নীচে।

ঝর্ণার জল খেতে যাবো, বাধা দেয় ড্রাইভার।

—ও জল খাবেন না।

কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না, উঁচু পাহাড়ের ঝর্ণার জল সহজে কেউ

খায় না। এতে নাকি পেটের অসুখ হতে পারে। হিল ডায়েরিয়া। দার্জিলিং এবং শিলংয়েও শুনেছি ওই কথা।

…ছায়া ছায়া রোদ।

বনভূমির বুকে নানা ফুলের সমারোহ। পুঞ্জ পুঞ্জ পাইনের মাথায় মিষ্টি আলো যেন জমাট বেঁধেছে। এ পর্বতের গায়ে হাজারো মন্দির —ওই পাইন গাছগুলো এক একটা মন্দিরের চূড়ার মত আকাশে মাথা তুলেছে।

কোডির দিন ফুরিয়ে এল।

আজ বৈকালেই ফিরতে হবে মাদুরায়। এতদিন দেখেছি পাহাড় —দেবতা—সহর—বিচিত্র মানুষ আর বিরাট মন্দির।

আবার সেই মন্দির জগতেই ফিরে যাবো।

এই বিরতিটুকু মধুময় হয়ে উঠেছিল প্রকৃতির এই নিভৃত স্পর্শে কোন মেঘলোকের সীমানায়।

এ যেন উমার শান্ত ধ্যাননিমগ্না রূপ। দুর্গম পর্বতশীর্ষে কোদাই রূপসী একনিষ্ঠ তপস্যায় রত। আমি এই শান্ত রূপটিকে স্পর্শ করে গেলাম।

আজ লেকের ধারে পিকনিক।

মেনু বিরিয়ানী, স্যালাড আর ফাউলকারী—শেষ পাতে পেঁপের প্লাষ্টিক চাটনী।

একনজর লেকের ওদিকে ঘুরে এলাম আবার।

দেখি একটা বটগাছের নীচে মলিনা ফারকোট চাপিয়ে হাতে একগাদা ফুল নিয়ে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছে বিশু মল্লিকের ক্যামেরার সামনে।

সরখেল গিন্নী আজ কত্তার পাশে চুপ করে বসে আছে।

বিমলদা বলে—কাল রাতে কে কাঁদছিল জানিস ও ঘরে ?

—সরখেল গিন্নী !

বিমলদা শোনায়।

—ছাই জানিস! এই বুদ্ধি নিয়ে বই লিখিস!

—তবে!

ওই নেংটি ইঁদুরের মত সরখেল মশাই। দেহিপদ-পল্লবমুদারুম্।
গীতগোবিন্দ পড়েছিস?

বিমলদা মাঝে মাঝে দু-একটা দামী বুলিই ছাড়ে। ওকে ঘাটানো নিরাপদ নয়। পুলক ইতিমধ্যে কোত্থেকে একটা বোট ভাড়া করে এনেছে। ডাকাডাকি করছে।

—ও বৌদি! আসবেন!

সরখেলমশাইও তাড়া দেয়—চল না বিজু একটু ঘুরে আসবো।

দুজনেই গিয়ে বোটে উঠল। বিজলী সরখেল আজ চুপচাপই রয়েছে। ওপাশের পাইন গাছের নীচে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বিজয়মাষ্টার। বিড়ি টানছে আর নোটবই-এ কি লিখছে।

বোধহয় ব্যর্থ প্রেমের গানই লিখে চলেছে শিল্পী।

—বিজয়বাবু!

বিজয়বাবু একবার চেয়ে আবার কলারাজ্যের অসীমে হারিয়ে গেল। সাড়া দেবার মত অবকাশ বা মনের অবস্থা তার নেই।

···এবার নামার পালা।

আবছা আলোয় কোদাইকানাল পিছনে রেখে আমরা নামছি। সিলভার কাস্‌কেড ছাড়িয়ে গেলাম, পাহাড়ের বাঁকে আর কফির বাগানটা দেখা যায় না, দেখা যায় না কোডাই পাহাড়কে।

···বহু নীচে পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় বনের মাঝে দু'একটা জনবসতি।

নির্জন জগতের অসীমে এইটুকু ওদের অস্তিত্ব। শান্তিতে থাক ওরা আমাদের পথ নেমে গেছে নীচে কর্মব্যস্ত লোকালয়ের দিকে!

মাদুরায় ফিরে, বা আজ রাত্রেই আবার যাত্রা সুরু। থামবো সোজা ত্রিবান্দ্রমে গিয়ে সেখান থেকে যাবো ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারী।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে। এতদিন দেখতাম বিজয়মাষ্টার বসত বাসের সামনের দিকে, ওর ছাত্রীদের আশেপাশে না হয় মধ্যে। আজ একটা আলোয়ান জড়িয়ে বিজয়মাষ্টার বসেছে আমাদের পাশের সিটে।

মুখ চোখ থমথমে। শরীর খারাপ!

আমার কথায় বিজয়বাবু ঘাড় নাড়ে। একটু পরই বলে—সারাদিন আজ খাই নি।

অবাক হলাম—কেন?

—খেতে ভালো লাগলো না। এখন খিদে পেয়েছে—

কিই বা দিই। একটা বাস্কেটে কিছু কলা আর কমলা ছিল তাই বের করে দিলাম।

—এই খান, পরে মাদুরায় গিয়ে যা হয় খাওয়া যাবে। না হয় পথে কোথাও কফি-বড়া খেয়ে নেবেন।

বিজয়মাষ্টার সারাদিন আজ না খেয়ে কাব্য সুধা পান করার চেষ্টা করেছে, অবশ্য তাতে পেট ভরে নি। লোকটাকে মাঝে মাঝে বিচিত্র ঠেকে।

ইলা মধ্যে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখে।

ওদিক বাসের মধ্যে সুর উঠেছে। মালনা, কেতকী আরো কারা খুশীতে গান গাইছে। পাহাড়ের বুক থেকে গাড়িটা নামছে বেগে। বহু নীচে বসিতর আলো দেখা যায়, এইবার আমরা সমতলে এসে নামবো।

রাত এগারোটায় গাড়ি। তার আগেই মাদুরা পৌঁছতে হবে। পথ এখন সামনের দিকে তারই টানে মায়াময়ী কোদাই কানালকেও ভুলে এলাম।

এবার কিছুদিন পর পাহাড় রাজ্য দেখবো। নীলগিরির শীর্ষ সহর উতকামণ্ডে আবার সেই রাজ্যে ফিরে এলাম।

মাদুরা সহর আসতে আর দেরী নেই। দূর থেকে মীনাক্ষী মন্দিরের

গোপুরমের আলো দেখা যায়, বিরাট উঁচু, দূর আকাশে যেন কে সরাসরি আকাশ প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে।

ইলা বলে একবার ঘুরে গেলে হতো না?

বাধা দেয় বিমলদা—না, যাকে দেখিনি তাকে নোতুন মন, নোতুন চোখ নিয়ে এসে দেখবো এ ভাবে দেখা যাবে না। হয়তো মনের সেই কল্পনাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

—তাহলে রামেশ্বরম্ ফেরার পথে?

—তাই।

রাত্রি হয়ে গেছে। গাড়ি চলেছে! মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে এক একটা ষ্টেশন আসে, আবার পার হয়ে যায়। অসীম আঁধারে—

কালীলেখা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয় হারা দেশে
ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে জ্বলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদূর তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি—
দূরের কোথায় যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।

ঘুম ভাঙ্গা চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকি, শীতের সেই ধমক আর নেই। সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি।

এবার পশ্চিম সমুদ্র আরব উপসাগরের দিকে চলেছি আমরা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। দেখি ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। তখনও কোদাই-এর সেই স্বপ্নময়ী রূপকে ভুলিনি। মনে

হয় সেই শৈলপুরীতেই রয়েছি! পাইন বনের ফাঁক দিয়ে এসে পড়বে দিনের আলো।

না! ভরা আলো জেগেছে নারকেল কুঞ্জ বীথিকায়।

কুইলন ষ্টেশন পার হয়ে চলেছি এবার ত্রিবান্দ্রমের দিকে। মাদ্রাজ প্রদেশ ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়েছি কেরালার সীমানায়।

এতদিন মাদ্রাজের পথে পথে ঘুরেছি। সেখানকার লোকজনদেরও দেখেছি। চোখে পড়েছে গ্রাম অঞ্চল।

কেরালার সবকিছুই একটু ভিন্ন ধরণের। এখানকার মানুষরা অপেক্ষাকৃত ফরসা, ঘড়বাড়িও ছিমছাম পরিষ্কার। প্রত্যেকেরই বাড়ির সংলগ্ন একটু বাগানমত, নারকেল, আম-কাঁঠালের গাছ তাতে আছে। আর আছে ফুলগাছ।

নেহাৎ গরীব যে গৃহস্থ তার বাড়ি হয়তো কাদা মাটির। টালির চাল—তবু একটু ছিমছাম।

পরনের জামা লুঙ্গিও ফর্সা, পায়ে চটিও আছে। ষ্টেশনের অনেকেই ইংরাজী বোঝে।

পথের দুপাশে শুধু নারকেলের বাগান, আকাশে হাজারো গাছ মাথা তুলেছে—তেমনি তাদের ফলের সমারোহ। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল ভিতরে চলে এসেছে গ্রামের কাছে। নীল জলের ধারে নারকেল গাছ—খালে জলায় ওই নৌকার সারি সব দেখে পূর্ববাংলার হারানো সেই ছবিটা ভেসে ওঠে।

মনে হয় এদেশের সঙ্গে যেন পরিচয় ইতিপূর্বে ঘটেছে। এ অচেনা নয়।

—কাঁঠাল গাছে এখন ছোট বড় কাঁঠাল ফলেছে। আম গাছগুলোও নিষ্ফলা নয়। সকালের আলোয় সন্ত জাগা নতুন দেশের দিকে চেয়ে থাকি। মাঝে মাঝে নীল জলভরা খালে নৌকার খোল বোঝাই নারকেল ছোবড়া নিয়ে চলেছে মাঝিরা।

এখানে ওই দরকারী জিনিস—ওদিয়ে নানাকিছু তৈরী হয়ে, চালান যায় দেশ বিদেশে।

ত্রিবান্দ্রম আসতে আর দেরী নেই। বর্তমান কেরালার রাজধানী ওই ত্রিবান্দ্রম। অতীতে ত্রিবাঙ্কুর ছিল করদ একটি রাজ্য। শাসন-কার্য চালাতেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা।

তারপর ওই রাজ্য কেরালার অন্তর্গত করা হয়। রাজধানী ত্রিবান্দ্রমই রয়ে গেছে।

সুন্দর সহর, ঘরবাড়িও পরিষ্কার। ঘিঞ্জি বলে মনে হয় না। সহরতলী পার হয়ে আমাদের ট্রেন ত্রিবান্দ্রমে এসে পৌছল। বড় ষ্টেশন। তবে এই পথের শেষ ষ্টেশন এই ত্রিবান্দ্রম।

আমাদের গাড়িটাকে ওরা টেনে এনে সাইডিং-এ পিলগ্রিম প্ল্যাট-ফরমে রেখে দিয়ে গেল। বেলা তখন প্রায় দশটা বাজে।

বাইরে কর্মব্যস্ত ত্রিবান্দ্রম সহরের ছবি ফুটে ওঠে।

স্নান খাওয়া সেরেই বের হবো সহর দেখতে।

বিমলদাও সায় দেয়।

—পিছুটান সেরে বেরুনোই ভালো।

ইতিমধ্যে আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এর আগে মাদ্রাজের বিভিন্ন ঠাঁই-এ একটা সোয়েটারও গায়ে রাখতাম, এখানে সোয়েটার গায়ে দিতেও কষ্ট হচ্ছে। আবহাওয়া আমাদের দেশের চৈত্র মাসের মতই।

বেশ গরম বোধ হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের স্নানও সমাধা হয়ে গেছে। জলের অভাব এদিকে বিশেষ নেই, দু'এক জায়গা ছাড়া। ওয়েটিং রুমে কল জল শাওয়ারও রয়েছে। কাজেরও তাড়া নেই।

তাই স্নান পর্বটা বেশ যুৎ করে সারা গেল।

রান্নার শেডও রয়েছে। ঠাকুর ইতিমধ্যে এচোঁড়ের তরকারী আর

পার্শে মাছের ঝাল বানিয়েছে। মাছ এদিকে সের দরে এখনও বিক্রীর রেওয়াজ নেই। সমুদ্রের তীর।

বাজারে পার্শে, পায়তাতেলী, ছোট ভেটকীও আছে। ভাগা হিসাবে বিক্রী। বেশ বড় সাইজের পার্শে টাকায় ছ'টা, আট-টাও মেলে, আর বেশ স্বাদিষ্ট মাছ।

চোখের দেখা ইতিপূর্বে ঘটেনি, যোগাযোগ ছিল পত্রদ্বারাই। আজ তাই জনকে দেখে একটু অবাক হ'লাম। একটি তরুণ, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। চিঠিতে তাকে জানিয়েছিলাম ওর দেশে যাচ্ছি। যদি দেখা করা সম্ভব হয়—করলে খুশী হবো।

ওর সঙ্গে যোগাযোগ এই প্রথম। বছরখানেক আগে সে কেরালা থেকে ষ্টেট স্কলারসিপ নিয়ে পুণায়, ভারতসরকার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম ইন্‌স্‌টিটিউট-এর ছাত্র ছিল, বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে সেখান থেকে পাশ করে। সেইখানেই আমার একটা উপন্যাসের ছবি দেখানো হয়—সেই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে সে আমার ঠিকানা যোগাড় করে, চিঠি লেখে এবং তার মাতৃভাষা মালয়ালমে সেই গল্পটির চিত্ররূপ দেখার অনুমতি নেয়।

সেই সুবাদেই যোগাযোগ।

হঠাৎ আজ ষ্টেশনে এসে হাজির। তার বাড়ি ত্রিবান্দ্রমের উপকণ্ঠে। ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে তার জনৈক রেলকর্মচারী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

বিমলদাই বলে—তোকে এক ভদ্রলোক খুঁজছে ?

গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। বসিয়ে আগে সে পরিচয় দেয়।

—আই এ্যাম জন। টি. সি-জন।

—জন!

ওকে সহজ করে নিতে দেরী হয় না। আমন্ত্রণ জানাই লাঞ্চ করোনি বোধহয়। তাহলে বেজলীখানা কিছু খেয়ে নাও।

জন বলে—এ-যে উল্‌টো হ'ল। আমার দেশে তুমি অতিথি।

—ওটা পরে ভাবা যাবে! খেয়ে নাও। দেখা যখন হয়েছে তখন ছুটো দিন তোমার গেল! গাইডও পেয়ে গেলাম আমি।

বের হলাম! বিমলদা প্রশান্ত পুলক আর ইলাও তৈরি হয়েছে।

—তুমি?

ইলা বলে—একা একা লক্ষ্যহীনের মত অজানা জায়গায় ঘুরে ছু-একদিনে কিছু দেখা সম্ভব নয়। আপনি ঠিক দেখবার মৌকা করে নেন। তাই এ দলের সঙ্গ ছাড়ছি না।

জন বলে—ঠিক আছে চলুন।

সস্ত্রীক নেত্যবাবু বিশু মল্লিক অন্য—সকলে তখন স্নান খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। বিজয় মাস্টার আজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে; ওরা বেরুবার আয়োজন করে।

তার আগেই বের হয়ে গেলাম।

স্টেশনের বাইরে পরিষ্কার ছায়াঘন পরিবেশ। মাদ্রাজের স্টেট-বাসের প্রতীক গোলাকার বৃত্তের মধ্যে একটা মন্দিরের গোপুরম।

ট্যাক্সি নিই?

জন বাধা দেয়—পরে দেখা যাবে। চলুন বাসে গিয়ে মিউজিয়াম রেপটাইল হাউসের কাছে নামবো।

পরিচ্ছন্ন সহর। লোকজনের ভিড় বা গুতোগুতি নেই। বাস চলেছে। এইটেই ত্রিবাদ্রমের অন্যতম প্রধান রাজপথ। পথের পাশেই আগেকার রাজবংশের কিছু প্রাসাদ। আজ সেখানে কলেজ, কোনটায় সেক্রেটারিয়েট, কোনটায় অন্য সরকারী অফিস। তাছাড়াও কেরালায় আজ স্কাইক্র্যাপার বহুতল বাড়িও তৈরি হচ্ছে যা এখানের সংস্কৃতি স্থাপত্যশৈলীর রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

হয়তো বা দৃষ্টিকটুই ঠেকে।

কিন্তু তবু বর্তমান সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই রুচিহীন

বাস্কটাইপের বিরাট প্রাসাদও গড়ে উঠছে—আজকের মানুষের সৌন্দর্য-হীনতার প্রতীক হয়ে।

বাস থেকে নেমে এগিয়ে এলাম মুক্ত পরিবেশে বাগানঘেরা একটা জায়গায়।

জন বলে—ওপাশে জু। এদিকে রেপটাইল হাউস। পাশে একটা আর্ট গ্যালারী—আর মিউজিয়াম।

বিমলদা বলে—জু দেখে কি করবো?

জন বলে—রেপটাইল হাউসেও বিশেষ কিছু নেই, শুধু একটি জীব আপনাদের দেখাবো!

তবু চারপাশ ঘুরে দেখতে থাকি। কাঁচে নানা জাতীয় সাপ রয়েছে। সবই এখানের বন পাহাড়ে সংগ্রহ করা। দু একটা কিং কোবরাও দেখলাম।

ওপাশে কাঠের কেসে ছোট ডাইনসরের মত একটা কদাকার সরীসৃপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বেশী বড় নয় ওরা, হাত দুই আড়াই হবে দৈর্ঘ্যে, কদাকার মুখ থেকে জীবটা মাঝে মাছে বের করে, নখগুলো ধারাল, কাঁচের গায়ে তাই দিয়ে মাঝে মাঝে আঘাত করে।

অনেকটা আমাদের দেশের গোসাপের মত আকৃতি, তবে গোসাপের গায়ের রং সোনালী তবু একটা শ্রী আছে তার। এর সেটুকুও নেই।

জন বলে—এর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। শিবাজীর রায়গড় অধিকার করার কাহিনী শুনেছেন?

মাথা নাড়ি। পুনায় থাকাকালীন রায়গড়ও গেছলাম। দুর্ভেদ্য দুর্গ, খাড়া পাহাড়ের উপর দুর্গের প্রাকার, এই জানোয়ারগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই খাড়া পাহাড়ের উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে, এরা খাড়া পাথরের মাঝে একটু ধরবার জায়গা পেলেই ধারাল নখ দিয়ে ধরে থাকে, আর টেনে নামানো যায় না। তাদের সেই দড়ি ধরে তখন অনায়াসেই কেউ উপরে উঠতে পারে। এই জানোয়ারটি তাই ইতিহাসের অধ্যায় রদবদল ঘটিয়েছে।

রেপটাইল হাউস থেকে বের হয়ে সামনের আর্ট গ্যালারীতে ঢুকলাম। কথা হচ্ছিল কেরালার চিত্রকলা সম্বন্ধে। বিমলদা বলে—এখানে তো অনেক বড় বড় শিল্পী ছিলেন। তাছাড়া শুনেছি কেরালায় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেও রঙীন ছবির কাজ হতো মূল্যবান পেইন্টিংও আছে।

—তা আছে। তবে সেসব প্রমাণ পরিচয় কিছু মেলে মন্দিরে, এখানের পদ্মনাভ টেম্পলেও তেমনি কিছু ছবি আছে। তবে মন্দিরের আওতা থেকে এই ছবির কাজ জনসাধারণের সামনে বের হয়ে এসেছিল অনেক পরে। তার জন্য তখনকার মহারাজাদের দানও অনেক। কেরালায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখন শিল্পকলা, নৃত্যকলা—সর্বক্ষেত্রেই ছিল শীর্ষস্থানীয় এবং এসব বিদ্যা তারাই একচেটিয়া করে রেখেছিল। ১৬০৩ সালেও রাজা বীর রবি বর্মা তিরভাট্টার মন্দিরে কিছু ছবি আঁকান। আবার এই ত্রিবান্দ্রমের পদ্মনাথস্বামী মন্দিরে অনুমান ১৭২৯ থেকে ১৭৩৩ সালে রাজা মার্তণ্ডবর্মা নামে এক শিল্পীকে দিয়ে কিছু ছবি আঁকান। পদ্মনাথস্বামী-লক্ষ্মী। ভূমি—এই সব দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করে তিনি কিছু ছবি আঁকেন। এর কিছু কিছু এখনও আছে। এ ছাড়া অরুনন্দল মন্দিরেও কিছু মুরাল পেইন্টিং আছে। সেগুলো প্রায় ৬৩ ইঞ্চি লম্বা আর পঞ্চাশ ইঞ্চি প্রস্থ। এখনও তার রং-সৌন্দর্য কিছু বজায় আছে।

এ ছাড়াও ফোর্ট প্যালেসে—কৃষ্ণপুরম প্যালেসেও কিছু উৎকৃষ্ট মুর‍্যাল পেইন্টিং আছে।

বিমলদা বলে—মাদ্রাজের কোন মন্দির বা অন্যত্র এইরকম পুরনো ছবি নেই।

জন জানায়—কিছু আছে মাদুরায়, রামেশ্বরেও; তবে সেগুলো তত প্রাচীন নয়। কেরালাতেই এই চিত্রকলা একটা সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। এর জন্ম লোকসংস্কৃতি আর লোক-চিত্রকলা থেকেই। এখানের পল্লীজীবনে অনেক আগে থেকেই আলপনা বা পূজো উৎসব উপলক্ষে চিত্রণ সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। নানারকম রং

চালের গুঁড়ি দিয়ে তাতে রং করা হয়। পদ্ম চক্র, স্বস্তিকাও থাকে তাতে। তাছাড়া কালীদুর্গা-শস্থ প্রভৃতি দেবদেবীর পূজায় নানা বর্ণের আলপনা দেয় লোকে। কাঠকয়লার কালো রং থেকে সাদা হলুদগুঁড়ো, সবুজ পাতা সবুজে রং, লাল নানাবর্ণ ব্যবহার করে তারা।

আমরা গিয়ে হলের ভিতরে ঢুকেছি। নানা পোশাক সুন্দর হাতের কাজও রয়েছে। দেওয়ালে রয়েছে রাশিয়ান শিল্পী রোয়েরিখের কতকগুলো ক্যানভ্যাস। রোয়েরিখের আসল ছবি বড় একটা দেখিনি। ইলাও ওই নাম জানে, দেবিকারানীর স্বামী ? না ?

বলি—ঐ রাশিয়ান শিল্পী ভারতবর্ষে এসে হিমালয় দেখে মুগ্ধ হয়ে কুলুভ্যালির কোন নিভৃতে নিজের একটু আস্তানা গড়ে সেইখানেই শিল্পসাধনায় ডুবে যান। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন ভারতীয়।

ছবিগুলোর ভাষা বলিষ্ঠ, লাইন রং টোন সব মিলিয়ে তারা সজীব। মেসেঞ্জার পর্ব ছবিতে দেখা যায়, প্রকৃতির উদ্দাম ধ্বংসকে তুচ্ছ করে মানুষ এগিয়ে চলেছে। মানুষের এই জয়যাত্রার কাহিনীকে শিল্পী তার সার্থক রং এবং প্রয়োগে আর নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছে।

ছবির দিকে চেয়ে থাকলে নিজেকে ভুলে যেতে হয়। ওপাশে একটা ছবি, বিষয় বস্তু তার পরিচিত। ইলা বলে—রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কবিতার প্রচুর ছাপ রয়েছে।

আশ্রমের পরিবেশ, সেখানে রয়েছে হরিণ শিশু বসন্তের সমাপনে সে উদ্‌ভ্রান্ত, দুচোখে তার প্রকৃতির মধুর মেলার আহ্বান।

—সত্যিই তাই। আশ্রমবাসীই যেন মহাকবি, তাঁর সৌম্য শান্ত রূপ, মহাজীবনের প্রতীক।

এদিক-ওদিক অন্বেষণ করতে থাকি।

জন ওপাশে কিউরেটারের সঙ্গে আলাপ করছিল, সে ভদ্রলোকও এগিয়ে আসেন।

জানান—শ্রীচিত্রালয়মে কিছু মূল্যবান সংগ্রহ আছে। আমি সেখানের প্রবেশ পত্রের ব্যবস্থা করছি।

ধন্যবাদ জানিয়ে ওপাশের মিউজিয়ামে এলাম। কাঠের বাড়ি, দেওয়াল ইট পাথরের তৈরি। বাড়ির ওপর অংশে প্রচুর কাঠের কার্য। সে সব কার্য দক্ষিণ ভারতের কোথাও চোখে পড়েনি। পাথরের তো আছেই, কেরালায় এই কাঠের কাজ তারমধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অন্য কোথাও দেখিনি।

জন বলে—এখানে পাথরের মূর্তি, তামা, ব্রোঞ্জ-এর মূর্তি কিছু দীপদান, আইভরির কাজই প্রধান, কাঠের কাজও কিছু আছে। এ সব কেরালার বিভিন্ন মন্দির ধ্বংস প্রায় পদ্মলাভপুরম প্রাসাদ তাছাড়া রাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে রাখা।

বিরাট হলে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম! সামনেই কাঠের বিরাট একটা সিংহাসন, হলের কেন্দ্রে। চন্দন এবং দামী সেগুন কাঠের তৈরি মাথার উপর অতি সূক্ষ্ম কাজ করা কাঠেরই চন্দ্রাতপ…

তাছাড়া চারিদিকে সাজানো পাথরের বিভিন্ন দেবদেবী মূর্তি, তার মধ্যে রতি মদনের কীর্তি রয়েছে। পাথরের সংগ্রহের পর তামা কাঁসা ব্রোঞ্জ-এর মূর্তি। নটরাজ মূর্তি তা'ছাড়া শতাব্দীও বহু মূর্তি আছে।

ইলা বলে—এতো মাদ্রাজের তাঞ্জোর চিদাম্বরমের মূর্তির মতোই!

জন জানায়—পাশাপাশি রাজ্য, শিল্প বিনিময় নিশ্চয়ই ছিল, তবে লক্ষ্য করুন দেখবেন এসব কাজ আরও নিখুঁত, ষোড়শ শতাব্দীতেও যখন ওরা পাথর নিয়ে কাজ করছে, এসব মূর্তি তখন কেরালায় ধাতু দিয়ে আরও সুন্দর করে গড়েছে তারা।

ওপাশে বিরাট একটা চন্দন কাঠের উপর দু'দিকে হাতীর দাঁত দাঁড় করানো, ওর দু'দিকের ঊর্ধপ্রান্ত থেকে রূপোর সব চেনে ঝোলানো রয়েছে হাতীর দাঁতের তৈরি সিংহাসন সমেত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি।

নিখুঁত সুন্দর। এত বড় হাতীর দাঁতও দেখা যায় না।

কিউরেটার জানান—তখনকার দিনে এর দাম ছিল অনুমান চার হাজার টাকা। এখন এসব ষ্টেট প্রপার্টি।

বের হয়ে এলাম, বাইরে সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠে রোদের আভা

পড়েছে। মনোরম পরিবেশে। ফুল গাছও অনেক। দেখি বিজয় মাষ্টার, মলিনা, নেত্যবাবু আরও অনেকে আসছে। পিছু পিছু আসছে বিশুবাবু—আজ বিজলী সরখেলের সঙ্গে তার গল্পের বান ডেকেছে, পিছু পিছু আসছে সরখেলমশাই।

তার হাতে একটা থলিতে কিছু কমলালেবু মুসাম্বির ইত্যাদি। কাঁধে বিজলীর গরমের চাদরটা পাট করা।

নেত্যবাবুই বলে—আরে মশায় আপনারা দেখছি আগেই এসে গেছেন। তা কি কি দর্শনীয় আছে? ওই ছবি ঘরেও ঢুকলাম, কি মাথা-মুণ্ডু রয়েছে, হ্যাঁ এই দেখতেই এতো কষ্ট! চলো কোথায় মাছের ঘর আছে সেইখানেই যাবো। এ পাথর আর পেতলের মূর্তি দেখে কি হবে!

কথার জবাব দিলাম না। ওদিকে জন ততক্ষণে একটা ট্যাক্সি ধরেছে। শ্রীচিত্রালয়মের দিকে চলেছি এইবার। বেরুবার পথে দেখবো পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির। ত্রিবান্দ্রম রাজবংশের তিনিই প্রধান দেবতা, মহারাজা তারই সেবাইত।

...জন বলে চলেছে কেরালার চিত্রকলার কথা।

—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ত্রিবাঙ্কুরের চিত্রকলায় একটা বিশিষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। কেরালার নিজস্বরীতি তার চিন্তাধারার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল বিদেশী চিত্রকলার প্রভাবের। মোঘল চিত্রকলার প্রভাবও বাদ যায়নি। রঙ্গ ভিলাসম প্রাসাদে কার্তিক থিরুনল রামবর্মা মহারাজা, বালারাম বর্মা মহারাজার যে পোট্রেট আছে তাতে এই প্রভাব বেশ গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সোয়াতি থিরুনল রামবর্মা মহারাজা ছিলেন মূলতঃ সঙ্গীতজ্ঞ তবু চিত্রকলায় তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল, তিনি আলগিরি নাইডু নামে মাদুরার এক প্রখ্যাত শিল্পীকে এখানে আনেন, আলগিরি নাইডুর অনেক ছবি আজ প্রখ্যাত। আলগিরি নাইডুই কেরালার চিত্র শিল্পের অন্যতম দিকপাল, কোন রাজবার্মা নায়ক একটি ছাত্রকে ছবির কাজ শেখান।

রাজা রাজ বর্মা কিল্‌লিমানুর রাজবংশের বংশধর। রাজা রাজ বর্মাই ক্রমশ শিল্পকলায় উৎকর্ষ লাভ করেন, তাঁর একটি ছবি মণ্ডপ আর অন্য একটি অরণ্যের ক্ষুধার্ত পশুদের ছবি এই শ্রীচিত্রালয়মে দেখা যাবে।

রাজা রাজ বর্মাই এখানে মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রবিদ্যা শেখাতে থাকেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তার দুই ভাগ্নে রাজা রবি বর্মা, আর সি, রাজা রাজ বর্মা সারা ভারতের প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এতদিন জলরঙ-এর কথাই এরা করেছেন।

রাজা রবি বর্মার সময়ে ত্রিবাঙ্কুরে থিয়োডর জনসন নামে একজন ইংরেজ চিত্রশিল্পী আসেন। রাজা রবি বর্মা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তেলরং-এর কাজ শুরু করেন। রাজা রবি বর্মা আর তার ভাই সি, রাজ বর্মা দু'জনে এক সঙ্গে দীর্ঘকাল কাজ করেন। রবি বর্মা পোর্ট্রেট, আর পুরাণের কাহিনী নিয়ে আঁকতেন, ভাই রাজ বর্মা আঁকতেন মানুষের ফিগার আর সুন্দর ল্যাণ্ডস্কোপ, এঁদের বহু ছবি ওই শ্রীচিত্রালয়মে রয়েছে।

বিশাল চিত্রশালা, রাজা রবি বর্মার বহু ছবি এখানে রয়েছে। নায়ার মহিলার প্রসাধন এই ছবিটিই প্রথমে তাকে খ্যাতি এনে দেয়। রাজা দুষ্মন্তকে লিখিত শকুন্তলার পত্র, এ ছবিটিও তার উৎকৃষ্ট। সেটি ডিউক অব বাকিংহাম মাদ্রাজের গভর্নর থাকাকালে কিনে নেন।

সীতারবনবাস তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র। অপূর্ব এর বর্ণসামঞ্জস্য, তেমনি টোন, সবদিক থেকেই তাঁকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলা যেতে পারে।

এই ছবির পরই বরোদার গাইকোয়াড়, মহীন্দরের মহারাজা রবি বর্মাকে দিয়ে অনেক আঁকান। তাছাড়া উদয়পুরের রাণাদের হয়েও ছবি আঁকেন।

রাজা রবি বর্মার পরে কেরালায় আর তেমনি চিত্রশিল্পী হয়নি। তবে রবি বর্মার বোন মঙ্গলবাই তমপুর্তিও কিছু ছবি আঁকেন। তার

মধ্যে রবি বর্মার একটা পোট্রেট আর 'চ্যারিটি' এই দুটি ছবিই তার প্রসিদ্ধ।

অবশ্য অনেকেই রবি বর্মার পদ্ধতিতে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। তবে তারা এমন কিছু অবদান রাখতে পারেননি। বর্তমানকালে কেরলার চিত্র শিল্পীদের নাম করা যেতে পারে কে মাধব মেননের। তিনি অনেকটা মুঘল চিত্রশিল্পীর পদ্ধতিতে কাজ করেন।

জনের কথাগুলো অনেকাংশে সত্যি। রবি বর্মার ছবির রাজ্য থেকে বের হলে মনে হয় পুরাণের একটি বিচিত্র যুগে কে যেন হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

বৈকাল হয়ে আসছে।

এবার মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি।

—এ্যাকুরিয়াম দেখবেন না?

জবাব দিই—মাদ্রাজেও দেখলাম, বোম্বের তারাপোরওয়ালাও দেখেছি।

ইলা বলে—সব তো জীবন্ত।

মাথা নাড়ে জন—হ্যাঁ।

ইলাই জেদ ধরে—তবে একটু দেখেই যাই। চলুন না।

সহরের একান্তে বীচের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় এ্যাকুরিয়াম। সমুদ্র তীরে ঝাউ নারিকেলের বন, বালিতে মাথা তুলেছে কাজু বাদামের সবুজ হলুদ ঝাঁকড়া গাছগুলো। এখন ফল নেই। ওদের ফল ধরে সেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে।

ত্রিবান্দ্রম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এই এ্যাকুরিয়াম পরিচালনা করা হয়। রবার ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে রাস্তাটা গিয়ে এ্যাকুরিয়ামের সামনে বেঁকেছে।

এই রবার ফ্যাক্টরীরও বেশ নাম আছে সহরে। নানা ধরণের জিনিসপত্র তৈরি হয়, এখানে বিনিকুশন থেকে নানাকিছু সৌখীন জিনিসও তৈরি হয়, মোটামুটি অন্য প্রডাকশন্ ছাড়া।

···এ্যাকুরিয়ামের ছুটো জোন প্রধান ভাগ।

দর্শনী বোধহয় কুড়ি পয়সা।

ইতিমধ্যে নেত্যবাবুকে দলবল সমেত ওখানে দেখলাম, একটা গাছের নীচে বসে কাজুবাদাম ভাজা আর কফি খাচ্ছে। কাজুবাদাম এদিকে অনেক জায়গাতেই মেলে। দর প্রায় দশ টাকা কোথাও বারো টাকা কিলো। তাও এসব কাজুবাদাম গাছ থেকে পাড়ার পর ঠিকমত খোলা ছাড়ানোও নয়, উপরে বালি রং এর খোলাটা ভাঙ্গার ফলে বাদামের গায়ে পুড়ে পুড়ে লেগে রয়েছে, স্বাদও তেমন ভালো নয়।

কাজুবাদাম বলতে এদিকে এই বস্তুই মেলে।

বিজয় মাষ্টার বলে—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

বিমলদা জবাব দেয়—ঘুরছিলাম এমনিই। কফি কেমন মাষ্টার ?

বিমলদার কফির তেষ্টা পেয়েছে। বলি—এখান থেকে বের হয়ে কফি খাওয়া যাবে সহরে গিয়ে।

—অগত্যা !

ইলাও তাগাদা দেয়—দেরী হয়ে যাবে যে।

এ্যাকুরিয়ামে জ্যান্ত মাছ সামুদ্রিক প্রাণী দেখার তার কৌতূহলের শেষ নেই।

বিমলদা বলে—না দেখেছো এই ভালো, দেখলে হতাশই হবে। তবু বলছ যখন চলো।

ডান হাতের ঘর খানায় চারিদিকে কাঁচের আধারে রকমারী রঙীন মাছ সাজানো। ছোট ছোট এক একটি রাজ্য, জলের মধ্যে আলোর ব্যবস্থা আছে।

বলে উঠি—এ যে সব সখ করে পোষার মাছ।

—তাই !

ছোট বড় বড় নানারকম-এর রং আর আকারের রঙীন মাছ। কোনটা টাইগার ফিশ, কোনটা গোল্ডেন এ্যাস, কোনটা কালো ঝিশমিশে

এইটুকু। কোনটার বা আবার রং বদলায়। নানাজাতের নানাদেশের আমদানী করা মাছ। মাঝখানে চৌবাচ্চার মত করা। তাতে রঙীন টালি সেট করা। ওতে নোনা জলের সাধারণ ভেটকী, পার্শের মত কিছু মাছ আছে।

—এইমাত্র!

ইলা হতাশই হয়। জন বলে—ওপাশের হলে কিছু সমুদ্রের মাছ আর প্রাণীও আছে।

এখানটায় মূল্যবান সংগ্রহ কি রয়েছে। ঘরের ভিতরটায় আলো অনেক কম, মৃদু এবং স্নিগ্ধ। জন বলে—গভীর জলের জীব ওরা, আলো ঠিক সহ্য করতে পারেনা, তাই ঘরেও আলো কম, আর ওই কাঁচের কেসের কাঁচগুলোও রঙীন আর পুরু। কোন কোন পাত্রে জলের সঙ্গে এয়ার প্রেসারেরও ব্যবস্থা আছে। একটা চাপ যাতে তৈরি হয়।

এখানে নানাজাতের ভেটকী, সি টরটইজ, সি হর্স ষ্টার ফিস্, শার্ক ইত্যাদি সামুদ্রিক জগতের কিছু প্রাণী রয়েছে।

ইলা বলে—এসব জলও তো নোনা?

নিশ্চয়ই। সমুদ্রের জলই পাইপে আনার ব্যবস্থা আছে। ওরা নোনা জল ছাড়া বাঁচতে পারে না।

—চুপ করে দেখছি।

ইলা বলে—মনে হয় বিচিত্র এক জগৎ থেকে বের হয়ে এলাম।

—সত্যি!

—ও জগতে চোখের আড়ালে, সমুদ্রের অতলে। তবু সেখানে কি বিচিত্র জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে কে জানে।

ইলা হাসে—অনেক কিছুই আছে, যার কোন সংবাদই আমরা জানিনা।

বিকেলের আলো পড়েছে। বিমলদা বলে—এইবার এক রাউণ্ড কফি অরগানাইজ করতে হবে ভায়া। তারপর দেবদর্শন ওই

পদ্মনাভস্বামী মন্দির বসে—তারপর মিঃ জনের জিম্মায় আমরা। তবে কফি ফাষ্ট।

জন বলে—তাই ভালো, আজ সন্ধ্যায় একটা নাচের আসরে যাবে? কথাকলি অনুষ্ঠান।

ইলা খুশী হয়। অরিজিন্যাল কথাকলি অব কেরালা?

বিমলদাই জবাব দেয়—আজ্ঞে কথাকলি কেরালারই নিজস্ব নৃত্যকলা। মিঃ জন মেনি থ্যাঙ্কস্। কেরালার কথাকলি দেখবোনা এটা কথা হ'ল? তাহলে কাল সকালেই বীচে যাবো; জন সায় দেয়।

—ওই দিকেই আমার বাড়ি, কাল বীচে স্নান করে আমার ওখানে লাঞ্চ খাবে।

ইলা বলে,—ওতো আপনার রাইটারের নেমতন্ন।

অপ্রস্তুত হয় জন—না, না। তোমাদের সকলেরই।

বিমলদা পৈতে বের করে আশীর্বাদ করে।

—তবে কল্যাণ হোক বৎস জন। আপাততঃ কফি আর সামথিং।

ফাঁকা সমুদ্রতীরে বৈকালের আলো নেমেছে। নারকেল গাছগুলোর পাতায় এসেছে ঝড়ের মাতন। সাদা বালিয়াড়ির পর শুরু হয়েছে নীল জলরাশির বিস্তার, বাতাসে আরব সমুদ্রের কলতান ওঠে।

ছোট কফির দোকানে ভিড় নেই। বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কাউন্টারে চকচকে ষ্টেনলেশ ষ্টিলের ছোট গেলাস আর বাটিতে করে দুধ আর কফির লিকার দিয়ে তৈরি পানীয়। পাশে কলাপাতায় ভাজা গরম বড়া, আর পটেটো চিপস্ এর মত কাঁচকলা ভাজা।

—মুখে দিয়ে ভালোই লাগে। ঝাল অবশ্য ঠিক আছে। জন কোত্থেকে সেই সঙ্গে একটু লেবুর আচার আনে। ইলা তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকে।

—মন্দ লাগছে না তো? কিসে ভাজা?

জন জবাব দেয়—কোকোনাট ওয়েল! এদিকে ওটার চলনই বেশী। বলি—এ ভালোই, আমিও উলবেড়িয়ার মফঃস্বলে এক

জায়গায় সাহিত্যসভা করতে গিয়ে টাটকা নারকেলের ভাজা গরম লুচি খেয়ে ধরতেও পারিনি।

বিমলদা যোগান দেয়—পরের পেলে আমি টিনচার আইডিনও খেতে পারি। সাহিত্য কম্মো করে নারকেলে ভাজা লুচি খেয়েছো কি আর কম্মো করেছো বাবা!

কফিটাও চমৎকার। পান্‌সে নয়। তারপর জুটেছে খিলি পান। দক্ষিণে দেখেছি দোকানে পানের পাতা বিক্রী হয়, তাকে বলে বতৈলেতি। চূণ আলাদা পাত্রে থাকে, আর সুপারী ইত্যাদি রেডিমেড মশলা ছোট ছোট কাগজের মোড়কে বিক্রী হয়, তিন পয়সায় কোথাও বা পাঁচ পয়সা দরে।

খিলি পানকে এরা বলে কিল্লিয়া—কোথাও বলে বিড়িয়া; সেটা অনেকটা গোল—আর রঙীন নারকেল কুচিও দেওয়া থাকে তাতে। পান আর কিল্‌লিয়া নিয়ে গোলমাল প্রায়ই ঘটেছে। এবার কি বাতচিত হ'ল কে জানে, জন দেখলাম নিরাপদেই কয়েক খিলি পান এনে হাজির করল।

ত্রিবান্দ্রম সহরের বেশ খানিকটা উঁচু প্রশস্ত জায়গাতে ত্রিবান্দ্রমের বিখ্যাত মন্দির-এর দেবতা পদ্মনাভস্বামী। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত এই দেবতা।

বিমলদা ওর উঁচু চূড়া—গোপুরমের দিকে চেয়ে বলে—ও জন। এযে সে একই ষ্টাইল। দ্রাবিড় সংস্কৃতির পরিচয়। হাসে জন।

—ঠিক ধরেছেন। কেরালার নিজস্ব রীতিতে তৈরি অনেক পুরনো—আধুনিক মন্দিরও আছে। তবে এখানেও দ্রাবিড় রীতির নমুনা আছে। এই পদ্মনাভস্বামীর মন্দির আরও দক্ষিণে কন্যাকুমারীর পথে পাবেন শুচিন্দ্রম মন্দির। তবে এর ভিতরের কাজকর্ম দেখবেন মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলের রীতি থেকে পৃথক।

বিরাট মন্দির, প্রায় সাত একর জমির উপর এই মন্দির। সীমা দৈর্ঘ্যে ৫৭০ ফিট প্রস্থে ৫১০ ফিট। সামনের গোপুরমের উচ্চতাও

১০০ ফিট, সাততলা এই গোপুরমের নীচের দিকে গ্রানাইট পাথরের খোদাই করা মূর্তি, উপরের দিকে চুণ বালির মূর্তি, পুরাণের নানা কাহিনী মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইলা চমকে ওঠে—উপরের সাতটা কুম্ভ দেখেছেন? ঝক্ঝক্ করছে।

জন বলে—ওগুলো সব সোনার। প্রহরীর বহর দেখছেন না?

মন্দিরের ভিতরে বিরাট মণ্ডপ, এর স্তম্ভ সংখ্যা ৩২৪টি। ৪৫০ ফিট লম্বা—প্রস্থে প্রায় ৩৫০ ফিট! স্তম্ভগুলো সবই গ্রানাইট পাথরের। স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা রয়েছে দীপহস্তে নায়ার বালিকা, স্তম্ভশীর্ষে সিংহমূর্তি।

এই মণ্ডপে নাকি প্রত্যহ এখনও বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয় মন্দির থেকে। প্রশস্ত মণ্ডপের চারদিকে চারটে ছোট মঞ্চ। ওখানে পুরাণের কাহিনী পাঠ করা হয়। ওসব বৃত্তির জন্য চাকিয়ার নিযুক্ত আছে। তারাও ব্রাহ্মণ, ওই পঠন-নৃত্যগীত তাদের অন্যতম পেশা।

ওপাশে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে দীর্ঘ ধ্বজস্তম্ভ, পাশেই মণ্ডপটির নাম কুলখের মণ্ডরাম।

মূল দেবতা ছাড়া কৃষ্ণ, ক্ষেত্রপাল, শষ্ঠ, নরসিংহ ব্যস শিব, গণেশ, রামসীতা অনেক দেবদেবীই রয়েছেন।

অন্য মন্দিরে দেখেছি প্রদীপের ব্যবস্থা তেমন নেই। বাইরে মণ্ডপের চত্বরে আলোর সমারোহ, দেবতার কাছে দুএকটা প্রদীপমাত্র, এখানে মূল গর্ভগৃহের দুই পাশে পাথরের ব্রাকেট মত করা দীপদান, সেখানে স্তরে স্তরে বাতি জ্বলছে।

—পদ্মনাভস্বামীর এই মন্দির ১৭২৯ সালে সংস্কৃত হয়েছিল, ওই বিমানও তখন তৈরি করা হয়। ১৯৩৪ সালে মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড ঘটার পর আবার মন্দিরের অনেক অংশ নোতুন করে তৈরি করা হয়েছে আগেকার শিল্পশৈলী অবলম্বনে।

তবু বিমলদা বলে।

—তবু এ মন্দির দেখে মনে হয় দক্ষিণ ভারতের মন্দির থেকে এর স্বরূপ কিছু কিছু আলাদা। আর যেটা বদলেছে এরা সেটুকুতে ভালোই হয়েছে। একে বলা যেতে পারে দ্রাবিড় আর কেরল-এর মিলিত স্থপতি।

আলো জ্বলে উঠেছে। মন্দিরের বাইরে আমরা এলাম। দর্শন-প্রার্থী জনতার ভিড় বাড়ছে। অনেকেই বোধহয় দিনান্তে এখানে দর্শন করতে আসে।

জন বলে—এই পদ্মনাভস্বামীতে একটা শোভাযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায় প্রায় দুশো বছর আগে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা মার্তণ্ড বর্মাকে গুপ্তঘাতকরা হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবাদ এই দেবতাই নাকি রাজাকে রক্ষা করেছিলেন। তারপর থেকে সেই মহিমায় কাহিনীর অভিনয় হয় উৎসবের মধ্য দিয়ে। দেবতা তীর দিয়ে গুপ্তঘাতককে হত্যা করেন।

ইলা অবাক হয়ে শোনে—তাই নাকি! তবে শোভাযাত্রা কিসের, —এসব কাহিনী। দেবতা হত্যা করেছেন অতএব তাকেও পাপমুক্ত হতে হবে। তাই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে স্বয়ং মহারাজা খালি গায়ে ধুতি পরে দেবতাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যান। তিনি তখন পদ্মনাভ দাস, দেবতাকে মহাসমারোহে স্নান করিয়ে আবার মন্দিরে এনে অভিষেক করানো হয়।

এই শোভাযাত্রায় ত্রিবান্দ্রমের দর্শনীয় বস্তু। সাজানো হাতী, ঘোড়া সৈন্য দল—নায়ার ব্রাহ্মণরা রাজকর্মচারী জনসাধারণ সকলেই যোগ দেয়। নানান বাজি বাজনাও থাকে। সে এক এলাহি ব্যাপার।

ক্লান্ত হয়ে গেছি। কফি নয় বলি-কটি নয় এবার শকৃপাড়ু কিছুর দরকার দাদা। নাহলে নাচের আসরে বসে কথাকলি দেখার মেজাজ থাকবেনা।

একটু চেষ্টা করে বাজারের ওদিকে এসে একটা রেষ্টুরেন্ট দেখে এগিয়ে যাই। ননভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁ। পণ্ডিচেরীর কথা মনে এখানে সস্তায় ফিসফ্রাই, ফিস কাটলেট মেলে।

জীবনের সঙ্গে কাজের কথাও কিছু হয়নি। এতক্ষণ কিছু হয়নি। এতক্ষণ কেবল ঘুরেছি মাত্র। এবার শান্তিতে একটু বসে বলা যাবে।

জনই অর্ডার দেয় ফাউল্স কাটলেট আর ব্রেড উইথ বাটার।

শার্কফিস না হয় অন্য মাংসের অস্তিত্ব ও জানে। এখানে মাংস সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি নেই। ওদের মতে বোধ হয় মাংস যারা খায় তাদের নর মাংস খেতেই বা আপত্তি কি অবশ্য শরীরে যদি সয়।

কাছাকাছি ছবি তোলার ষ্টুডিও বলতে কোয়েম্বাটোর, না হয় মাদ্রাজ, তাছাড়া বোম্বে তো আছেই। কোয়েম্বাটোর ; না হয় মাদ্রাজ, তাছাড়া বোম্বে তো আছেই। কোয়েম্বাটোরেই কাজ করছে জন। কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এসেছে।

জন বলে—এসে ভালোই হয়েছে তবু আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল।

রাস্তায় এদিক ওদিকে একটা ছবির পোষ্টার দেখলাম, চেমিন্।

জনবলে—খুব নামকরা উপন্যাসের মালয়ালম চিত্ররূপ বর্তমানে এখানে হচ্ছে না, নইলে আপনাকে দেখাতাম। বেশির ভাগ ছবিই এখানে তামিল, বাইরে থেকে আসে। মালয়ালম্ ছবির মান অনেক উঁচু তাছাড়া এর জোনও খুব ছোট। তামিল আর হিন্দী ছবি একে কোণঠাসা করেছে।

—আমাদের যেমন করেছে হিন্দী ছবি।

হাসে জন। আপনাদের বাংলা সাহিত্য, বাংলা ছবির প্রাণশক্তি অনেক বেশী, সারা বিশ্বের দরবারে তাই স্থান আছে, তাই হিন্দী-ওয়ালারা ছবি বানায়, আর বাংলা দেশ ছবি সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেনের ছবি দেখেছি ওই কথাই মনে হয়েছে। বোম্বেতেও বাঙালীর প্রাধান্য ছবির জগতে, মাদ্রাজ যদি সর্ব ভারতীয় পাল্লায় নামে, তাকেও বাংলার স্মরণ নিতে হবে।

ইলা কাটলেটে ছুরি বসাতে বসাতে বলে।

—মন্দ করেনি এটা। মাদ্রাজে এসে অবধি এ সবের মুখ দেখিনি। কোথাও যদি বা মেলে খাবার সময় মেলেনি। তবে ঝালটা একটু কম দিলে পারতো! শশা আছে? টম্যাটো সস্!

জন বলে—বাংলা দেশও নাকি খুব লঙ্কা খায়?

বিমলদাকে দেখিয়ে বলি—উনি খান! খাস বরিশাল কিনা? পুরো বাঙ্গাল। ছেলে ডালে লঙ্কা কম দিয়েছিল বলে ওর দেশের কোন মহাজন তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল।

হাসতে থাকে জন। বিমলদা খেতে খেতে বলে।—আর ওদের পোস্ত আছে তোমার দেশে? দিয়ে দেখো কিরকম ভাত টানে।

চাঁদনী রাত। সহরের উপকণ্ঠ প্রায় জনহীন। পিচ ঢালা রাস্তার ধারে দু'একটা নারকেল গাছের 'প্রহরা ঘেরা বাড়িতে আলো জ্বলছে। সহরের মধ্যে একটা ক্যানেল সমুদ্র থেকে ওটা জনপদের দিকে চলে গেছে। নারকেল গাছগুলো ওকে মালার মত ঘিরে আছে, চাঁদের আলোয় ওই নারকেল গাছ খালের জল স্বপ্নময় বলে মনে হয়।

দু'একটা নৌকা চলেছে ওর বুকে।

ওটার উপর দিয়ে ব্রিজ চলে গেছে, শান্ত স্তব্ধ অর্ধ পল্লীর আসরে গিয়ে হাজির হলাম।

একটি বিদ্যায়তন বলেই মনে হ'ল। নারকেল পাতা আর কাঁদি শুদ্ধ কলাগাছ দিয়ে ওর মণ্ডপ সাজানো।

একপাশে তানপুরা বেহালা মৃদঙ্গ আর বাঁশীও রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক মেয়ে পুরুষ সেখানে ভিড় জমিয়েছে।

বাঁধান চত্বরে আসর বসেছে।

এগিয়ে আসেন এক ভদ্রলোক। কপালে চন্দনের তিলক, কানে সোনার কুণ্ডলের মত। হাত তুলে নমস্কার করে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

কি একটা উৎসব উপলক্ষে তারাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন

করেছেন। অংশ গ্রহণ করছে ত্রিবান্দ্রমেরই একটি সম্প্রদায়। এরা সকলেই প্রায় অপেশাদার। তবু ভারত নাট্যম বিশেষ করে কথাকলি নাচের চর্চা এরা করেন নিয়মিত।

গুরু স্বামীই কথাগুলো বলে চলেছেন, কেরালার এই নৃত্যশিল্পের কথা এককালে জনও ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল, নাট্য পরিচালনাও করেছে ওদের হয়ে।

গুরুস্বামী বলেন,

—কথাকলি নাচ কতদিনের সঠিক পাওয়া যায় নি, অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাও হয়নি। তবে কাছেই ত্রিবিক্রমঙ্গলম মন্দিরের গায়ে দুটো প্রস্তর চিত্র আছে, অনুমান দ্বাদশ শতাব্দীর, তাতে দেখা যায় নিপুণ নৃত্যরতা একটি মেয়ের ছবি। এ ছাড়াও ওই মন্দিরেই অনুমান একাদশ শতাব্দীর তৈরি দুটি নৃত্যরতা মূর্তি দেখা যায় একটির ভঙ্গী, কুদাই কুট্টু, ছত্রধারিণী নৃত্য, অন্যটি কুদমকুট্টু, পাত্র নিয়ে নৃত্য।

তারপর ধরুন জাভা বালি দ্বীপের যে নৃত্য। অবশ্য ওদেশের পটভূমিকায় অনেক বদলেছে, নিজস্ব রূপ নিয়েছে। কিন্তু মূলতঃ তা এই দক্ষিণ ভারতের নাচেরই রূপান্তর, বিশেষ করে কথাকলির ভঙ্গীরই সেই নাচ।

ইলা ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে বসে গেছে, কিছু মেয়েদের সঙ্গে জমিয়েও নিয়েছে। মঞ্চে যবনিকা টানা আছে।

কলরব ওঠে—মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে সেজেগুজে ইলাও গল্প জুড়েছে তাদের সঙ্গে।

গুরুস্বামী ইতিমধ্যে কফি আনিয়েছেন, কফি আর সেওভাজা।

অপ্রস্তুত হই এসব কেন?

—অতি সামান্য আয়োজন।...গুরুস্বামী বিনীতভাবে জানান।

—তার কথাগুলো ভালো লাগে।

—দক্ষিণ ভারতের প্রধান নৃত্য ভারত নাট্যম এ দেশেও প্রচলিত হয়। এখানে জনসাধারণের মধ্যেও নিজস্ব কিছু গ্রামীণ নৃত্যকলা

ছিল, সেই আদিম নৃত্যের কিছু ধারা এখনও অব্যাহত আছে, তা ভারত নাট্যম থেকে বিভিন্ন। অম্বাল পূজার উৎসবে আজও এদিকে ওনম্ নাচ হয়ে থাকে তা প্রাণবন্ত ছন্দময়।

কথাকলি যা আজ প্রচলিত হয়েছে তা মূলতঃ ভারত নাট্যম আর এই কেরালার গ্রামীণ নৃত্যের সংমিশ্রণেই।

বলি—তা হয়তো সত্যি। সব কিছুরই রূপান্তর ঘটে, বিবর্তন ঘটে।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলে সে অপরের ভালো জিনিষের সঙ্গে নিজস্ব ভালোটুকু মিশিয়ে আরও উন্নত ধরণের কিছু শিল্পসৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

গুরু স্বামী বলেন—

—কি রূপ নিয়েছে তা দর্শকরাই বলবেন। তবে এই বিবর্তনের মূলে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রয়ে গেছে। কেরালায় পরবর্তীকালে একটা যোদ্ধাজাতিতে পরিণত হয়েছিল, তার জন্য তাকে 'কল্‌রিজ' অর্থাৎ ব্যায়ামও করতে হ'ত। নাচের একটা ধারার মধ্যে এই পরিশ্রমসাধ্য দুরূহ অঙ্গও যোজনা হয়েছিল, এর নাম যাত্রাকলি বা শাস্ত্র কলি, এখনও কথাকলির একটা অঙ্গ হিসাবে এ ধরণের নাচের অনুষ্ঠান বিশেষ ক্ষেত্রে হয়।

এরই অন্য একটি অঙ্গ ভেল্‌কলি; এই নাচে তরবার ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণ নায়াররা এখনও মহারাজার দেবতা পদ্মনাভ স্বামীর ওখানে এর অনুষ্ঠান করেন। এতে মহাভারতের কাহিনীকারও রূপায়ণ করা যায়। একদল সাজে কৌরব অন্য দল পাণ্ডব।

শেষে পাণ্ডবদেরই জয় হয়।

এই মহাভারতের কাহিনী খুঁজতে গিয়ে তারা সংস্কৃত শাস্ত্রও পড়েন, তার ভাবও আনেন, প্রথমে এসব হতো সংস্কৃত ভাষায় পরে মালয়ালম ভাষাতেও এই নৃত্যের সঙ্গে আবৃত্তির সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে এই নৃত্যকলাকে উন্নত করার জন্য ভারত মুনির নাট্য শাস্ত্র থেকে

রীতি প্রকৃতি অনুধাবন এবং প্রয়োগ করেন। তাকে নিজস্ব ধারায় শাস্ত্র সম্মত সুধীজন গ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা হয়।

এই সময় ভারত নাট্যম এর খামরিগুলো তাঁদের চোখে পড়ে। ভারতনাট্যমে তখন সুর এবং কাহিনীর অভাব ছিল। দেহের ভঙ্গিমা এবং পায়ের কাজ আর সুর তাল লক্ষ্য নিয়ে তাদের নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছিল।

ভারতনাট্যমে মূলতঃ দুটি রসেরই প্রাধান্য ছিল, লাস্য এবং তাণ্ডব।

পুরাণ সংস্কৃত গ্রন্থ পদ্ধতি থেকে কাহিনীর রস আহরণ করে নৃত্যের লাস্য ছন্দ এবং ভাবের মধ্য দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয় প্রথম এই কথাকলি মাধ্যমে।

তখন অবশ্য এই নাচ সীমিত ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে। তারাই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তারা চাক্‌কিয়ারস্‌ নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে এই নাচ শেখান, তাদের স্ত্রীরাও এই নাচে অংশ গ্রহণ করতো, তাদের বলা হোত 'নাগিয়ারস্‌'।

তখন এই নাচ কেরালার মুক্ত অঙ্গনেই পরিবেশিত হতো, ক্রমশঃ সংস্কৃত শাস্ত্র অনুযায়ী মঞ্চ ওপরে ওঠে, আলোর সাহায্যও নেওয়া হতে থাকে। নাচের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা হোত মুদ্রা এবং বিভিন্ন ভাবের মাধ্যমে। নৃত্যম্‌-গীতম্‌-বাদ্যম্‌ এই তিনটি উপকরণই যোগ করা হোল, সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে।

এই বিবর্তনের প্রথম প্রচলন দেখা যায় ত্রিবাঙ্কুরের কুড়িয়াত্তম্‌ নৃত্যে। এতে দুজন নৃত্য শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন, পিছনে থাকে কণ্ঠসঙ্গীত।

ক্রমশ উত্তর মালাবারের জামোরিণ (প্রধান)-রাও এই নৃত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন।

ওদিকে নৃত্যানুষ্ঠানের শুরু হতে দেরী নেই।

বিজলী বাতি এখানের পল্লী অঞ্চলে এসেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, তবু অঙ্গনের চারিদিকে চাঁদের আলোর বন্যা ডেকেছে।

বাতাসে কাঁঠাল ফুলের উদগ্র সুবাস, ফেলে আসা বাংলার কথা মনে পড়ে।

গুরুস্বামী বলেন—এই সময় কেরালায় প্রবর্তন হয় জয়দেবের গীতগোবিন্দকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনাট্যম্।

—জয়দেব, বাংলার কবি জয়দেব এলেন এখানে?

—তাতে দোষ কি? এই কৃষ্ণকীর্তনে নৃত্যশিল্পী শুধু নৃত্যকলা নিয়েই থাকবে, পেছনে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করে অন্য শিল্পীরা। তাতে নৃত্যাঙ্গ আরও সুষ্ঠু ভাবব্যঞ্জক হয়। দুটি ধারার সংমিশ্রণে নৃত্যানুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

এই রীতি প্রচলনের পর থেকে কথাকলি নাটকে যারা নিজেদের আওতায় রেখেছিলেন, তারা সরে যেতে বাধ্য হলেন।

কথাকলি ছড়িয়ে পড়ল কেরালার গ্রাম জনপদে। তবে বর্তমানে যা দেখছেন তা কৃষ্ণকীর্তনম, ওই-ই নয়, মহাভারত রামায়ণকে কেন্দ্র করে রচিত। এই ধরণের নৃত্যনাটকের প্রথম রচনা করেন মহারাজা কার্তিক থিরুনল, মহারাজ উথারাম থিরুনল। আরও অনেক কবি।

প্রশ্ন করি—তবে মুখোশ, বিচিত্র সাজ পোশাক, বীভৎসরূপ—হাতের নখগুলো পর্যন্ত বড়, এসব দেখানো হয় কেন?

গুরুস্বামী বলেন—ওখানেও কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দেবদেবী অসুর এরা অমিত শক্তির অধিকারী, সাধারণ মানুষের চেহারার মধ্য দিয়ে সেই তেজ বিক্রম লাস্য ফোটানো যায় না। তাই এ কল্পনার অবতারণা। কৃষ্ণ রামচন্দ্র এদের মেক্‌আপ এক ধরণের। অসুরদেব রূপ অন্য ধরণের, তাদের চোখের ভ্রূ লাল রং এর হাতের নখগুলো ধাতুর তৈরি, দীর্ঘ; মেয়েদের পোশাক, রূপ মেকআপও পৃথক ধরণের।

মৃদঙ্গম বাজছে দ্রুতলয়ে। স্পষ্ট তার বাণী; দুরূহ তালের সেই সঙ্গতে নিপুণ শিল্পী অতিসহজ সাবলীল ভঙ্গীতে নৃত্য করে চলেছেন।

মঞ্চের যবনিকা ওঠে, দেখা যায় সামনে জলছে একটি বড়

পিলসুজের মত বাতিদানে অনেকগুলো বাতি। পিছনে নাটকের সঙ্গীতাংশ আলাপ করে চলেছে কণ্ঠ শিল্পীর দল।

নাটকের পাত্রপাত্রীরা সেই সঙ্গীতের তালে ভাব মুদ্রা এবং পদক্ষেপে নেচে চলেছে। প্রচুর সাধনা এবং পরিশ্রমের এ নৃত্যকলা।

মুদ্রাও বহুরকমের। গুরুস্বামী বলেন—চব্বিশটি প্রাথমিক মুদ্রায় চারশো চার রকমের ভাব পরিস্ফুট করা হয়, চল্লিশটি মাধ্যমিক মুদ্রা প্রকাশ করে। পঞ্চান্নটি ভাব। মোট চারশো উনষাট রকমের ভাব প্রকাশ করার রীতি রয়েছে। তাছাড়া গ্রীবার ভঙ্গী, চোখ এবং ওষ্ঠও বাদ যাবেনা; হাতের ওই হংসপক্ষ মূর্তি মুদ্রা দেখছেন ওই দ্বারা অন্ততঃ তিপান্ন রকমের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। সেটা নির্ভর করে শিল্পীর কৃতিত্বের উপর। তাছাড়া শৃঙ্গার, বীর, করুণা অদ্ভুত রুদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস এবং শান্ত এই নবরসই পরিবেশন করতে হয় এই নৃত্য ভঙ্গীতে। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ-অঙ্গসঞ্চালন, চোখের ভাষা, গ্রীবা হাতের মুদ্রা সবই নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।

—নাচের অপরূপ রূপায়ণ দেখেছি। মণ্ডপের চারিদিকে নারকেলবীথি মর্মরে চাঁদের আলো কি স্বপ্ন জাল রচনা করেছে। মানুষের সৃষ্টি আর ঈশ্বরের মহাকাব্য জুয়ে মিশে সারা মনে বিচিত্র একটি সাড়া তুলেছে।

—মনে হয় বাংলা থেকে প্রায় আঠারোশো মাইল দূরে আমি নেই, এসেছি শিল্পীর সাধনার রাজ্যে। প্রকৃতি মানুষ এখানে একাত্ম হয়ে কোন মহাদেবতার উদ্দেশ্যে তার নৃত্যসম্পদ নিবেদন করছে, সেই মধুমেলায় আমি নগণ্য দর্শক মাত্র।

গুরুস্বামী বলেন—বারো চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েদের এই নৃত্যকলা শেখা শুরু করে, অন্ততঃ ছ-বছর কঠিন নিষ্ঠা একাগ্রতার সঙ্গে সাধনা করার পর সে এই বিদ্যা কিছুটা আয়ত্ব করতে পারে।

নাচ শেষ হয়ে গেছে।

তখনও কানে চোখের সামনে সেই পরিবেশের সুর রয়ে গেছে।

এবার ফেরার পালা।

ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে হেঁটে সেই খালের ব্রিজটা পার হয়ে এলাম।

শান্ত স্তব্ধ জনপদ।

—কেমন দেখলেন? জন প্রশ্ন করে।

তখনও বিচিত্র রাজ্যে রয়েছি। জবাব দিলাম।

—আজ মনে হয় এ জিনিস এই চাঁদের আলোভরা ওই নারকেল-কুঞ্জ, এখানের মানুষ, না দেখলে আমার কেরালায় আসা অর্থহীন হয়ে থাকতো। একটা বাগি মিলে গেল, স্টেশনে যাবে।

জন বলে—আপনারা চলে যান, আমার পথ এই বাঁদিকে। বেশী দূর নয়। কাল সকালে আবার দেখা হবে। গুড নাইট। কাল দুপুরে কিন্তু আমার বাড়িতে—

বিমলদা বলে—লাঞ্চের কথা ভুলিনি জন! কাল সকালে দেখা হবে।

শুভরাত্রি।

—চাঁদের আলোভরা পথ দিয়ে গাড়িটা চলেছে। শক্ত রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ ওঠে।

গাছে গাছে চাঁদের আলো, নারকেল কাঁঠাল গাছের বনে ঝিঁ ঝিঁ পোকা জ্বলছে। ইলা বলে—দেশের মানুষ পরদেশীকে আপন করে না নিলে সে দেশের অন্তরকে চেনা যায় না। আজকের দিনটা সত্যি ভালো লাগলো। এ সন্ধ্যা স্মরণীয় সন্ধ্যা!

চুপ করে রইলাম। পুলক গান গাইছে।

—নেমেছে নিবিড় ছায়া ঘন বন শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

স্টেশনে ফিরতে রাত্রি হয়। শেষ গাড়িও এসে গেছে। প্ল্যাটফরম নিরঝুম। ওদিকের শেডে আমাদের গাড়িতে ব্যাটারি চার্জার থেকে কনেকশন দিয়ে আলো জ্বালা রয়েছে।

বিজয় মাষ্টার একবার আমার দিকে চাইল।

ইলা ওকে যেন দেখতেই পায়নি। গুণ গুণ করে কি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাড়িতে উঠে গেল। বিজয় মাষ্টার ধরেছে পুলককে।

—কোথা যাও হে ছোকরা? সারা সহর তো মাতিয়ে বেড়াচ্ছো।

বলে পুলক—তার কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে? আপনার ছাত্রছাত্রী কিছুই আমি নই।

নেত্যবাবু ফোড়ন কাটে, তাই বলে এত রাত করবে, বিদেশ জায়গা, জবাব দিলাম না। সন্ধ্যার সেই পরিবেশ আর মেজাজটা নষ্ট করতে চাই না। নেত্যবাবু তখনও গজ গজ করছে।

—কিই বা আর আছে এখানে দেখার এই তো জায়গা, না আছে তেমন ঠাকুর দেবতা।

না বটে তীর্থস্থান। দেখবো কি! শুধু শুধু এখানে দুটো দিন বসে ভেরেণ্ডা ভাজবো?

বিজয় মাষ্টার বলে—যা বলেছেন। নামেই কেরালা হেন তেনের দেশ! সব গুবলেট হয়ে গেছে মশাই, নাচফাচ ডকে উঠেছে। শিল্পকলা আর রাজনীতি মাথায় ঢুকলে সব ভুলে যায় মানুষ। এখানেও তাই হয়েছে। তবে দেখলাম বটে ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও এখানে বেশ ফরোয়ার্ড। আর ইংরাজীও জানে।

বিজয় মাষ্টারের কথায় সরখেল মশাই শুধোয়—ছাত্র-ছাত্রী করবেন নাকি মশায়? শুনেছি এরা বেশ কাঠখোট্টা, বাংলাদেশের মেয়েদের মত লবঙ্গ লতিকা মার্কা নয়।

বিমলদা বলে—বাংলার মেয়েরা এখন আর লবঙ্গ লতিকা মার্কা নয় সরখেল মশাই, নিজের ঘরেরটিকে দেখে সে ভুল ভাঙ্গল না।

সরখেল চুপ করে গেল। এবার ফুঁসে ওঠে নেত্যবাবু।—মানে। জরু জমিন ধান তিন বশে আন। বশে আনবার মত তাগদ থাকা চাই। ঘরের বৌকে এমন শায়েস্তায় রাখবেন যে টুঁ-টি করতে ভয় পাবে। কই রে মশাই আমরাও তো এতকাল স্ত্রী নিয়ে ঘর করছি,

কোনদিন একটু বেসহবৎ পরপুরুষের সঙ্গে হেসে কথা বলা, এসব দেখেছেন ?

সুরপতি হাতপা ধুচ্ছিল, জবাব দেয়—অ নেত্যদা, আপনার উনি স্ত্রী নয় ইস্ত্রি। আপনাকেই যে রকম আড়ং ধোলাই দিয়ে রগড়াচ্ছেন —তাতে আপনি বলেই টিকে গেছেন। অন্য কেউ হলে বৌঠানকে আবার মনের মানুষের খোঁজ করতে হতো।

—এ্যাও! চ্যাংড়ার দল কোথাকার। নেত্যবাবু চটে ওঠে।

রাত্রি হয়ে আসে। কোনরকমে খাওয়ার পাট সেরে বিছানা নিলাম। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর ক্লান্তি আসে তাই শোয়ার সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবতেই পারি না, ঘুমিয়ে পড়ি। গাড়িতেই শোওয়া। দুটো বেঞ্চে দুজন, বাঙ্কে দুজন, আর নীচে দুই বেঞ্চের তলা থেকে ট্রাঙ্কগুলো বের করে লাগিয়ে দিয়ে একজনের বিছানা হয়। কোন-রকমে চলে যায়।

বিমলদা বলে—দুটো দিন রিটায়ারিং রুম নিলি না কেন ? হাত-পা মেলে শুতাম।

সময় পাইনি। যাকগে এতেই চলে যাবে। পরে দেখা যাবে কন্যাকুমারীতে।

সকালেই মুখটুখ ধুয়ে কফি পর্ব সারতে বসেছি, জন এসে হাজির। ইতিমধ্যে সেও তৈরি। পুলকের সঙ্গে ইতিমধ্যে তার বেশ ভাব জমে গেছে। কাল রবীন্দ্র সঙ্গীতও শুনিয়েছেন তাকে পুলক নিজেই।

পুলকই অফার করে—হ্যাভ সাম কফি অ্যাণ্ড ধোসা।

ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে ওদেশের খানা খেতে শুরু করেছি। মন্দ লাগে না। বিশেষ করে ইড্‌লি তো আসকে পিঠেরই সামিল। আমরা তা খাই পায়েস না হয় নলেন গুড় দিয়ে, ওরা খায় ডালবাটা সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা তেঁতুলের ঝোল দিয়ে।

শেষ পাতে কফিটি তাই মন্দ লাগে না।

তাছাড়া ত্রিবান্দ্রমে দেখছি আমও আছে, এ সময়ে পাকা আম

টাকায় ছটা-সাতটা, আর কলার মধ্যে লাল ছোট সাইজের কলা, না হয় হলদে রং-এর বিরাট মুখ সরু কলা এ দেশী মর্তমানও রয়েছে। ভালো মর্তমানের ডজন এক টাকা চল্লিশ পয়সা। আর আছে কাজু-বাদাম ভাজা। ত্রিবান্দ্রমে বেকারীও আছে। তাই কেক পাউরুটি সবই মেলে। ইতিমধ্যে কাজু কিসমিস বাদাম দেওয়া ফ্রুট কেক জাতীয় বস্তু দুই থেকে তিন টাকা পাউণ্ড।

বিমলদা বলে—কাছাকাছিই আছে পরশুরামের মন্দির। বহুকালের পুরাতন মন্দির। মাতৃহত্যার পর কুঠার হাতে সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছিলেন। কন্যাকুমারীর তীর্থে এসে সেই পাপ মোচন হয়, ওর কুঠার পড়ে কন্যাকুমারীর সমুদ্রে, তাই নাকি ওখানের ভাজন ক্ষয় হয়।

জনও সায় দেয়—শুনেছি বটে, ত্রিবান্দ্রম থেকে কোভলাম ন'মাইল। ওরই পথের ধারে ওই মন্দির আছে একটা গ্রামে। দেখে যেতে পারেন।

আজ কথা বিশেষ কিছু নেই, দেখবার জন্য তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। ক'দিন পর আজ বিশ্রাম।

তাই ঢিলেঢালা মন নিয়েই বের হয়েছি আমরা, এ যেন আমাদের কর্মহীন ছুটির দিন।

দোকানপাট খুলেছে। এখানে পানের দোকান মুদিখানা কফির দোকানেও কলা বিক্রী হয়। সস্তা আর মেলেও প্রচুর তাই ওরা সকলেই খায়।

চারিদিকে হাজার হাজার নারকেল গাছ, নারকেল-ডাব একটিও দেখলাম না বিক্রী হতে। জন বলে—এদেশে কচি ডাব পাড়া ধর্মের বেড়া দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে রোগ জ্বালা হলে কথাই নেই, ডাবের জল মেলে নয়তো একটা ডাবের চেয়ে একটা নারকেল নানা দিক দিয়ে মূল্যবান শাঁসে তেল হয়, কিছুটা হয় খাদ্য। মালায় পাউডার কেস বোতাম ইত্যাদি হয়, আর দামীও ছোবড়া।

খুব ঝুনো করে নারকেল পাড়া হয় না, তাতে ভিতরের তারগুলো ছিবড়ে হয়ে যায়। যা নারকেলের খোলা দেখছেন সবই দোমালা।

…ইলাও আজ সঙ্গী হয়েছে। সে বলে—বেড়াতে এসেছি, পথে বেরুতে ভয় ক্লান্তি কোনটাই নেই আমার।

পথের মধ্যে একটা দোকানে ঢুকে কি সব কেক বিস্কুট কেনাকাটা করল সে, পুলকের হাতে চাপিয়ে দেয় কাগজের প্যাকেটটা। পুলক আমতা আমতা করে।

—এসব কি হবে?

ইলা ধমকে ওঠে—ইয়ং ম্যান এইটুকু বোঝা বইতে নারাজ, জীবনের বোঝা বইবে কেমন করে! চল দিকি।

বিমলদা হাসতে থাকে।

—মেয়েদের ওই সুবিধে! তোমাকে এক নিমেষে জীবন দর্শনের তত্ত্ব শুনিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। না হয় ভ্যাঁক্ করে কেঁদে দেবে।

জবাব দিই—মেয়েরা নয়, আজকাল শুনেছি ছেলেদেরই কাঁদতে হয়। সরখেলমশাই তো রীতিমত কান্না-কাটি করে স্ত্রীর পিছনে লেজুর হয়ে থাকবার অধিকার পেয়েছেন।

ইলা বলে—সরখেলমশাই ভীতু, কাপুরুষ তাই ওখানে পড়ে আছে। স্বামীর কোন সম্মান অধিকার যেখানে নেই সেখানে সেই মিথ্যা পরিচয় নিয়ে কোন পুরুষ যে পড়ে থাকতে পারে তা জানা ছিল না।

বাজারে দোকানপাট খুলেছে। কয়েকটা দোকানে নানারকম কিউরিও গোছের জিনিস সাজানো। ইলাই এগিয়ে যায়।

শো কেসে কাঠের হাতি, নানা সাইজের। কেউ বা লগ্‌ টানছে। কোনগুলো ছোট থেকে বড় অবধি সাইজ মত রয়েছে, মোষের সিংহ-এর কারুকরা বাঘ, না হয় অহিনকুল, সঙ্গে নানা কিছু। হাতীর দাঁতের তৈরি নানা জিনিসও আছে।

জন বলে—এসব এখানের শিল্পীদের তৈরি। তবে চন্দন কাঠ এদিকে মেলে না। হয় সেগুন না হয় রোজউডের তৈরি। চন্দন কাঠ

মেলে মহীশূর রাজ্যে। আর আইভরি কাজও এখানের—চমৎকার কাজ।

দোকানদার ভদ্রলোকও এগিয়ে আসেন, আমাদের দেশী! ভিনদেশী ট্যুরিষ্ট বাণিজ্য কিছু হবেই। বলে—রিয়েল আইভরি স্যার। এখানকার আইভরির কাজ পৃথিবী বিখ্যাত। মিউজিয়ামে যে হাতীর সিংহাসন দেখেছেন তা দেখে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড তো মুগ্ধ, মহীশূরের মহারাজা তাই তেমনি একটি হাতীর দাঁতের সিংহাসন তৈরি করিয়ে ইংল্যাণ্ডে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

চমৎকার জিনিস এখানের। ব্রোচ আইভরি রিং!

বাধা দিই ইলাকে।—এখন এসব কিনে কি হবে, ফেরার পথে দেখবো। এখন তো ঘুরতে হবে।.

তাই বের হয়ে এলাম ওবেলায় আসবো প্রতিশ্রুতি দিয়ে। জন বলে—কাঠের কাজ, আইভরি এই সব কাজ এখানের কিছু শিল্পী বংশপরম্পরায় করে আসছে। নেহাৎ বাইরের মার্কেট কিছু আছে, নইলে এদের উপবাসই দিতে হ'ত। এসব সৃষ্টির ব্যাপারে তখন মহারাজাদের দান ছিল অনেক।

এখন তাদের অবস্থা চরে খাও গোছের।

বিমলদা বলে—তা সত্যি। সব কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি, শিল্পকলার অবস্থাও সমান। এমন কি নৃত্য সঙ্গীত অবধি। তাই সেদিন যে মান ছিল আজ জনসাধারণের চাপে পড়ে সেই মান নেমে গেছে। এখন জাতিভ্রষ্ট হয়েছে সে। রাগ সঙ্গীতের ঠাঁই নিয়েছে জাজ মিউজিক।

জনও স্বীকার করে সেটা। ওটা নিছক ঠিক কথাই, বাসটা আসতে আমরা উঠলাম। ফাঁকা বাসই। সহরের সীমা ছাড়িয়ে ওখানে কোডলাম অবধি। বাঁধের কাছেই গিয়ে থামে।

সহর ছাড়িয়ে চলেছি আমরা। পথের দুদিকে ফলন্ত কাঁঠাল নারকেল গাছ। কোনো কোনো আম গাছে আম ফলে রয়েছে, কোথাও বা একদিকের ডালে আমের বোল এসেছে, অন্য ডালে লাল

টুকটুকে আমগুলো ঝুলছে। ঘন কালো পাতায় ঢাকা বড় বড় গাছে ছোট ইঁচড়ের মত এক একটা ফল ঝুলছে।

—ওটা কি ফল?

…এক যাত্রীই ওর কি নাম করল! টুকরো করে কেটে ওইদিয়ে চাটনী তৈরি করা হয়।

ওপাশে সেই ব্যাকওয়াটারের ক্যানেল চলেছে, নারকেল গাছগুলো ঝুইয়ে পড়েছে ওর উপর।…লালমাটি এবার উঁচু উঁচু টিলায় পরিণত হয়।

ওপাশে ছোট্ট সুন্দর একটি গ্রাম। পথের ধারে একটা স্কুল মত, সামনে নারকেল ঘেরা মাঝে মাইক বাজছে, অনেক ছেলেমেয়ে জমায়েত হয়েছে। তার একটু ওদিকেই আমরা বাস থেকে নামলাম। এগিয়ে আসি বসতির দিকে। একটা স্কুলের সামনে এক তরুণ সাইকেল চালাচ্ছে—অবিরাম সাইকেল চালনার রেকর্ড করতে চায় সে।

তাই এই উৎসবের আয়োজন। কৌতূহলী লোকজন ছেলে মেয়েরা ভিড় করেছে তাকে ঘিরে। সে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে।

বলি—আমাদের কলকাতার পার্কে মাঠে এ দৃশ্য দেখা যায় অনেক। মাত্রাজে কোথাও কিন্তু এটা চোখে পড়েনি।

জন বলে—এ দিকে প্রায়ই হয় গ্রাম সহরে।

…আমাদের দেখে অনেকেই চেয়ে থাকে। ওই দলের থেকে ছেলে-মেয়েরা হাসি মুখে হাত নাড়ে।

আমরা সাড়া দিলাম হাত নেড়ে। কেউ কেউ এগিয়ে আসে। ওই স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী এসে ইলার সঙ্গেই কথা বলে।

—ফ্রম বেঙ্গল?

—ইয়েস, কলকাতা থেকে আসছি। কলকাতা যেন ওদের খুব চেনা, তেমনি ভাবেই ঘাড় নাড়ে মেয়েটি। জনকেও সে চেনে, পাড়ার মেয়ে।

জনই পরিচয় করিয়ে দেয়। বাঙালী দেখে তারা খুশী হয়েছে।

আমার দিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকে। কালো রং, মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো, তার খোঁপায় হলুদ ফুল গোঁজা। নিটোল স্বাস্থ্যময় দেহ, সেও এগিয়ে চলে আমাদের সঙ্গে জনের বাড়ির দিকে।

বেশ বাগান ঘেরা সুন্দর একতলা বাড়ি, ওদিকেও অনেকখানি জায়গায় শেড মত করা। রাশি রাশি নারকোলের ছোবড়া ভিজিয়ে পিটানো হচ্ছে। পিছনে খাল থেকে নৌকায় নানা মালপত্র নামছে।

ওদের কয়ের ম্যাটিং দড়ি পাপোষ ইত্যাদি তৈরির কারখানা আছে ওই বাগানে। অনেক লোকই কাজ করে, আজ বড়দিন উপলক্ষে কাজ বন্ধ।

বাড়ি ঘর সাজানো হয়েছে, লাল-নীল বালবও লাগানো হয়েছে।

জনের মা এগিয়ে আসেন। মালায়ালম-মেশানো ইংরাজীতে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানান। ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মানুষকে প্রীতি-আন্তরিকতা জানাবার ক্ষেত্রে ভাষাটা কোথাও বাধা হয়ে ঠেকে না।

ঠেকে ব্যবসায়ীদের বেলায় না হয় প্রাধান্য জাহির করবার ক্ষেত্রে। ইলা পুলকের হাতের সেই বোঝাটা ওর মায়ের হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে জানায়।

—মেরি ক্রিষ্টমাস্ মাম্মি।

বুড়ী ওকে কাছে টেনে নেন। বলেন—এসব এনেছো কেন? তোমাদের দেশের রসগুল্লা হলে কথা ছিল, এ সব কেন আনলে।

ওর বাবাও এলেন। বয়স্ক প্রবীণ লোক। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কফির টেবিলে। বেশ চনচনে রোদ উঠেছে। ভদ্রলোক বলেন—থাক, কেকগুলো থাও। কফি খেওনা। অন্য কিছু পানীয়ের চেষ্টা করছি।

একটু পরেই ফিরে এলেন, পিছনে চাকর এক কাঁদি বিরাট গোল সাইজের সোনা রং পুরুষ্ট ডাব নিয়ে এল। এতবড় ডাব আমাদের এদিকে হয় না সাধারণতঃ।

এক একটা ডাবে প্রায় বড় গেলাসের দু'গ্লাসের বেশী জল বের হ'ল, আর এ জল তেমনি মিষ্টি।

বিমলদা বলে—আজ এখন থাক, পরে হবে।

অতিথিদের জন্ত বিশেষভাবে ডাব পাড়িয়েছেন তিনি, অবশ্য গাছের অভাব নেই। বাড়ির মধ্যে আশেপাশে মাটি দেখা যায় না, শুধু সারিবদ্ধ নারকেল গাছ। ছোট্ট এইটুকু গাছেও প্রচুর ডাব ফলেছে।

রাজনীতির কথা পাড়িনি, তবু দেখলাম সেখানেও সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় লেগেছে। পথে পথে ফেষ্টুন, নারকেল গাছের এ মাথা সে মাথায় দড়ি বেঁধে ফেষ্টুন টাঙ্গানো। ভদ্রলোক বলেন—আমাদের দেশের সবাই সমঝদার আর ভারি সচেতন। তাই কেরালায় এত দল। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, নায়ার খৃষ্টান, মুসলিম লীগ, বাম-ডান কম্যুনিষ্ট আরও কত দল গড়ে উঠেছে। তাই আমাদের অবস্থা ওই সমুদ্রে ভাসমান খড় কুটোর মত, কোন কূলেই পৌঁছতে পারিনি, অকূলে ভাসছি। বাংলা দেশের অবস্থা শুনেছি এমনিই। তবে কংগ্রেসের প্রভাবই অপেক্ষাকৃত বেশী।

বিমলদা মাথা নাড়ে।

এবার বীচে যাবার পালা। সেইখানেই স্নান হবে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সঙ্গী জুটে গেল। সেই শিক্ষয়িত্রী মীনাক্ষী মেননও রয়েছে।

হাঁটা পথে রাস্তা পার হয়ে নারকেল বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছি। সজনে গাছও রয়েছে দেখলাম। আর মাথা তুলেছে ঝাউ গাছ। ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, লালচে মাটি মেশানো বালির রং এবার সাদা হয়ে আসছে।

ঢালুতে নামছি আমরা—আর মাটি নয়। ঝাউ বনের নীচে বালুবেলা এসে নেমেছে—মিশেছে নীল সমুদ্রের জলরেখায়। মাঝে মাঝে নারকেল গাছগুলো টিকে আছে, ওদিকে একটা পাথরের উঁচু টিলা, ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাথরগুলো এসে সমুদ্রের দিকে সীমা-প্রাচীর রচনা করেছে,

ভেতরে একটা 'লেগুন' মত সমুদ্রের এই বাড়তি শটংআ এখানে বিরাট একটা হাঁসুলী বাঁকের মত পরিধি জুড়ে রয়েছে।

ঢেউ এখানে তত নেই, জলও স্থির।

বীচে অনেকেই স্নান করছে। ওপরে একটা সুইমিং ক্লাবের বাড়ি; বীচে এদেশী-বিদেশী শ্বেতাঙ্গ নারী পুরুষ শিশুও স্নান করছে। উন্মত্ত পরিবেশ। ক'দিন অবগাহন স্নান হয়নি। আজ সমুদ্রে স্নান করে সেই ক্লান্তি দূর করা গেল।

ওরা দেখি সমুদ্রস্নানে অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে জেলেদের ডিঙ্গি সমুদ্রে মাছ ধরছে। ছটো কাঠের গুঁড়ি মজবুত করে বাঁধা, সব জলই বোধহয় ওর উপর দিয়ে বয়ে যায়। তাতেই মাছ ধরছে ওরা।

লম্বাইল্ মাছ—কিছু পার্শে—সিলেট—সার্ক-এর বাচ্চা। আমাদের সঙ্গী ছেলেমেয়েরা তীরে ছ'একটা পরিত্যক্ত জেলেদের ওমনি গুঁড়িনৌকা জলে নামিয়ে দিব্যি চালাতে থাকে।

মীনাক্ষী ইলাকে ধরে ওমনি একটি ডিঙ্গিতে তুলবে, ইলা বিশুদ্ধ বঙ্গজ ভাষায় চীৎকার করছে।

—ওরে বাপ্‌রে। ডুবে যাবো—মরে যাবো।

ওরাও তত হাসছে।

মুক্ত অবাধ সমুদ্রতীরে মানুষ যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ঢেউগুলো ভাঙ্গছে তীরে। মাঝে মাঝে ছ'একটা ব্রেকার ছিটকে এসে আছড়ে পড়ে।

তীরেই কড়ি—মরা প্রাণীর দেহ দিয়ে তৈরী এ্যাসট্রে—বড় বড় সমুদ্রের ফেনাও বিক্রী হচ্ছে। একটা এ্যাসট্রের দাম বলে চল্লিশ পয়সা। জন কিনে দিল দশ নয়া পয়সা করে কয়েকটা। সমুদ্রের বড় ফেনাও ওই দিল, লোকটা কি বলতে চায়। জন তাকে থামিয়ে দিল। লোকটাও দেখি বকুনি খেয়ে হাসতে থাকে।

বাড়ির পরিবেশে অনেকদিন খাইনি। জনের মা নিজে পরিবেশন

করছেন খাবার টেবিলে। ওদিকে জনের বাবাও খেতে বসেছেন। দেখলাম বাবার সামনে জন একটু কম কথা বলে।

সরু চালের ভাত, কম করে কাঁচা লঙ্কা দেওয়া মুগের ডাল, সাল্যাড—কাউলকারি আর টম্যাটোর চাটনী মত।

এসব রান্নায় জনেরও অনেক ডাইরেকশন আছে। ইতিপূর্বে পুণায় অনেক বাঙ্গালী ছাত্র মাষ্টারমশায়দের সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালী-খানার সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হয়েছে।

বিমলদা বলে—খুব তৃপ্তিভরে খেলাম বহুদিন পর।

ওর মা বলেন—কিইবা এমন খেলেন।

শেষ পাতে দেখলাম আম, কলা আর কিছু কাঁঠাল। আমগুলো কিন্তু বেশ মিষ্টি আর একটা সুগন্ধও আছে তাতে।

খালের জলে বিকালের আলো নেমেছে। নারকেল গাছের মাথায় মাথায় সেই লাল আলোর স্পর্শ। পাখীগুলো ডাকছে। বুলবুল পাখীও রয়েছে। শালিক ও ছাতোরে পাখীগুলো বালিতে লুটোপুটি করছে।

মীনাক্ষী মেননও রয়েছে, আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে। একজন একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। মীনাক্ষী শোনালো কেরলের অন্যতম প্রখ্যাত কবি করুপের কবিতা।

এরপর জন বলে—সেই জেলেদের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে বিখ্যাত উপন্যাস চিমন্; চিংলি আর অনেক কবিতা উপন্যাস। কেরলের জীবনে ওরা বিরাট ঠাঁই জুড়ে আছে।

আমাদের দেশের জীবনেও তাই ছিল। নদী—খেত খামার আর মানুষ। একদিন তাই বোধহয় বাঙ্গালী দেশবিদেশে সমুদ্রযাত্রা করেছিল, যবদ্বীপ বলিদ্বীপের কথা বলেছিলে কাল—মনে হয় একযোগে তোমরা আমরা সকলেই অন্তহীন ওই বিরাট সমুদ্রকে ভাল বেসেছিলাম।

কবিগুরুর বলিদ্বীপ—জাভা যাবার উপলক্ষে একটা কবিতা রচনা করেছিলেন।

—সত্যি ! মীনাক্ষী মেননের কালো চোখে বিস্ময়ের আবেগ।

—বলি যবদ্বীপের নির্জন সুন্দর জীবনকে ভারতবর্ষ সুন্দর করে তুলেছিল, দু'জনের সংস্কৃতি মিশে মহান এক ঐতিহ্যের জন্ম নিয়েছিল। তাকে তুলনা করেছেন তিনি সাগরবেলায় কোন পার্বত্যশিলায় ধ্যানমগ্না কুমারীরূপে।

ইলার হাতে বইখানা বার করে দিলাম। ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ঃ

"সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষ তব নিরাভরণ দেহে
চিকণ সোনা লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিণ করে
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, আমি এসেছি পরদেশী"।

ভারতবর্ষ তার সব সম্পদ দিয়ে প্রেয়সী বিদেশীনীকে সাজাল।

"কহিলে—কেন এলে ?
কহিনু আমি, রেখোনা ভয় মনে—
তনু দেহটি সাজাবো তব আমার আভরণে।
চাহিলে হাসিমুখে,
আধো চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।"

তারপর একদিন ইতিহাসের মৌনতা সেই স্বর্ণযুগকে স্তব্ধ করে দিল। যাভা—বলিদ্বীপ ভারতের কাছ থেকে যেন দূরে হারিয়ে গেল। তাই কবি বিস্মৃত শতাব্দীর সেই বিজয়বাণী আবার যেন স্মরণ করাতে চান সেই সুন্দরী দ্বীপভূমিকে।

সমুদ্রমেখলা পরা নারকেলবীথি সমাকীর্ণ মনোরম দেশ একদিন ভারতকে আপন বলে দেখেছিল, অতীতের বহুযুগ পরে আবার আজ সে যেন সেই ভারতবর্ষের একটি মানুষকে চিনতে পারে—প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।

"—মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেকবার সম্মুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে,
এবার আমি আনিনি ডালি দখিণ সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা—
দেখতো চেয়ে, আমারে তুমি
চিনিতে পার কি না।"

সন্ধ্যা নামছে নারকেলবীথি সমাকীর্ণ উদ্যানে। খালের জলরাশি তীরে আঘাত করে মৃদু গুঞ্জরণ তুলেছে।

কেরালার ছুটি স্বপ্নময় দিন শেষ হয়ে এল।

মীনাক্ষী বলে—এই সন্ধ্যাটি আমাদের মনে থাকবে। সুদূর বাংলা দেশ থেকে এসেছিলে—তোমাদের গানে কবিতায় আমাদের মন ভরে দিয়েছো।

—আমাদেরও মনে থাকবে।

আসর ভাঙ্গলো, শেষ গান গাওয়া হয়ে গেছে।

রাত্রির চাঁদ তখন মুক্ত বাধা কিরণে সারা প্রকৃতিকে ভরে দিয়েছে। শান্ত গ্রামসীমা থেকে বিদায় নেবার পালা।

—কাল তোমার ছবি শেষ হোক, যদি সুযোগ ঘটে মালয়ালি ভাষায় আমার চরিত্রকে দেখে যাবো, তোমার এই সুন্দর দেশে আবার আসবো।

...ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জনের নিবিড় উত্তপ্ত করস্পর্শ

আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—দূর হোক, তবু এক বন্ধনে আমারা যেন বদ্ধ।

মীনাক্ষী মেননও দাঁড়িয়ে আছে। তার কাজল কালো চোখে কি একটা প্রীতির স্পর্শ। প্রিয়জনদের যেন ছেড়ে এলাম পথে।

ইলা চুপ করে বসে থাকে। পুলকের কণ্ঠে সুর জাগে—

যারা ওই সম্মুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে।
খুশিরই আপন মনে বর্ষা আসে বসন্ত।
আমারই পথ চলাতেই আনন্দ।

আবার সেই পথ। সকালের আলো ফুটেছে। জেগে উঠেছে ত্রিবান্দ্রম সহর। আমাদের গাড়ি রইল এখানে। এবার বাসে চলেছি নাগরকয়েল—শুচিন্দ্রম্ হয়ে কন্যাকুমারী।

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে। এখান থেকে পথ প্রায় বাহান্ন মাইল।

ঝকঝকে রোদ, আশা করা যায় বিকালের দিকে যদি মেঘ না জমে বোধহয় কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত দেখতে পাব। আরব সমুদ্রে, জোর বরাত হলে সারাদিন সূর্যোদও দেখা যাবে বঙ্গোপসাগরে।

কন্যাকুমারীর ইংরাজী নাম কেপকমোরিণ।

কেপকমোরিণে যাবার দুটো পথ আছে। বেশীর ভাগ যাত্রী হয় ত্রিবান্দ্রম হয়ে যায়, না হয় তিরুনেল্‌বেলি হয়েও বাসে কেপকমোরিণে যাওয়া যায়।

তবে তিরুনেল্‌বেলির কাছেই প্রায় তিরিশ মাইল দূরে আরব সমুদ্রের মন্‌নার উপসাগরের তীরে আছে তিরুচ্‌বেনদূর।

পাণ্ড্য রাজাদের সুব্রাহ্মণ্যদেবের মন্দির। সেনাপতি কার্তিকের নাকি এখানে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেন।

তাই এখানের বিখ্যাত মন্দির কার্তিকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। বহু পুরাতন মন্দির—কথিত আছে প্রায় দু-হাজার বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। গুহামন্দিরও কয়েকটি আছে।

আমরা ওপথে না গিয়ে ত্রিবান্দ্রম থেকে চলেছি। সুন্দর নয়, দু'পাশে কলা, নারকেল আম-কাঁঠালের বাগান। এখানে এখন গ্রীষ্মকালের মতই আবহাওয়া, অসংখ্য নারকেল ও তাল গাছ, তাতে এসেছে তালের কাঁদি। আম ধরেছে গাছে গাছে, কাঁঠালও আছে।

পথটা এইবার নীচের দিকে নেমেছে, সমুদ্রের বাঁ পাশে দেখা যায় পর্বতশ্রেণী। বেশ একটা দীর্ঘ পর্বতরেখা, ওদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে।

ওই পর্বতশ্রেণী রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালারই একটি অংশ। তবে ওর বুকে গাছপালা তেমন নেই, ন্যাড়া পাথরের রাজ্য।

...মাঠের রূপ বদলেছে। সবুজ শ্যামল দিগন্ত। ধানক্ষেতে সবুজের শিহরণ। এদের সবুজ রাজ্য দেখে বাংলার এবারের নিঃস্ব বুকের কথাই মনে হয়। এখানে জল প্রচুর।

মাঠে মাঠে জল নিয়ে যাবার সুব্যবস্থা। অজন্মা বোধহয় ইতিহাসে নেই। সারা মাদ্রাজে তো কৃষ্ণা কাবেরী নদীকে এনে মাঠে ঢেলেছে, এখানেও তাই।

যেখানে জলের সেই সুযোগ নেই সেখানে বসিয়েছে মাঠে মাঠে ডিপ্ টিউবয়েল, বিজলী নিয়ে গিয়ে গড়ে তুলেছে পালা পাম্পরুম।

বাংলা দেশের এমাথা ওমাথা ঘুরেছি, কই এমন সুসংবদ্ধ ডিপ্-টিউবয়েল চোখে পড়েনি। সুজলা সুফলা বাংলা দেশ বলা যেতো পূর্ব বঙ্গকে, আজ পশ্চিম বাংলাকে সেই আখ্যা দেওয়া মানে নির্মম পরিহাস করা।

তাই এ রাজ্যে এত হাহাকার। এখানে মানুষ না খেয়ে থাকে না, এরা মিতব্যয়ী, খাবার সংস্থান আছে। বাজারে চাল বিক্রী হচ্ছে, পণ্ডিচেরী থেকে দেখে আসছি প্রায় নব্বুই পয়সা কিলো ভালো চাল

এক টাকা কুড়ি অবধি যত্রতত্র কিনতে পাওয়া যায়। তবে গম বেশী দেখিনি।

...নেত্যবাবু বলে—ধানচালের কারবার এখানে চলে ভালোই।

জবাব দিই না। ওখানে কম বলেই আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা তাকেই বেড়ে বেড়ে আকাশে তুলেছেন। মাতৃদুগ্ধ আর মাতৃঅন্ন নিয়ে এরা বোধহয় বেসাতি করে না। করলে এই লক্ষ্মীশ্রী থাকতো না।

সবুজ গ্রাম সীমা। আখও হয়েছে প্রচুর। মাঝে মাঝে দেখি হাস চরাচ্ছে ছেলেরা। যে ক্ষেতের ধান কাটা হয়েছে তাতেই ধান খুটে খুটে খাচ্ছে তারা।

অন্য দিকে আবার ক্ষেতে ধান নতুন করে পোঁতা হচ্ছে। ওরা জানায় বছরে দু'বার, কোন কোন ধান আবার তিন বারও হয়।

পথে নাগরকয়েল এ'ল। সুন্দর ছোট খাটো সহর। বাড়িগুলো বেশ সাজানো, সঙ্গে আম নারকেলের বাগান। পেয়ারা গাছে পেয়ারাও রয়েছে।

নাগরকয়েল বাস রুটের একটি জংসন। এখান থেকে তিরুচিনন্থুর বিরুনেলবেলি তুরিকোরিনও বাস যায়, কেপকমোরিণ এসব বাসের শেষ ষ্টেশন।

বাজারও ভালো, চৌরাস্তার ধারে পাঁচীলঘেরা পাইকেরী মাছের বাজার, সামনে আকাশে মাথা তুলেছে বিরাট একটা গির্জা।

এ বাজারে মাছ খুচরো বিক্রী হয় না। ট্রাক বোঝাই রাশি রাশি মাছ আসছে সমুদ্র থেকে এই বাজারে। তাল পাতায় মোড়া বিরাট পেটি পেটি মাছ পাইকেরী দরে কিনে নিয়ে ওরা চালান দেয় বাইরে, কিছু বা শুটকি মাছ করে নুন দিয়ে।

ওই ব্যবসা নাকি খুব লাভজনক।

পচা মাছের গন্ধ নাকে আসে।

ড্রাইভার বলে—পচা নয়, ওসব টাটকা মাছই। সী ফিসের ওরকম গন্ধ হয়।

কফির পর্ব শেষ করে আবার চললাম দক্ষিণের দিকে। পথে একটি গণ্ডগ্রাম পড়ে, ডান পাশে প্রশস্থ জায়গায় বসেছে সার্কাসের তাঁবু, এটা সেটার দোকানও বসেছে। গাদা করে বিক্রী করা হচ্ছে তাল পাতার তৈরি অনেক কিছু, কালো কালো মোটা আখও বিক্রী হচ্ছে।

ওপাশেই দেখা যায় বিরাট গোপুরম্।

ড্রাইভার জানায়—উচিন্দ্রম্ মন্দির। তবে কন্যাকুমারী দর্শন করে ফেরার পথেই ওই মন্দির দেখা প্রশস্ত।

বিমলদা বলে,—দেখলে ইলা, এখানে শিব সেকেণ্ডারী, প্রাইমারী হচ্ছেন কন্যাকুমারী। তোমাদেরই জয় হোক। চল বাবা ড্রাইভার আগে সেই তীর্থেই চলো।

—এখান থেকে কতদূর? পুলক প্রশ্ন করে।

সে সমুদ্র-সঙ্গম দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছতে হবে।

—তা মাত্র ন মাইল পথ, এসে গেছি।

বালির রাজ্য সুরু হয় এবার। তালগাছগুলোই টিকে আছে। মাথায় তাদের কাঁদি আর আছে বাবলা গাছের জঙ্গল। কিন্তু কেউ মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে নেই। ইলা বলে—সবাই বেড়েছে ছাতার মত গোল হয়ে।

—সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ার দৌলতে বাছাধনরা এমনি তেঁএটেঁ হয়ে উঠেছে বুঝলে না। খোলা সমুদ্র, তার হাওয়া তেমনি জোরে আসে এখানে। বালির স্তূপগুলোর কি হাল দেখেছো? আজ এখানে আছে তো কাল জমছে ওখানে। তছনছ কাণ্ড চলে বোধহয়।

দেখা যায় ডানহাতে বিরাট একটা চার্চ।

—এখানেও চার্চ!

বিমলদা জবাব দেয়,

—আছে। ক্রীশ্চান এখানে অনেক। এই দেশে মুলিয়ারা সবাই প্রায় ক্রীশ্চান তাছাড়া ওদের মতে কুমারীকন্যাই নাকি ভার্জিন মেরী। তাই এই অন্তরীপে তারাও ভার্জিন মেরীর এই গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছে।

ছোট্ট লোকালয়, সমুদ্রতীরে খানিকটা জায়গা নিয়ে বসতি। ঢোকবার মুখে বাঁ-হাতেই বেশী লোকালয়। পাকাবাড়িও আছে—আর আছে কিছু টালির বাড়ি।

লজিং হাউস আছে, তাছাড়া এমনি বাড়িও ভাড়া মেলে। একটা বাড়ির নীচেকার তিনখানা ঘর ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। সেখানে উঠে দেখি বিজলী আছে বটে তবে পায়খানার ব্যবস্থা তেমন নেই। জলও তোলাজল।

…কিছু এখানে রইল। বিমলদা আয়েসী লোক। বলে—একটা দিনের বসতি। একটু হাতপা খেলিয়ে থাকবো বাবা, ওপাশের লজিং হাউসে দোতলায় একখানা ঘর মিললো, বেশ বড় ঘর, লাগোয়া বাথ প্রিভি। ভাড়া একদিনে আট টাকা।

বিমলদা বলে—তাই সই।

ইলাও জানায়—আমি তব হবো সাথী। একপাশে ঠাঁই হয়ে যাবে। অনেক বড় ঘর তো!

মাঝে মাঝে অবাক হই ওর দুঃসাহস দেখে। এখানে তবু অন্য মেয়েরা আছে, মেয়েদের জন্য একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ইলা বলে—ওসব সান্ত্বনা নাই বা দিলেন। চলুন তো। নিজেই ওর ব্যাগ চাদর বালিশ জড়ানো বাণ্ডিল আর গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেপরোয়া মেয়ে, ওকে আর কিছু বলতে সাহস হ'ল না।

দেখি নেত্যবাবু, বিজয় মাষ্টার আমাদের দিকে কড়া নজরে চেয়ে আছে। ইলা তাগাদা দেয়।

—চলুন। এইখানেই বেলা কাটিয়ে দেবেন নাকি?

পথে নেমে বলি—ওরা কি ভাববে বল দিকি ?

ইলা পথ চলতে চলতে জবাব দেয়,

—ভাবুক।

মালপত্র সবই ত্রিবান্দ্রমে গাড়িতে রেখে এসেছি। দেড়দিনের মত মালপত্র নিয়ে এসেছি।

আস্তানাটা মন্দ নয়।

সমুদ্রের দিক খোলা। মত্ত মাতাল হাওয়া এসে জানালায় আছড়ে পড়ে।

—ওই তো বিবেকানন্দ রকস্ না ?

হ্যাঁ। মেইনল্যাণ্ড থেকে প্রায় শ'খানেক গজ দূরে, কি কিছু বেশীই হবে। চারিদিকে ছোটবড় পাহাড়—মাটি নেই, এখানের সমুদ্রতীরে ওই পাহাড়ে ভর্তি।

নীল জলরাশির মাথায় সাদা ফেনার তুফান ছুটছে। রোদের আলোয় চিক চিক করে।

—কন্যাকুমারী মন্দির ?

—ওই তো গোপুরম দেখা যায়।

বিমলদাই বলে—প্রথম এখান থেকে অল্প দূরে গুহান্তস্বামীর মন্দির দেখে আসবো সমুদ্রতীরে। সানসেট দেখা যায় কিনা পরখ করতে হবে।

বালি আর বালি।

তারই মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটি পিচঢালা রাস্তা কোনরকমে বালির অবরোধ বাঁচিয়ে চলেছে। আশপাশে ছোট ছোট বাড়ি। একটু গিয়েই গুহান্তস্বামীর মন্দিরে পৌঁছানো গেল।

—এযে ছোট্ট মন্দির!

বিমলদা বলে, দেখে নাক সেঁটকালি যে। মনে ধরল না বুঝি ? তবে এর বয়সও কম নয়। চোল বংশের রাজা রাজেন্দ্র চোল এই মন্দির তৈরি করান। সমুদ্রতীরে উঁচু মন্দির বোধহয় টিকবে না। তাই

এ মন্দির নীচুই, তবে আগাগোড়া পাথরের তৈরি। তাছাড়া এ মন্দিরের একটা বাতায়ন আছে।

ইলা বলে—তা সত্যি। দক্ষিণের অন্যান্য মন্দিরের মত বুকচাপা এ নয়।

ভিতরের হলটাও মোটামুটি সুন্দর, তবে উল্লেখ যোগ্য কাজ কিছু নেই।

মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে এবার আসছি সমুদ্রের দিকে। কন্যাকুমারী বসতের এই প্রধান রাস্তা। এদিকে এর লোকালয়, আর ডানহাতে কি সমুদ্রতীরে খোলামেলা বিরাট বাড়িঘর দোতলা বাড়িতে ট্যুরিষ্ট রেষ্ট-হাউস।

ইলা বলে—বাড়িটা বেশ তবে সামনে কোন গাছপালা নেই, ন্যাড়া ন্যাড়া।

বিমলদা বলে—তাতেই গাড়ির ভিড় দেখছো। গাড়িওয়ালারা বোধহয় এখানেই আস্তানা গাড়েন। ওপাশে আরও বিরাট বাড়ি, কেরালা হাউস।

ইলা বলে—ওখানে বোধহয় খাস কুলিনের দল এসে ওঠেন।

তার পিছনেই লাইট হাউসের সাদা চূড়াটা আকাশে উঠেছে।

বীচে এসে দাঁড়ালাম। বাঁ-পাশে একটা বিরাট কর্মশালা, প্রাচীর ঘেরা জায়গায় অনেক গ্রানাইট সুন্দর করে খোদাই করা হচ্ছে, সাইনবোর্ড দেখলাম বিবেকানন্দ রক টেম্পল সোসাইটির কর্মশালা। শুনেছিলাম-ওরা ওই সমুদ্রের মধ্যে বিবেকানন্দ রকে স্বামীজীর একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। তারই কাজ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। বিরাট আয়োজন চলেছে।

লেখা রয়েছে ফ্রি ফেরী সার্ভিস টু বিবেকানন্দ রক।

ইলা বলে—ওই রকে নিয়ে যাবেন?

বিমলদা বলে—সোসাইটির অফিসে আজ সন্ধ্যায় দেখা করে যাবো।

বাঁচের সামনেই গান্ধী স্মারক মন্দির। এখানে গান্ধীজীর চিতাভস্ম ত্রিঅর্ণব সঙ্গমে বিসর্জন করান হয়েছিল, ক্রিম্ কালারের সুন্দর মন্দিরের গঠন এই বাড়িটির। একতলায় প্রার্থনা গৃহ, দোতলা তেতালায় সিঁড়ি গেছে। মার্বেল পাথরের ঝকঝকে মেঝে, হলে দেশনেতাদের ছবি, জুতো খুলে ভিতরে গেলাম।

সমুদ্রতীরে মুক্ত পরিবেশে স্থানটা ভালোই লাগলো।

দিন শেষ হয়ে আসছে।

মন্দিরের উচ্চতম অলিন্দে দাঁড়িয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। আরব সমুদ্র আর বঙ্গোপসাগর এসে মিশেছে ভারত মহাসাগরে। এখানের বালির রংও তিন রকমের। লাল, কালো আর ভাতের দানার মত গোটা গোটা সাদা রং।

এখানের পূজারীরা বলে তাছাড়াও কন্না আর কুমারী নামে দুই গুপ্ত স্রোতধারাও মিশেছে মহাঅর্ণবে।

অনেকেই এসেছে সমুদ্রতীরে। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে দূর সমুদ্রে ঢেউ-এর মাথায়, বিবেকানন্দ রক-এর কালো পাথরে পড়েছে তারই আভা।

একদিন ওই প্রস্তরদ্বীপ ছিল পরিত্যক্ত, দূর বাংলাদেশ থেকে একটি সাধক দেশপ্রেমিক—মানবপ্রেমিক—সাধক বহু পথ ঘুরে গেরুয়া সম্বল করে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হয়তো এমনি কোন উদাস অপরাহ্নের রঙীন আলোকময় এই বেলাভূমিতে। ভারতভূমি এখানে এসে কালসমুদ্রের তটপ্রান্তে মিশিয়ে গেছে। তার গতিরুদ্ধ করতে পারেনি এই মহাকাল।

তিনি ওই নির্জন শিলাখণ্ডে বসে তপস্যা করেছিলেন দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির তপস্যা, সারা ভারতের কোটি কোটি মানবাত্মার মুক্তি তপস্যা।

জলকল্লোলে কাল কল্লোল মিশে উঠেছিল তার অন্তরাত্মারূপী গুরুর নির্দেশ।

—আরও এগিয়ে যাও, মহার্ণব তোমার গতি রুদ্ধ করতে পারবে না; দেশ কালন্তরে, কাল দেশান্তরে, ব্যপ্ত হোক তোমার সাধনা; তোমার বিবেকসম্ভূত পরম চেতনার আলোয় নব পৃথিবীর প্রত্যূষ ঘোষিত হোক।

আজ সেই শিলাখণ্ড সজীব প্রাণময় হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দের সাধনা সার্থক হয়েছে। আজ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী জেগে উঠেছে।

ওই শিলাতলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিবেকানন্দের প্রতিমূর্তি। মূল ভূখণ্ড থেকে ওখানে যাবার জন্য সেতুপথ রচনা করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

সন্ধ্যা নামছে।

রঙীন আলোয় সমুদ্রবুক উদ্ভাসিত, একটি দিনের পরমলগ্ন সমাগত। রাত্রি নামছে।

দিন রাত্রির সন্ধিক্ষণে মহাসাগর সাগ্রহ প্রতীক্ষায় শেষ সূর্যের দিকে চেয়ে আছে। একটি রক্তাক্ত মুহূর্তে কলরব ওঠে দর্শকদের মধ্যে। দিনের শেষে পৃথিবী কোন যুবতী কন্যার রূপে ওই বারিধির অতলে পূর্ণকুম্ভ নিয়ে হারিয়ে গেল।

ঢেউ-এর গর্জনে ওঠে সমুদ্রের কলতান। হারানো নৌকাগুলো একে একে ঘরে ফিরছে।

নীচে আলো জ্বলে ওঠে।

দোকান পশারে আলো জ্বলছে। কড়ি, ঝিনুক, রকমারি পাথরের মালা, শঙ্খ, প্রবাল বিক্রী হয় আর আছে তালপাতার তৈরী ব্যাগ, নরম কাঠ মোষের শিঙের তৈরী খেলনা। দামও তেমনি, যাকে যা পায় সেই দরেই বেচে। রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই।

স্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ। মন্দিরে আরত্রিকের শব্দ ওঠে। টিকারা আর ঘণ্টা বাজছে। সেই গুরু গুরু শব্দ মেশে সমুদ্রের কলতানে।

মন্দিরে সেলাই করা জামা পরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ, মেয়েদের বেলায় কোন বিধি নিষেধ নেই। খালি গায়ে নগ্নপায়ে ঢুকলাম মন্দিরে।

বাইরে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যায় না। বেশ বড় সুঠাম মন্দির। মণ্ডপের থামগুলোয় কাজ করা, সামনে মহামণ্ডপ থেকে দেখা যায় ভিতরের মন্দিরে বহু স্তরে স্তরে সাজানো দীপের আলো।

একটা শিখায় দেবীর নাসিকা আর কপালের ছুটো বহুমূল্য হীরকভূষণ জ্বলছে।

অপরূপ সুন্দরী মূর্তি; এত কমনীয় সুঠাম ব্যাকুলা নারী মূর্তি কোন মন্দিরে কোথাও দেখিনি।

অগুরু চন্দন চর্চিত মূর্তি, পরনে আকাশী রং-এর শাড়ী, একহাত বাড়িয়ে তিনি চিরসুন্দর দেবাদিদেবের প্রতীক্ষা করছেন কি ব্যাকুল অধীরতা নিয়ে।

এ প্রতীক্ষার শেষ নেই। তটভূমি প্রতীক্ষা করে সমুদ্রের, সমুদ্র প্রতীক্ষা করে চন্দ্রের—মানুষ প্রতীক্ষা করে মুক্তির। তাই এই মন্দির রচনা, তাই এ তীর্থ-পরিক্রমা। ব্যাকুলতা নিয়ে এ পরিক্রমা করেছি ব্রহ্মপুত্র তীরে কাম্যাখ্যা পর্বত ও মুক্তক্ষেত্র বারানসীর মন্দিরে—আরব সাগরের উর্মিমুখর বালুবেলা সমাকীর্ণ দ্বারকার মন্দির তলে বননির্জনা ভেরা দামোদরের উপলমুখর প্রবাহিণীর তীরে ছিন্নমস্তা মন্দিরে। তবু এ প্রতীক্ষার স্পর্শ বিভিন্ন; প্রকৃতি আর পুরুষ—সমুদ্র আর পৃথিবী এখানে প্রতীক্ষামানা।

পুরাকালে এখানে ছিল জ্ঞানারণ্য; সেই সমুদ্রবেলায় অরণ্যভূমিতে কুমারী দেবাদিদেব মহাদেবের জন্য ছিলেন তপস্যায় নিমগ্ন।

সেই নারীর তপস্যার সংবাদ পেয়ে লোভী বালাসুর এলো, তাকে আকুতি মিনতি জানায়—দেবী তুমি প্রসন্না হও। আমাকে পতিত্বে বরণ করো।

কিন্তু সে নারীর মন জয় করা সহজ নয়, তাই বালাসুরও নিজের

বীরত্বের কথা জানিয়ে তাঁর মন জয় করার চেষ্টা করল। সে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছে। বিষ্ণু তার ভয়ে সাগরে আত্মগোপন করেছেন, দেবকুলকে সে দাস করেছে।

কুমারীকন্যা তবুও অটল।

তখন লোভী দানব তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসে তার দিকে। কুমারীকন্যার ধ্যান ভঙ্গ হয়। ক্রোধে বিরক্তিতে সে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। মহাশক্তির আধার—তার শক্তির দুর্বার তেজে বালাসুর ধ্বংস হয়ে গেল।

আবার তপস্যানিমগ্না হলো কন্যা। অন্তহীন সে তপস্যা। দেবাদিদেব মহাদেবকে এবার প্রসন্ন করেছে কন্যা। তিনি আসবেন এই বিবাহযজ্ঞে।

কুমারীর সাথে মিলিত হবেন এই মহার্ণবতীরে। দেবলোকে চাঞ্চল্য পড়ে যায়, এক সর্বনাশের কল্পনায় ত্রিভুবন চমকে ওঠে।

নির্দেশ আছে সর্বসংহারের পর ধ্বংসদেবতা মহাদেব মিলিত হবেন কুমারীর সাথে। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০ বৎসর, দু'হাজার সত্যযুগ ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মার তেমনি একবছর পূর্ণ হলে এক একটি ব্রহ্মা প্রলয় ঘটে, দশটি ব্রহ্মপ্রলয়ের সমকাল বিষ্ণুর জীবনকাল, বিষ্ণুর দ্বাদশ আয়ুষ্কাল অবসানে ঘটবে সর্বসংহরা।

তখন বিশ্বপ্রকৃতি ধ্বংসলাভ করবে, সেইদিন মহাদেব আর কুমারী-কন্যা মিলিত হবেন। ততদিন কুমারীকন্যাকে মহাদেবের প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে এই ত্রিঅর্ণবতীরে। কিন্তু অসময়ে মহাদেব কুমারী-কন্যার সাথে বিবাহে চলেছেন, তবে কি প্রলয়কাল সমাগত! অকালে ধ্বংস হবে ত্রিভুবন চরাচর।

মিলনরাত্রি সমাগত!

মহাদেব আসছেন। নিশাকালের মধ্যে লগ্ন, লগ্নভ্রষ্ট হয়ে যাবে দিনাগমনে। মহাদেব এগিয়ে আসছেন।

ত্রস্ত দেবতারা স্মরণ নিলেন নারদের। যেভাবে হোক মহাদেবকে নিরস্ত করতেই হবে। সৃষ্টি রক্ষা করা প্রয়োজন।

নারদ পথিমধ্যে মহাদেবকে দেখতে পেয়ে শাস্ত্রচর্চা সুরু করলেন। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। মহাদেবও তর্কে তন্ময় হয়ে গেছেন।

কোনদিক দিয়ে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। মোরগ ডাকছে। ফরসা হয়ে আসে পূর্বদিগন্ত।

মহাদেব আর মহার্ণবের তীরে এসে পৌঁছতে পারলেন না, রয়ে গেলেন ওই শুচিন্দ্রম মন্দিরে। কন্যা কুমারীই রয়ে গেল।

আজও তাই তার অন্তহীন প্রতীক্ষা—কবে আসবে তার প্রিয়তম। সেদিন ধ্বংসের মাঝে নতুন পৃথিবী জন্মের স্বপ্ন দেখবে। অপরূপ—রূপময় হয়ে উঠবে।

চুপ করে বসে থাকে ইলা।

সমুদ্র হাজারো কাষ্ঠ ধারায় কূলে এসে আছড়ে পড়ছে।

পাথরের বেষ্টনী—চারিদিকে চাঁদের আলোয় দেখা যায় কালো কালো পাথর—তাতে এসে ঢেউগুলো সাদা বেণীর খানখান সমুদ্রে শ্বেত শয্যা পেতেছে।

ওইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের কয়েকজন পূজারী।

—স্নানের ঘাট কোনদিকে?

তারাই দেখালো ওইখানে।

আবছা অন্ধকারে স্নানের ঘাটের সন্ধান দেখি না, কালো পাথরের প্রাচীর যেন মাথা তুলেছে।

একজন পুরোহিত বলেন—এখানেই রয়েছে এগারোটি তীর্থ—চক্রতীর্থ, পাপনাশম, গায়িত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, কুমারী, গণেশ, থানু, ভীম ও পিতৃ। মাতৃতীর্থ আবার সাতটি। উম্মানী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী আর চামুণ্ডা। তাই কন্যাকুমারী মহাতীর্থ।

রাতের আবছা অন্ধকারে ঢেউগুলো ভাসছে।

ইলা চুপ করে বসে আছে। বলি—একবার বিবেকানন্দ সোসাইটির অপিসে গেলে হতো না?

ইলা কি ভাবছে। আমার কথায় উঠে এল।

বিচের ওদিকেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে অপিস একটা লাইব্রেরী, বিবেকানন্দ লাইব্রেরী।

ভারপ্রাপ্ত কর্মী এগিয়ে এলেন। এদের হেড অপিস মাদ্রাজে, এখানে কাজ-কর্ম দেখবার জন্য এঁরা আছেন। পাঠাগারটিও সুন্দর, বেশ গোছানো। বিবেকানন্দের সব গ্রন্থই প্রায় রয়েছে, তাছাড়া রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, হিন্দুধর্ম দর্শন সম্বন্ধেও অনেক সংগ্রহই করেছেন এরা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও আছে।

এরাই জানালেন, সমুদ্রে ক'দিন ধরেই ভয়ানক বরফ জমছে, যদি ভালো থাকে, কাল বোট যাবে দর্শকদের নিয়ে। বোটে কুড়ি জন করে যাত্রী নেয়, ফ্রি সার্ভিস। রক দর্শন করে যেতে আসতে সময় লাগে ঘণ্টা খানেক।

—সন্ধ্যা সবে সাড়ে সাতটা। ইলা বলে—খাবারের এখনও দেরী আছে, একটু কফি খেয়ে বীচে বসা যাক্।

কফির দোকানও মিললো। একেবারে মিশমিশে কালো গাঁট্টাগোট্টা চেহারার দোকানদার, তাওয়ায় গরম ধোসা সেঁকছে। আগুনের তাপে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

…বসবো কিনা ভাবছি। বোধ হয় দোকানদারের স্ত্রীই হবে, এসে কলাপাতা পেতে দিল।

—হট্ ধোসা! সম্বরম্ কফি! দশ আণ্ডু পয়সা!—পনেরো পয়সা, যা নেবে তাই পনেরো পয়সা। তাই সই। তবে ধোসাটা বেশ নরম আর ফুলেছে ভালো। স্বাদ মন্দ নয়। কফির সঙ্গে মন্দ লাগল না।

আবার সেই অন্তহীন ঢেউ-এর আনাগোনা। বীচের এইদিকে এসেছি। বালিয়াড়ির নীচে এসে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে। ফেনাগুলো

সমুদ্রের বুক ভরিয়ে নিয়ে চলেছে, দূরে অন্ধকারময় ওই রক-টা অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত নিস্তব্ধ। নীচে আলো দু'একটা জ্বলছে।

ইলা বলে—পাষাণ প্রতিমার ব্যাকুল প্রতীক্ষার কাহিনী নিয়ে মানুষ উপাখ্যান রচনা করে মন্দির গড়ে। কিন্তু মানুষের বুকভাঙ্গা প্রতীক্ষার বেদনার কথা কেউ কি জানে ?

ওর দিকে চাইলে বিস্মিত হই।

সারা আকাশ বাতাস জুড়ে সমুদ্রের ওই উত্তরোল মাতনের সাড়া। চতুর্দশী বোধহয়। চাঁদের আলো পড়েছে সমুদ্রের বুকে, দুর্বার এক আবেগে মহোদধি ফুলে উঠেছে।

বাতাসে বাতাসে হাহাকার।

ইলা বলে চলেছে—আজ মনে হয় এ সমুদ্রের শেষ নেই, এর বুকে যারা হারিয়ে যায় তারা সত্যি আর কোনদিনই ফেরে না। তারা ফেরারী হয়ে যায়। মনে হয় বৃথাই এ প্রতীক্ষা সে কোনদিন আর ফিরবে না।

চুপ করে শুনে চলেছি তার কাহিনী। একজন নারীর জীবনে এটা অতি সহজ সত্য ; কিন্তু সহজের মধ্যে যে এত নিবিড় বেদনা থাকতে পারে তা জানা ছিল না।

সে অনেকদিন আগেকার কথা, ইলার জীবনেও একজন এসেছিল। তার কুমারী মনে প্রদীপই জ্বেলেছিল কামনার প্রথম আলোক রশ্মি। ইলা বাঁচতে চেয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ইলা। সে ভালোবাসায় কোন ফাঁকি ছিল না। প্রদীপও সেদিন জ্বালিয়েছিল তার জীবনে আমারই স্থান রয়ে গেছে। চারটে বছর কেটেছিল বিচিত্র স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। আমি তাকে আমার সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছিলাম।

...ইলা চুপ করে কি ভাবছে। আমিও অবাক হই, আমাকে এসব কথা জানাবার কি কারণ থাকতে পারে। হয়তো মনের জ্বালা

চেপে সে শান্তির সন্ধানে পথের বৈচিত্র্যের মাঝে এসে মন নিজের নিঃস্বতার বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বলে চলেছে সে—

—প্রদীপ এমনি সময় বিদেশে একটা স্কলারশিপ্ পেয়ে এফ্-আর-সি-এস্ পড়তে গেল। তখনই বলেছিল আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি ফিরে আসবো।

—আমিও তার পথ চেয়েছিলাম, দিন মাস বছর গেল। বছরের পর বছর।

এ প্রতীক্ষার কি শেষ হবে না কোনদিন? ওই সমুদ্রে যারা হারিয়ে যায় তারা কি ফেরেনা আর?

এর জবাব কি দেবো জানি না।

ওর মনের অতলে বেদনার সন্ধান আমি পাইনি। ওর চোখে জলের আভাষ। কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ।

আকাশ বাতাস ওই চাঁদনী রাতের মাথায় আর সমুদ্রের কলরবে ভরে উঠেছে। চারিদিকে এই পৃথিবীতে মানুষের মনের অতলে ওই বেদনার হাহাকার।

—হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা, জানকি তোমার ধরা ভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ—
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষ্ণা—
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা জালে। অতল গভীর তব
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো; স্নিগ্ধমাতৃপানি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা
বলো তারে, শান্তি! শান্তি! বলো তারে! ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।

মানুষের এ কান্নার যেন শেষ নেই। রাত্রি নামছে। চুপ করে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসি। ওদিকে বালিয়াড়িতে তখনও কান্না বসে আছে

লজিং হাউসে এসে দেখি দুধওয়ালিরা ঘটিতে দুধ নিয়ে এসেছে—যদি নবাগতরা দুধ নেয়। খাঁটি দুধই।

বিমলদা বলে—নাও হে কিছু, এদেশে এসে অবধি তো ও-বস্তুটির মুখ দেখিনি। গব্যরস যা কিছু সব চলেছে ওই জুতোর মধ্য দিয়ে। তবু একটু কিছু পেটে পড়ুক।

ওদিকে খানার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। বিমলদা বলে—খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়, কাল ভোরে আবার মঙ্গল-আরতি দেখতে যেতে হবে।

রাত নামছে। সুপ্ত হয়ে আছে জনপদ। আকাশ বাতাসে ওঠে ঢেউ এবং কল কল্লোল। চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে থাকে ইলা। ওর মনেও যেন কি এক ঝড়ের আনাগোনা।

ভোর হয়ে আসছে। সুপ্ত জনপদকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে ওই মহাসমুদ্র। আবছা অন্ধকারে বের হবার আয়োজন করছি। পথের আলোগুলো নেভানো।

ওই আবছা অন্ধকারে দেখা যায় দু'একজন লোক ওই পথকেই সরকারী ল্যাট্রিনে পরিণত করেছে।

বোধহয় তীর্থ স্থানের ওই পরিচয়। সবই সেখানে একাকার। দিনের আলো ফুটে উঠছে।

মন্দিরে প্রভাতির আরতি হচ্ছে, এবার দেবীর নোতুন শৃঙার রূপ। আকাশী রং-এর বস্ত্রের পরিবর্তে এবার হলুদ বর্ণের অঙ্গাবরণ।

মনোময় সেই মূর্তি।

বিমলদা বলে—স্নান সেরে পুজো দিয়ে এবার দেখা যাক বিবেকানন্দ রকস্-এ যদি যাওয়া যায়। বোট সকালেই ছাড়ে—বেলা বেড়ে গেলে আর যাবে না। সমুদ্র বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হয়ে ওঠে।

পাথরের সীমা প্রাচীর ঘেরা স্নানের ঘাট। সমুদ্রের ঢেউগুলো উপছে এসে পড়ছে এখানে, কৃত্রিম জলাধারের সৃষ্টি করেছে : তবে সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নামতে হয়। জলের নীচেও সেই পাথরগুলো যত্র তত্র পড়ে আছে, পায়ে লাগলে বিপদের সম্ভাবনা।

সূর্যদেব তখনও ওঠেনি। বিবেকানন্দ রকের ওপাশে মহাসমুদ্রের বুকে কুয়াসা জমছে, দুয়েকটা মেঘও বসে আছে।

সামনে ফুঁসছে সমুদ্র ; উর্মিমুখর। ভোররাত থেকেই সে আজ মেতে উঠেছে। অনেকেই সাগ্রহে চেয়ে আছে—সমুদ্রের বুক থেকে স্বর্ণকুম্ভ নিয়ে উঠবে কোন নোতুন দিন।

কিন্তু সেই রহস্যময় মুহূর্তটিকে দেখা গেল না। মেঘের আড়ালে আকাশ জলধির স্পর্শ ছাড়িয়ে সূর্য উঠল কালো মেঘের ফাঁকে কয়েকটি প্রদীপ্ত রেখার সঞ্চারই দেখলাম মাত্র। বিকীর্ণ আলোক রশ্মির তির্যক রেখায় আকাশ চিত্রিত ; স্নানের ঘাটে স্নানার্থীদের সূর্যপ্রণাম মন্ত্র শোনা যায়।

—জবাকুসুম সঙ্কাসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিঃ—

মন্দিরে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। দেবীর শৃঙার হয়ে গেছে। চন্দনের সৌরভ ওঠে বদ্ধ হাওয়ায়। গৌরী কন্যাকুমারীর মূর্তিকে পূজা দিয়ে বের হয়ে এলাম।

ইলাকে দেখলাম আজ স্তব্ধ। ভক্তিভরে পূজার ডালি হাতে নিয়ে চলেছে মন্দিরে। নারকেল—কলা—হলুদ সিঁদুরের থান—ধূপবাতি আর মালা।

প্রভাতের আলোয় তার রুচিশুভ্রা মূর্তিটি ভালো লাগলো। মনে হয় সেও যেন কার জন্য সারা অন্তর মেলে অন্তহীন প্রতীক্ষায় রত, যে হারিয়ে গেছে মহাসিন্ধুর ওপারে সেই পথহারা প্রিয়তম হয়তো এ সংবাদ জানে না।

ওর প্রতীক্ষা সার্থক হোক।

নেত্যবাবু—বিজয়মাষ্টারের দলও এসেছে। এসেছে মলিনা।

বিশু মল্লিক মন্দিরের বাইরে একটা চাতালে বসে বলে চলেছে—কন্যাকুমারীর পুজো দেবে বাবা মেয়েরা। ওদেরই তো দরকার আমরা তো বাবা মহাদেবের দলে।

বিমলদাই ওদের কাছ থেকে টাকা তোলে। বলতেই স্বেচ্ছায় দিল।

—কলকাতা থেকে এসেছি আমরা। বিবেকানন্দ রক সোসাইটিতে আমাদের কিছু দেওয়া দরকার। ওঁরা অবশ্য কেউই কিছু চাননি। তবু আমরা ভাবছি কিছু দোব।

মধু বষ্ঠি আর সুরপতিই টাকটা তুলল, একশো এক টাকা।

সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে।

সমুদ্রকে এইবার স্পষ্ট করে দেখা যায়—কালকের চেয়েও আজ সে আরও মাতাল। দুর্বার। গর্জনমুখর।

সকালের আলোয় ঢেউ-এর মাথায় মাথায় গাংচিলের দল ছোঁ দিয়ে ফেরে খাদ্যের আশায়। ওদের চীৎকারে উপকূল মুখর হয়ে উঠেছে।

সোসাইটির অফিসে টাকাটা জমা দিতে ওরা রসিদও দিলেন যথারীতি। একজন কর্মকর্তা বলেন,

—রকে যাবেন, কিন্তু আজ সমুদ্রের যা আবহাওয়া তাতে বোট যেতে পারবে কিনা জানিনা।

নেত্যবাবু বলেন—কিন্তু ওরা যে যাচ্ছে দেখলাম!

হাসেন ভদ্রলোক।

—ওরা এখানের বাসিন্দা, তাছাড়া ওখানে কাজ করছে। ওরা এই রাফ ওয়েদারেও যেতে অভ্যস্ত। আপনাদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের তেমন অসুবিধার কিছু দেখলে আমরা নিয়ে যেতে চাইবো না।

বাইনাকুলার দিয়ে দেখি, রকের উপরে কিছু লোক কাজ করছে, কাজ করছে তীরভূমির সেই ওয়ার্কশপেও অনেক লোক। পাথরে ছেনি হাতুড়ির সমবেত ঘা পড়ছে।

সমুদ্রের ঢেউগুলো ফুঁসে উঠছে ফেটে পড়ছে সাদা ফেনার স্তূপে। ছোট বোটখানা কাঁপছে সেই ঢেউ-এর আস্ফালনে। বোটখানা ওদিক থেকে আসছে—দেখি এক একবার লাফ দিয়ে উঠে আবার ঢেউ-এর আড়ালে হারিয়ে যায়।

আশপাশে ওদিকের জলে মাথা বের করে আছে শুধু কালো পাথর। একবার ছিটকে গিয়ে পড়লে নৌকো চুরমার করে দেবে।

ওরা প্রাণপণে দাঁড় টেনে ওইদিক থেকে নৌকাকে দূরে রাখবার চেষ্টা করছে। এক একটা ঢেউ-এর তোড়ে নৌকা ঢেউ-এর মাথায় ওঠে।

…ওইটুকু পথ আসতেই তারা যেন শেষ হয়ে যাবে। তীরে দাঁড়িয়ে ওই মরণপণ যুদ্ধ দেখছি। বোট ফিরবে কিনা কে জানে।

…মনে হয় অতীতের একটি ছবি।

একটি মহাপুরুষ তীরভূমি থেকে ওই স্রোত-তুফান অগ্রাহ্য করে সাঁতরে তীরে গিয়েছিলেন ওই রকে।

কে দিল তার দুর্দাম তেজ আর দৃঢ়তা। বোটে আজ মানুষ সেখানে যেতে আসতে শিউরে ওঠে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষ তিনজন বোট নিয়ে ফিরেছে। জলে অর্ধেক ভরে গেছে বোটটা, ওরা হাঁপাচ্ছে। বলে বোটম্যান—নেই যায়েগা সাব, দরিয়া বহুত রাফ হোগিয়া। বোট খতম হো যায়েগা।

নিজের চোখেও দেখেছি ওদের বোটের অবস্থা। বিবেকানন্দ রকে যাওয়া হ'ল না। বিমলদা বলে—বিবেকানন্দ যেখানে পা দিয়েছিলেন সেখানে তোদের মত পাপীরা যাবে এ কেমন করে হয় বল। মন্দিরকে দূর থেকেই প্রণাম কর।

জেলে নৌকাগুলো ওই দিকেও যাচ্ছে না। ওরা নৌকা ভাসাচ্ছে রকের সীমানার ওপাশে—নিরাপদ দূরত্বে।

আমরা তীরে দাঁড়িয়ে আছি, সমুদ্র এবং ওই কালো কালো পাথরগুলো, দূরের পাহাড়, তীরভূমিতে দেখা ঐ গান্ধীমন্দির সব

মিলিয়ে কারা যেন কমোরিণের সমুদ্র সৈকতে এক বিচিত্র অধরারূপে দাঁড়িয়ে আছে।

এর অন্তরের সেই স্তব্ধ মহান সুরটি যেন কোথাও স্পর্শ করতে পারি না, সমুদ্রকে বার বার দেখেছি, দীঘা, পুরী, ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, ওদিকে দ্বারকা, ভেট দ্বারকায় কচ্ছের উপকূলে—বোম্বাইএ ; কিন্তু এখানে এসে মিলেছে সেই বঙ্গোপসাগর আর আরব সাগর—ভারত মহাসাগরে।

ভারতের সব সংস্কৃতি সব চিন্তাধারা সব অস্তিত্ব এসে নিঃশেষ হয়েছে এই মহাসাগরতটে, কিন্তু সেই মহান সত্য-সুন্দর রূপটিকেই সত্যদ্রপী ঋষিরা কল্পনা করেছেন ভারতের অন্তহীন নব জাগরণের প্রতীক মালারূপে। বোধহয় কন্যাকুমারী সেই নবসৃষ্টির প্রতীক মালারূপেই প্রতীক। পটভূমিকা এই মহামিলনের মহাসাগর তীর।

মানুষ এখানে তুচ্ছ—ক্ষুদ্র।

যুগযুগান্তের তপস্যাই এখানে রূপায়িত।

সমুদ্রের তীর থেকে লোকালয়ের দিকে ফিরে এলাম ক্ষুণ্ণ মনে। ইতিমধ্যে কফি আর ধোসার আয়োজন হয়ে গেছে। বিমলদা বলে—এই ভালো খেয়ে দেয়ে একবার সমুদ্রের ওদিকে চল। কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

ইলা হাসে—কি কিনবেন দাদা।

বিমলদা জানায় নিজের কিছু নাহোক উপসর্গ তো আছেই। তাদের জন্য কিছু তো চাই।

বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রোদ বেশ চনচনে হয়ে উঠেছে। কেনাকাটা সেরে এবার ফিরতে হবে ত্রিবান্দ্রমে। আজই যদি রাত্রে বের হতে পারি ত্রিবান্দ্রম থেকে রামেশ্বরের দিকে। পশ্চিম থেকে পূবের সীমান্তে সমুদ্রে যাওয়া। অনেকখানি পথ, দুবার গাড়ি ডিটার-মেন্ট এটারমেণ্ট আছে।

কোনরকমে চেষ্টা করে আগেকার ট্রেনে যেতে পারলে পৌঁছবো

বেলা তিনটা নাগাদ, নইলে পরের ট্রেনে যেতে হবে। পৌঁছবো আগামীকাল রাত্রি আটটা নাগাদ।

কন্যাকুমারী দর্শন হয়েছে। মনে ভাব উঠেছে রূপক প্রাসাদে; সমুদ্র এখানে ধ্যানে গম্ভীর মত্ত মহাদেবের তাণ্ডব নর্তনের সুরে সেও উত্তরোল হয়ে ওঠে; কুমারীকন্যা যেন ওই রূপহীন মহাজীবনের অন্তর্নিহিত শান্তির দিশারী!

কড়ি শাঁখ কোরাল-এর টুকরো কেনাকাটা করে দেখি ওপাশে একটা লোক কাঁদি কাঁদি তাল নিয়ে বসে আছে। এক একটা তালের ভিতর তিনটা করে তালশাঁস। দাম দশ পয়সা। বলি— ইলা, কলকাতায় ডিসেম্বর মাসে এ জিনিস পাবে না খেয়ে নাও।

বিমলদাও এসে জুটেছে।

—যা বলেছিস। তাছাড়া বেশ ঠাণ্ডা জিনিস। রোদে এতখানি আবার বাস ঠেঙ্গাতে হবে। দাও দিকি বাবা তোমাকে আর বাহার করে তালশাঁস বের করতে হবে না। এমনিই আঙুলের ডগা দিয়ে নিতে পারবো বাবা রাবণ বংশধর।

এবার ফেরার পালা। রোদ চনচনে হয়ে উঠেছে। গাড়ি রোদঢাকা পথ দিয়ে চলেছে, পথে থামলাম। ওচিন্দ্রমে মেলার পরিবেশ তখনও রয়েছে। তবে দিনের বেলায় লোকজন যাত্রী দল কম বা সার্কাস পার্টির তাঁবুতেও এখন দর্শক নেই। দোকানদাররাও বসে আছে। চাল গুঁড়ির তৈরি রকমারি খাবার পিঠে খোসা এইসব।

সুন্দর মনোরম পল্লীর শান্ত পরিবেশে বিরাট পুষ্করিণীর তীরে ওচিন্দ্রম মন্দির। সরোবরের মধ্যেখানেও একটি ছোট মন্দির। দেবতার জলবিহারের সময় ওখানে পূজানুষ্ঠান হয়।

মূল মন্দির পূর্বমুখো। সামনেই বিরাট গোপুরম। গোপুরমটি সাততলা, শীর্ষে ছটি কুম্ভ। নীচের দিকে কাজ সবই পাথরের, নানা দেবদেবীর মূর্তি। উপরের তলাগুলোর কাজ চূণ সুরকি দিয়ে তৈরী। সব মিলিয়ে এটি মনোহর ভাবগম্ভীর।

বিমলদা বলে—জন এর কথাই বলেছিল। এটিও মূলতঃ দ্রাবিড় রীতিতেই তৈরি। ১৫৪৫ খৃঃ এটা নির্মিত হয়।

ভিতরে পথে বাধা দিল পূজারীরা।—এখানে প্রতিষ্ঠিত কন্যা-কুমারীর ধ্যান স্বপ্নময় সেই মহাদেব। রাত্রি শেষে এইখানেই তিনি স্থাপিত হন। আর এগোতে পারেননি। এ মন্দির জাগ্রত। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এখানের দেবতাকে পূজো দিতে আসেন।

বিমলদা বলে—আমরা তো বাবা ইন্দ্র নই। এই আমাদের সুরপতি!

সুরপতি সুর হাসতে থাকে। পূজারীর অনুচর জানায়।

—এ মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে পুরুষদের উর্দ্ধাঙ্গে কোন সেলাই করা পোশাক থাকবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাধা নেই।

সে বোধহয় জামা জুতো পাহারাদার ব্যবসা খুলেছে।

বলে—ওইখানে রেখে যান ওসব।

নেত্যবাবু বলে—আপনারা ভিতরে যান আমি আগলাচ্ছি এসব! ফিরে এলে যাবো।

বিরাট মন্দির করিডর মণ্ডপও সুন্দর। পাথরের কাজগুলো এখানে নিখুঁত।

বিরাট পাথরে নন্দী, ধ্বজদণ্ড, ওদিকের সুন্দর মণ্ডপটাকে বলে এরা চিত্রসভা। অনুমান ১৪১০ খৃঃ এটা তৈরি, ওপাশে চেম্বকরমন্ মণ্ডপম এটা নির্মাণ হয় ১৪৭১ খৃঃ অঃ।

চিত্রসভার একটি এক শিখার তৈরি স্তম্ভের কাছে এসে দাঁড়ালাম। অপূর্ব এর ভাস্কর্য। সব দিক দিয়ে মন্দিরটি ভাবময় সুন্দর।

মন্দিরের কোন দেবতাকে চতুর্দোলায় করে বাইরে প্রদক্ষিণে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে। চতুর্দোলায় বইবার বাঁশগুলো বিশাল মোটা আর চতুর্দোলা সাজাবার ভঙ্গীও মনোরম।

মৃদঙ্গম নাদেশ্বরম্ বাজছে। মন্দিরের পাষাণ শিল্পতলে সেই বিচিত্র সুর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে, পুরোহিতদের সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ-এর রব ওঠে।

সব মিলিয়ে বিরাট বিশাল সেই মন্দির এক অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

মনে হয় শান্ত সবুজ পল্লী চারিদিকে এদের ফল-ফসলের প্রাচুর্য রেলপথ থেকে বিচ্ছিন্ন এই পল্লী ; এখনও ধর্মকে কেন্দ্র করে এদের সামাজিক জীবন আর উৎসব, সব ভাব ভাবনা।

এরা আমাদের মত যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ যন্ত্রযুগের গ্লানিতে কদর্য হয়ে ওঠেনি, যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুরটিকে নিয়ে এরা সুখে শান্তিতে বেঁচে আছে।

এদের প্রয়োজনও কম, তাই কৃষি জীবনের প্রাচুর্যে এরা তৃপ্ত। মনের জ্বালা কোন মহাদেবতার করুণাস্পর্শে প্রশমিত।

এরা সুখে আছে। সুখে থাক। ভারতের আদিম জীবনের একটা ছবি মনকে ভরিয়ে দেয়।

বাস হর্ণ দিচ্ছে। বের হয়ে এলাম। এবারের পাড়ি ত্রিবান্দ্রম। শান্ত পল্লী থেকে চলেছি আবার সহরের পানে।

মাছ অন্ত প্রাণ বাঙ্গালী, তাই মাছ দেখলেই ছোঁক ছোঁক করে বিড়ালের মত। অনেকখানি পথ পার হয়ে এসেছি নগরকোয়েল সহরের চৌরাস্তায়।

বাজারের কোলাহল চলছে। মাঝে মাঝে মাছের ট্রাক এসে থামছে। পেটি পেটি পাইকেরী দরে নিলাম হচ্ছে।

নীলামদাররা হয়ত পা ছুঁড়ছে আর হাঁকছে। দর উঠছে। কেনাবেচা চলেছে। ওপাশে মাছের বাজারও আছে।

চালার। নীচে মাছ নিয়ে বসেছে, পুরুষ দু'দল মেছুনিও আছে মেছুনিদের চেহারাও বিশাল, আর কানের ছিদ্রগুলোয় বিরাট অলঙ্কার, সোনারই। তবে তার ভারে কানের চামড়া ঝুলে পড়েছে।

কদর্য লাগে। ওদের কাছে ওটাই নাকি সৌন্দর্য। ওইটা শুধু

মাছ ওয়ালীদেরই নয়, পথেও অনেক সাধারণ বর্ষিয়সী মেয়েদেরও কানে দেখলাম।

তবে আজকের আধুনিকাদের কানে ওটা দেখিনি। বোধহয় তারা পছন্দ করে না।

ইলা বলে—এত ওজন কানে রাখে কি করে?

জবাব দিই—তোমরাই জানো।

হাসে ইলা—রক্ষা করো, কেউ বিনা পয়সায় দিলেও কোন বাঙ্গালী মেয়ে ওজিনিস কানে পরবে না। একেবারে রাবণের চেড়ীর মত লাগছে। রাবণের দেশে যে এসেছি তা মনে হয়। মাছের বাজারে সের কিলোর ব্যাপার বড় একটা নেই। মাছ ওসব নোনাজলের। রুই, মৃগেল, কাতলা কিছু নেই। একটা মাঝারি হাঙ্গরকে ধারালো ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কেটে তাই বিক্রী করছে। আমাদের দেখে বলে ওঠে—

—ফাইভ রূপিস্!

সরে এলাম। পার্শ্বে জাতীয় এক ধরণের ছোট ছোট মাছ দেখা গেল। দেখতে ভদ্রস্থ। এই মাছ টাকায় বারোটা—শেষ অবধি ষোলটা করে দিতে রাজী হ'ল। অর্থাৎ এক টাকা কিলোই পড়বে মনে হয়। তাই কিছু নিয়ে গাড়িতে তুললাম। ইলাই বলে -আম কিছু নেবেন না?

কদিন ধরে কলা, মুসাম্বি, কমলা লেবু, পেঁপে আর আম দিয়েই খাবারের আয়োজন করতে হচ্ছে। যত্রতত্র খাওয়া, তার উপর ওই ঝাল খাবার ধকলও আছে। ফলাহার না করলে বিপদের সম্ভাবনা। ব্যাপারটা আমাদের চারজনের মধ্যে কো-অপারেটিভ ভাবেই চলছে। ইলাই আমের দর করে। মাঝারী সাইজের পাকা- ডাঁসা, আম টাকায় সাতটা।

নেত্যবাবু তাড়া দেয়,

—মাছ নষ্ট হয়ে যাবে, শীগগীর।

আর কিছুর জন্য না হোক, মাছের মায়াতেই আমাদের এইবার তাড়াতাড়ি ত্রিবান্দ্রমে ফিরতে হবে।

তাছাড়া দেরীও হয়ে গেছে। নগরকোয়েলে ভালো কলাও দামে সস্তা। বিরাট সাইজের কলা পনেরো পয়সা, ত্রিবান্দ্রমে এই কেরালা কলা বিক্রী হয় প্রত্যেকটা চার আনা দরে।

ত্রিবান্দ্রমে আজ আমাদের শেষ সন্ধ্যা। জলের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কেরালার নারকেল বীথি সমাকীর্ণ গ্রামে চাঁদের আলোয় সেই কথাকলি নাচের আসর।

গুরুস্বামী—মীনাক্ষী মেনন আরও অনেকের কথা। লক্ষ্যহীনের মত পথে পথে ঘুরছি। সন্ধ্যা নামছে। কয়েকঘণ্টা পরই আমাদের চলে যেতে হবে।

—বাবু! রিয়েল রোজ উড, বাফেলো হর্ণমেড!

একজন ফিরিওয়ালা নানা খেলনা নিয়ে ফিরি করছে। ছোট হাতী, মোষের সিং-এর বাঘ, সাপ, সারস অনেককিছু। ইলা দর করে—ছুটো হাতী।

—কত করে?

বাধা দিই—মহীশূরে যাবে, সেখানেও তো পাবে এসব।

ইলা বলে—তবু ত্রিবান্দ্রমের স্মৃতি কিছু থাকবে না?

জিনিস দিয়ে স্মৃতিটাকে সঞ্চারিত করে রাখতে চায় সে। ফেরিওয়ালা বলে—বারো টাকা!

—চার টাকা!

আমার কথা শুনে ইলাও হকচকিয়ে যায়। শেষ অবধি পাঁচ টাকায় দিয়ে দিল সেটা, কয়েকটা অন্য জিনিসও নিলাম।

একজন ভদ্রলোকও দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বলেন,

—বেশী দাম নেয়নি। এসব ওরা নিজেরাই তৈরি করে তাই কম দরে দিয়েছে, দোকানে এর দর অনেক বেশী। তাছাড়া শিঙের

তৈরি জিনিসপত্র মাইশোরে পাবেন না, যদিও বা পান সে-সব এদিক থেকেই যায়। তাই দাম বেশী সেখানে।

রাত হয়ে আসছে।

ইলা বলে—এবার তো ষ্টেশনে ফিরতে হবে।

—চলো!

ইলা বলে—ষ্টেশনে গিয়ে চিঠির বাক্সটা দেখতে হবে। ক'দিন কলকাতার চিঠি পাইনি।

বলি—এত চিন্তা কেন? মা ছাড়া ভাববার আর কি কেউ আছে?

ইলা আমার দিকে চাইল, যেন চকিত হয়ে উঠেছে সে।

—না! নিজেকেই কেন্দ্র করে এবার মার ভাবনা ভাববো। অন্য কারো জন্যে ভেবে ভেবে আর দুঃখ পেতে মন চায় না।

জবাব দিই—মনের যে কি চাওয়া তা কি কেউ জানে?

—মানে! ইলা আমার দিকে চাইল।

গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে ওর সচকিত সুন্দর মুখে। আমার দিকে কি ব্যাকুল চাহনি মেলে চেয়ে আছে সে।

—কোনদিনই কিছু চাইনি ইলা। তাই হয়তো জীবনের একটা দিক শূন্য রয়ে গেছে।

কথার জবাব দিলনা সে। ছায়ামূর্তির মত ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে আসি ট্রেনের কিছু আগে।

রাতের অন্ধকারে নারকেলবীথি সমাকীর্ণ খাল—পল্লীভূমিকে বিদায় জানালাম। আজ সারারাত্রি, কাল সারাদিন পথে পথেই কাটবে, তারপর পৌঁছবো দ্বীপতীর্থ রামেশ্বরমে।

মাদুরা এক্সপ্রেসে চলেছি। রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ভোরের আলো সবে আকাশে দেখা দিয়েছে—ত্রিরুদনগরে আমাদের কামরাটাকে কেটে রেখে মাদুরা এক্সপ্রেস চলে গেল মাদুরার পানে।

এখান থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটি শাখা লাইন ধরে আমরা যাবো মন্‌মাড়ুরা জংশনে। ওটা মাদ্রাজ রামেশ্বরম মেন লাইনে পড়ে। মন্‌মাড়ুরা থেকে আবার কোন ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেবে, রামেশ্বরমের পথে।

ষ্টেশনের বাইরে সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে আছি। ভিরুদনগর কার নামে তৈরি তা জানিনা, নগরটাই বা কোনখানে তাও দেখছি না। ওপাশে দেখা যায় বার্মাশেলের কয়েকটা তেলের ট্যাঙ্ক; আরও পিছনে প্লাটফরম।

রেলওয়ে টাইম টেব্‌লে এই নগর সম্বন্ধে অনেক কিছুই মার্কা দেওয়া আছে। কলের জল ওয়েটিং রুম—ভেজিটেরিয়ান রিফ্রেসমেণ্ট-রুম ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো যে কোনখানে তা খুঁজে বের করা মুস্কিল।

চলন্ত ষ্টল কটি দেখলাম। কর্কশকণ্ঠে বিজাতীয় শব্দে তারা হাঁকে,

—খাবি! খাবি—খাবে!

বিমলদা বলে—খাবি খেয়ে খতম হবার যোগাড় হয়েছি বাবা আবার খাওয়ানো কেন?

—কফি। কফি বেচ্ছে ওরা!

—চা নেই? নিকুচি করেছে ওদের খাবির।

ইলা বলে—আজ আর উপায় নেই, খাবিই খেতে হবে, দুপুরে লাঞ্চ এ্যাট মন্‌মাড়ুরা রেলওয়ে ক্যাটারিং। মধুবাবুতো এখান থেকে তার করে দিল দেখলাম।

বিমলদা হতাশ ভাবে বলে—তবে আর কি! পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে মন্‌মাড়ুরা! আরে বাপু মনবৃন্দাবনের নামই শুনেছি, আবার মন্‌মাড়ুরা।

জবাব দিই—মাড়ুরার অন্য নাম মথুরা; দক্ষিণের মথুরা! তাই মন্‌মাড়ুরাও আছে।

বিমলদা কফির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে চমকে ওঠে। দারুণ

তেতে উঠেছে ওই পিতলের ছোট্ট গেলাস। রাগত স্বরে বলে—থাম তুই দীপু, আর সাহিত্য ফলাসনি। আরে বাপু বৃন্দাবনের গোপিনীদের দেখেছিস? আর এখানে বাপ্‌রে! রাম আর রামছাগলের তফাৎ। থাম দিকি! জ্বলে গেলাম।

ওপাশেই আর একটা রিজার্ভ কামরা রয়েছে তাতে উঠেছে এখান থেকে রামেশ্বরের যাত্রীদল। কেল্লিবিল্লি নারী পুরুষের ভিড় ওদের কামরা বোঝাই দুজন লোক বালতিতে করে ইডলি ধোসা আর গ্লাসে কফি পরিবেশন করছে।

সুরপতি বলে—সোজা ব্যাপার। কেমন ব্রেকফাষ্ট-এর মেডইজি করে নিল এরা দেখলেন?

বেলা হলেই গাড়ি চলল। মন্‌মাত্থুরার দিকে এগিয়ে চলেছি এবার।

বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছবো মন্‌মাত্থুরা। এদিকের মাটি তেমন উর্বর নয়। রুক্ষ। জোয়ার বজরাই হয় বেশী। আর আছে বাবলা গাছ। বাবলার বন। মাঝে মাঝে ক্ষেতে কার্পাস-এর চাষও আছে। ছোট গাছগুলোয় ফুল দেখা দিয়েছে। তুলোতে ভরে উঠবে এইবার।

ট্রেন মৃদুমন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মন্‌মাত্থুরায় পৌঁছানোর একটু পরই আসছে রামেশ্বর এক্সপ্রেস। ষ্টেশন কর্তৃপক্ষকে ধরলাম।

—যদি এই এক্সপ্রেসে আমাদের জুড়ে দাও, তাহলে একটু আগে আমরা রামেশ্বর পৌঁছতে পারি। পাম্‌বান ব্রিজও দিনের আলোয় পার হবো।

ভদ্রলোক আমার দিকে আপাদ-মস্তক চাহনি মেলে দেখলেন! কপালে বিশাল রক্তচন্দনের তিলক, তাতে পড়েছে ছাই এর অনুলেপন। বিশাল চেহারায় একটা রুক্ষ কর্কশ ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমার পিছু পিছু সেই ভিরুদনগর থেকে জোড়া রিজার্ভ গাড়ীর

দেশওয়ালি ভাইও এসে জুটেছে। পরণে সাদা লুঙ্গি, তাও পাটকরা হাঁটুর উপর তোলা, ফতুয়া আর কাঁধে তোয়ালে।

সেও গড় গড় করে কি বলে গেল।

এর পরই ষ্টেশন মাষ্টারমশায় আমাকে জানালেন,

—সরি। তোমাদের পেছনের প্যাসেঞ্জারেই যেতে হবে। মাদ্রাজ এক্সপ্রেসের এত হল্টেজ ক্যাপাসিটি নেই। আইনের কথা। আসল ব্যাপার যা হোল তা স্বচক্ষে দেখলাম। পিছনের সেই ভিরুদনগর থেকে আসা গাড়িখানাই এক্সপ্রেসের সঙ্গে জোড়া হ'ল, আমরা পড়ে রইলাম সেই বাবলা বন ঘেরা ষ্টেশনে নির্মম ভাবে উপেক্ষিতের মত।

বিমলদা বলে—এ হবে আমি জানতাম। দেশের লোকদের ওরা আগে দেবেই। এ পোড়া দেশে মানুষ আসে গা! ফিরে গিয়ে বলবি—কেমন মিষ্টি মিষ্টি গলাধাক্কা দেয় এরা। যদি বুঝতে পারে এতে তোমার উপকার হচ্ছে তখুনিই অন্যপথ ধরে এরা! এ্যাদ্দিন পথে পথে ঘুরে কি শিখলি? এঁ্যা!

চুপ করেই রইলাম। দলের ম্যানেজার মধুদা বলে—কি আর করা যাবে। যান—চান করে খেয়ে দেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন দাদা, পরের ট্রেনে যাবো আর কি?

স্নানের ব্যবস্থা বলতে যত্রতত্র আর কি। একটা কল আছে প্লাটফরমে, আর আছে ইঞ্জিনের জল নেবার ওয়াটার কলম।

সেখানে আপনা থেকেই পাইপ দিয়ে বেশ জোরে জল পড়ছে। তেল মেখে তারই নীচে দাঁড়ালাম।

…হৈ হৈ করে এগিয়ে আসে এক কৃতী কর্মচারী।

জানায় হাত পা নেড়ে।

—নো বেদিং!

—জল যে উপচে আপনা থেকে পড়ছে গোপাল! আমরা তো কল খুলিনি! পারো তবে বন্ধ করে দাও।

সে বেশ বুক চিতিয়ে এসে কল বন্ধ করার চেষ্টা করে। প্যাঁচটা

বোধ হয় কাটা বা আলগা ছিল, ঘোরাতেই সবসমেত খুলে যায়। একেবারে দারুণ তোড়ে হুড় হুড় করে জল বের হতে থাকে।

সেই সজাগ কর্মচারীটিই জলের তোড়ে গঙ্গার সামনে নামা ঐরাবতের মত নেয়ে ডুবে একাকার হয়ে যায় পোশাক সমেত। ডুবে উঠে সেই যে দৌড়ল বাছাধন—আর এলো না।

জল পড়েই চলেছে, শেষকালে ওয়াটার ওয়ার্কসের কর্মচারীরা রেঞ্জ হাতুড়ি নিয়ে যখন এল কল মেরামত করতে তখন আমরা খেতে চলেছি।

ওপাশে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন সেই কর্তব্যনিষ্ঠ আইনজ্ঞ রেলকর্মচারী, যিনি আমাদের এই বাবলা বনে এই মূল্যবান পাঁচঘণ্টা সময় আটকে রেখে দিলেন। তিনি এগিয়ে আসেন।

—টিকিট!

বিমলদা চটে ওঠে। সুরো, টিকিটটা এই পাঁচুকে একবার দেখিয়ে দে। সুরপতির সম্বন্ধে আমার রীতিমত ভয় আছে, ওর রসিকতা সব নীতির বাইরে। মুখেরও কোন আড় নেই। সুরপতি যেখানে সেখানে যে কোন রকম দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে, ইতিপূর্বে করেছেও।

যা হোক ভদ্রলোক কি ভেবে সরে গেলেন সেখান থেকে, আমরা গিয়ে ঢুকলাম ডাইনিং রুমে।

কলাপাতা পাতায় ছোট্ট দুবাটি ভাত আর একটু শব্জী আর কাঁচা লঙ্কা দেওয়া তরল ডালের মত কি দিয়ে গেল। সম্বরম্, সেইসঙ্গে কাঁচাকলা সেদ্ধ করে তাতে কাঁচালঙ্কা আর মশলা দিয়ে ভর্তা মত।

হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন পথে পথে ঘুরেছি। এদের খাবারের পদ কিছুটা জানা আছে। তাই হাঁকলাম।

—নেই! নেই কাঁহা?

তখন বের হ'ল ঘি। কি ঘি কে জানে? কোন গন্ধ-স্বাদও নেই। তরল পদার্থ মাত্র, আবার হাঁকতে হ'ল রসম, পাপ্‌ড়ম—

তখন ও ছুটো এল।

ভাত আর দেবেনা, ছুবাটি ভাত—চার গ্রাসে ফুরিয়ে যায়। ওই রসম্—কাঁচাকলা সেদ্ধ দেবে কিছুটা, ভাত চাইলে চার আনায় আবার ছু বাটি।

অন্যান্য রেলওয়েতে দেখেছি—রাজস্থান, গুজরাট, পুণা অঞ্চলেও দেখেছি, চারবাটি ভাত স্ট্যাণ্ডার্ড খানা, না হয় ছুবাটি ভাত আর চারখানা চাপাটি দেয়। এরা ছুবাটি ভাত দিয়েই কৃতার্থ করে দিল।

চাইতে তবে এল পাতলা ঘোল, মোর।

সহজে কিছু দিতে এরা একান্ত নারাজ, তবে পুরো দাম ঠিকই চার্জ্জ করে নেবে।

বিমলদা বলে—এদের ক্ষেতে এত ধান, তবু পেট পুরে ভাত খাওয়াতে এরা জানে না বোধ হয়!

জবাব দিই—গুচ্চের ভাত খেয়েই তো বাঙ্গালী রসাতলে গেল!

—যাক! বিমলদা উঠে এল ওই কোনরকমে খাওয়া সেরে।

একেবারে সামান্য পল্লী অঞ্চল। ষ্টেশনের বাইরেই বাবলাবনে ঢাকা একটা পথ গেছে, দূরে বাজার বসতির মত। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। কি একটা কারখানাও তৈরি হচ্ছে।

কোন বিদেশী লোক এদিকে আসে না—তাই ওদের ভাষা ছাড়াও একবর্ণ তারা জানে না অন্য ভাষা।

ইংরাজী জানা লোক পেলাম একজনকে। তিনিই বল্লেন।

—এখান থেকে কিছু দূরে পল্লব রাজাদের তৈরি একটা গুহামন্দির আছে। খানিকটা বাঁদিকে গিয়ে হাঁটতে হবে।

বিমলদা পানের ধান্ধায় বের হয়েছিল। পেয়েছে ওই পানপাতা—চুন আর পুরিয়ায় সুপারি। রেগে মেগে বলে,

—আর গুহামন্দির ঢের দেখেছিস্। এখানে দেখে কাজ নেই। চল দিকি!

ফেরার পথে একছড়া কলা কেনা হ'ল, চাঁপা কলা। তাই খেতে

খেতে এলাম। তবু পেটে একটু ওজন পড়ল। সেই ভাতচাট্টি আর কাঁচাকলা সেদ্ধ এতক্ষণে কোথায় তলিয়ে গেছে।

একটা দোকানে কলাইএর গরম বড়া ভাজছে। এইটুকু বড়ার দাম বলে সতেরো নয়া পয়সা।

বিমলদা চটে ওঠে, গোপাল সতেরো নয়া পয়সায় ওইটুকু ঘিয়ে ভাজা বড়া মেলে; গলা কাটবি বাবা! ইস্! চলে আয়!

ষ্টেশনে ফিরলাম।

দেখি গাড়ীখানাকে তখন পাশের প্লাটফরমে আনা হয়েছে, রামেশ্বরগামী যাত্রীট্রেন আসতে আর দেরী নেই। প্লাটফরমে এসে জমা হয়েছে কৌপীনপরা কিছু লোক, গায়ের রংও তেমনি কালো, গলায় রঙ্গীন পুঁথির মালা, সঙ্গে বড় বড় জালের মত বস্তু!

মেয়েরাও কলরব করছে। একজন যাত্রী বলে,

—ওরা সব ধনুষ্কোডীর জেলে! কয়েক বৎসর আগের সাইক্লোনে ধনুষ্কোডী থেকে ওরা উৎখাত হয়ে এসেছে। ওদের অনেকেই শেষ হয়ে গেছে সমুদ্রের তুফানে।

ওরাও এখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে অনেকেই মস্তপম্, পাম্বান না হয় রামেশ্বরম্-এর সমুদ্রতীরে আবার বসত গড়েছে।

ওদের চীৎকারে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে প্লাটফরম মুখর হয়ে উঠেছে।

বৈকালের আলো নামছে নির্জন পল্লী প্রান্তরে। দু-একটা ছোট ছোট ষ্টেশন পার হয়ে চলেছে গাড়ী। মাঠের মাঝে বড় বড় জলা— লাইন চলে গেছে ওরই মাঝ দিয়ে। দুপাশের জল এসে লাইন ছুঁই ছুঁই করছে।

ভারতের নিম্নভূমি, তাই এখানে জল সহজেই জমে। অবশ্য ওই বড় বড় জলাভূমিকে ওরা কাজে লাগিয়েছে।

ফল ফসল বলতে ওই ধান, আর সামান্য কিছু আখ। নারকেল গাছ এদিকে কিছু কম।

সামনে বড় একটা ষ্টেশন আসছে বোধ হয়! বলে বিমলদা। সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয়েছে সহরে।

—বড় বড় বাড়ী, চার্চ, বোধ হয় কলেজই হবে ওটা!

বিজলী বাতি দিয়ে নববর্ষ উপলক্ষ্যে সাজানো হয়েছে।

ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। রামনাথপুরম্ এ অঞ্চলে বেশ বড় ষ্টেশন, সহরের ছাপও কিছু রয়েছে।

এরপরই সুরু হবে সমুদ্রের পরিবেশ। গাড়ী এবার মন্ডপম ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমলদাই এবার নিজে নেমে ফ্লাস্ক ভর্তি কফি এনেছে। কাপে ঢালতে ঢালতে বলে,

—মন্ডপম-এর এইখানেই মিহির সেন সিংহলের তালাইমান্নার কোষ্ট থেকে সাঁতার দিয়ে এসে উঠেছিল। বেচারীর বরাত খারাপ, নইলে ধনুষ্কোডী মিস করে আরও পনেরো বিশ মাইল সমুদ্রের তুফান ঠেলে আসতে হয়েছিল!

—খুব রাফ্ এখানের সমুদ্র?

—মন্ডপম্ পার হয়ে পাম্বান ব্রিজে উঠলে নমুনা দেখবি একবার।

চাঁদের আলোয় এবার দেখা যায় নারকেল কুঞ্জ। বালিয়াড়ির শুরু হয়েছে। মন্ডপম্ ষ্টেশনের আশপাশে আলো জ্বলছে। ওদিকে একটু লোকালয়—তার সীমা পারেই চাঁদের আলোয় দেখা যায় সমুদ্রের মুক্ত অবাধ বিস্তার।

বাতাসে ওই উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের কলকল্লোল। ইতিমধ্যেই শাঁখ-কড়িতে নাম লেখাবার জন্য লোকজন প্লাটফরমে এসে হানা দিয়েছে। ছোট ছোট কড়ির মালা আর ছোট শাঁখের নমুনা এনেছে।

নাম লিখে দিয়ে গেলে ফেরবার সময় ওরা ট্রেনে মাল ডেলিভারি দেবে। টাকায় ষোলটা করে কড়ি—বড় হলে আটখানার দর।

বিমলদা বলে,

—আর জ্বালাসনা বাপু, নাম লিখিয়ে আর দরকার নেই।

নেত্যবাবু বের হয়ে এসেছে।

রামেশ্বরম্ আসার সব নিদর্শনই সে নিয়ে যেতে চায়, তাই রীতিমত দরদস্তুর করে সে বড় কড়ির গায়ে নাম লেখানোর ব্যবস্থা করে।

সুরপতি বলে—বৌদির নাম লেখানো কড়িও নিয়ে যাবেন দাদা।

নেত্যবাবুর কথাটা মনে ধরে। নাম লেখানোর বহর দেখে কড়ি-শিল্পী তো থ'।

—ক্যা নাম বাবু?

—জগদ্‌জননী চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যকালী চট্টোপাধ্যায়।

—জননী দেবী হোবে, বাকী আই কানট্ রাইট অন এ সেল। ছোটা শেল।

সুরপতি বলে—একটা পাথরেই লিখে দিস্ বাবা যুগলের নাম।

নেত্যবাবু ধমকে ওঠে—তবে আর লিখিয়ে কাজ নাই। যা দিকি।

…মন্ডপম ষ্টেশন থেকে এইবার ট্রেন ছাড়ছে। সামনে সমুদ্র আলোয়, সেখানে তুফান চলেছে। একদিকে ছিল সমুদ্র এবার দু'দিকেই এগিয়ে এসেছে জলধারা, পূর্ণিমার জোয়ার এসেছে সমুদ্রে।

ওপাশে সমুদ্রের দিকে দূরে রামেশ্বরম্ দ্বীপে জ্বলছে লাইট হাউসের আলো। ঘূর্ণায়মান ওই আলোটা সমুদ্রের বুকে এসে পড়ছে এক একবার তির্যক রেখায়।

…কলস্রোতে বয়ে চলছে সমুদ্র।

জোছনা-রূপালী ধারায় সফেন সমুদ্র মত্ত আবেগে আছড়ে পড়েছে শিলাগুলোর উপর। মন্ডপমের নীচে থেকেই জলের তলে শিলাপ্রাচীরের মত একটা পথ চলে গেছে।

বিমলদা বলে—এই হচ্ছে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধের পথ নির্দেশ। এখান থেকে এমনি পথ বরাবর চলে গেছে ওপারে পাম্বান ষ্টেশনের নীচে অবধি, তারপর আবার রামেশ্বর দ্বীপের অন্য প্রান্ত ধনুষ্কোডী থেকে পক্‌প্রণালীর নীচে দিয়ে গেছে সিংহলের তনন্ মাইল পর্যন্ত।

গাড়ীতে মন্তপম্ রেল কর্মচারী একজন উঠেছেন। বোধ হয় টিকিট চেকারই হবে। তিনিও সায় দেন।

—ইয়েস, ১৪৮০ খৃঃ এই পাথর পথের অনেকটা সমুদ্রে চলে যায়। তখন থেকেই দু'দিকের সমুদ্র এটাকে অনেক ডুবিয়ে দেয়, তামিল ভাষায় পম্বন মানে সাপ। সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে এই জলধারা, তাই একে বলা হয় পম্বন। তখন রামেশ্বর ছিল পুরোপুরি একটা দ্বীপ, মূল ভূখণ্ড ওই মন্তপম থেকে রামেশ্বরম দ্বীপের পম্বন পর্যন্ত নৌকাতেই যাতায়াত হতো। পরে ১৯১৩ খৃঃ অঃ পাম্বান ব্রিজ তৈরী করে রামেশ্বরম্ দ্বীপ অবধি রেল লাইন পাতা হয় পম্বন থেকে একটা লাইন ছিল রামেশ্বরম্ অন্যটি ধনুষ্কোডী পর্যন্ত।

গম্ গম্ শব্দ ওঠে, নীচে সীমাহীন জলরাশি এসে আছড়ে পড়ে পাথর সীমার উপর ছিটকে ওঠে জলরাশি ট্রেনটা ভীত ত্রস্ত হয়ে যেন ওই অকূল সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছে, নীচে হাজার সর্পিল জিহ্বা মেলে ওর দিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, ওর লালসা থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে ট্রেনটা। পালাচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ওকে ওই জলধারার ক্ষুব্ধ বুকে টেনে নিয়ে নিঃশেষ করে দেবে।

ইলা বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

কত লম্বা! এ পথের যেন শেষ নেই?

সাত হাজার ফিট লম্বা এই ব্রিজ।

মাঝখানে জলটা বেশ গভীর, খানিকটা জায়গায় পাথর প্রাচীর সরানো, এইদিকে জাহাজ চলাচল করে। সেইখানে ব্রিজটা খোলা যায়, উপরে উঠে যায় রেল লাইন সমেত, এই রীতিকে বলে Basoule Lift. মধ্যে এই জায়গাটুকুর ব্রিজ তৈরি করেছে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, তাদের নাম অনুসারে অংশটির নাম Scherezer Bridge.

...আবার সেই পাথর ভরা সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলেছে ট্রেনটা, ওপারে মন্তপম্-এর আলোগুলো ক্ষীণ হয়ে আসে।

এদিকে এগিয়ে আসে গামবানের আলো। ঘর-বাড়ী নারকেল গাছ-এর রাজ্য দেখা যায়। একটা ফাঁড়া যেন পার হয়ে এলাম আমরা।

ইলা বলে—বাবাঃ বাঁচা গেল। কি সাংঘাতিক ব্রিজ রে বাবাঃ। এই একালের সেতুবন্ধ।

বিমলদা বলে—এই পথকেই বলা হতো Adam's Bridge. কথিত আছে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে আদম ওই সিংহলেই এসে উপস্থিত হন। আরব বণিকরা তখন এদিকে আসতো, এ বোধ হয় তাদেরই এই চলিত কাহিনী। আদম ইভকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এই সেতু পথ দিয়ে সিংহলে গিয়ে উপস্থিত হয়। পরে এসব জলে ডুবে যায়।

সেই টিকিট চেকার ভদ্রলোক বলেন,

—তা সম্ভব। চোখের সামনেই তো দেখলাম তু'বৎসর আগে এমনি খানিকটা ধ্বংসের দৃশ্য। আপনারাও কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

অনেক গুজবই রটেছিল তু'বছর আগে সাইক্লোনের সময়। এখন দেখি তার অনেকখানি সত্য।

ব্রাডশ, রেলওয়ে টাইম টেব্‌লে একটি ষ্টেশনের নাম আছে, তার নাম ধনুস্কোডী। কিন্তু কোন টাইমিং নেই, কোন ট্রেন সেখানে যাচ্ছে তার কোন উল্লেখ নেই।

ইচ্ছা ছিল সেখানেও যাবো। কিন্তু রেলের সেই ভদ্রলোকই জানান কারণটা।

সেবার সাইক্লোনের সময় ধনুস্কোডী থেকে একটা ট্রেন প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসছে গাম্‌বানের দিকে, রেলপথ ওখানে যেন সমুদ্রের বুক চিরে গেছে। তু'দিকে সমুদ্র সরু মাটির একটু ফালি তার মধ্য দিয়ে লাইন ছিল প্রান্তে ছিল ধনুস্কোডী পিয়ার, ওখান থেকে জাহাজ যেতো সিংহলে তারপরই ধনুস্কোডী, সঙ্গমতীর্থে স্নান করতে যেতো সেখানে যাত্রীরা।

এইখানেই শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের পর ফিরে এসে পিছনে শত্রুর

পুনঃ আক্রমণ রোধ করবার জন্য ধনুকের দ্বারা সেতুপথ ভগ্ন করে দেন তাই এই জায়গার নাম হয়েছিল ধনুষ্কোডী।

রাবণ হত্যার পর রামচন্দ্রকে ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্পর্শ করেছিল। রাবণ ছিলেন মুনির ঔরসজাত সুতরাং ব্রাহ্মণ, তাই ব্রহ্ম হত্যার পাপ রামচন্দ্রকে ছায়ার মত স্পর্শ করেছিল। রামচন্দ্র এপারে এসে এই ধনুষ্কোডী তীর্থে স্নান করে সেই ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

তাই ধনুষ্কোডী তীর্থে স্নান করতে যেতো যাত্রীরা। শ্রুতি আছে।

—রামস্য ধনুষঃ কোট্যা কৃত রেখাবগাহনাৎ।
পঞ্চপাতক কোটীনাং নাশঃ স্যাত্তাৎক্ষণে ধ্রুবম্॥

সেই পুণ্যতীর্থে স্নান করতে গিয়ে যাত্রীরা দেখল, দু'দিকে দুর্যোগময় সমুদ্র, ট্রেনখানা আসছে, দু'দিকের সমুদ্র থেকে বিরাট প্লাবনের ঢেউ এসে যাত্রী সমেত সেই ট্রেনখানাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সমুদ্রে। চমকে উঠি সেই দৃশ্যের কল্পনা করে। ও ঘটনা পাম্‌বান ব্রিজের উপরও ঘটতে পারে।···

—তারপর।

—আর কারোও সন্ধান পাওয়া যায় নি। ট্রেনখানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; শুধু লোহার চাকা বিম কিছু পড়ে ছিল। বাকী সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছল।

পাম্বান ব্রিজের সব গার্ডারও উড়ে গিয়েছিল, টিঁকে ছিল মাত্র ওই পিলারগুলো। সেই থেকে ধনুষ্কোডীর রেল লাইনও বন্ধ। ধনুষ্কোডীর অনেক অংশ জলের তলে। ও সেকশন এখন বন্ধ।

তাই বলছিলাম—এও তো দেখলাম, সুতরাং কয়েক শতাব্দী অতীতে যে তেমন কোন পথ ছিল না একথা অস্বীকার করা যায় না।

ট্রেনটি পাম্বান ষ্টেশনে ঢুকছে।

এককালে এটি জংশন ষ্টেশনই ছিল, বোট মেল যেতো

ধনুষ্কোডীতে। রামেশ্বরমে যেতো কয়েকটি গাড়ী, এখন সব ট্রেনই যায় রামেশ্বরমে। ধনুষ্কোডী আর নেই।

…একটি দ্বীপ। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ মাত্র ওই ব্রিজটুকু। ইলেকট্রিক টেলিফোন্ টেলিগ্রাফের তার এসেছে ওই পথে কতক আছে জলের নীচে।

পাম্বান থেকে ট্রেন চলেছে রামেশ্বরমের দিকে। মাইল বারো পথ, রেল লাইন খুব শক্ত মাটির উপর নয়, বেশীর ভাগই এখানে বালি। গাছ-গাছালি বলতে ওই নারকেলগাছ, আর মাঝে মাঝে মাথা তুলেছে কেয়ার জঙ্গল।

বসতি আছে খুব সামান্যই; দু-একটা ষ্টেশন পড়ে। তার লাগোয়াই লোকালয়, তারপর বন-ঝোপ-জঙ্গল। এ দ্বীপ তত উর্বর নয়। ফল ফসল সামান্যই, সে বালির আবরণ থেকে যেখানে মাটি মুক্তি পেয়েছে সেখানে ফসল ফলেছে, অন্যত্র সব বালি ঝাউগাছ না হয় কেয়াগাছের জঙ্গল।

ট্রেনটা এসে দাঁড়াল রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে। গাড়ীর সব যাত্রীরাই কি এক আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে, রামেশ্বর-কি—জয়।

হিন্দী তামিল তেলেগু মারাঠী গুজরাটি সব ভাষা যেন একাকার হয়ে গেছে।

রাত্রি আটটা বাজে।

মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া ষ্টেশন থেকে মন্দির প্রায় মাইলখানেক দূরে।

মধুদা বলে,

—ওদিকে রেলওয়ে ক্যাটারিং বন্ধ হয়ে যাবে। খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বরং একটু ঘোরাঘুরি করা যেতে পারে।

—আবার সেই রেলওয়ে ক্যাটারিং। ওবেলায় মন্মাদুরার অভিজ্ঞতা তখনও ভুলিনি, বিমলদা বলে।

—যা হোক খেয়ে-তো নিই।

শীত এখানে অনেক কম, কন্যাকুমারীর মতই, রাতের বেলাতেই বেশ যুৎ করে মাথা হাত মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

টানা টেবিল চেয়ার আছে। মেনু সেই একই ভাত রুসম্ কাঁচকলা সেদ্ধ, পাপডম্ আর উরুকায়, একটু লেবুর চাটনী বোধ হয়। ফর্মুলা সেই এক। ভাতও আধপেটা, আরও চার আনা চার্জ দিয়ে ভাত নেওয়া গেল।

বিমলদা বলে।

ম্যানেজারের যে রকম ডাটো চেহারা ওকি এই দু মুঠো খাদম্ খেয়েই? শুধোবো ও কি খায়?

ইতিমধ্যে দেখি ক্যাটারিং-এর একটা বয় সে বোধ হয় বাইরে গিয়েছিল ফাঁকি মারতে, এই অসময়ে দমকা খদ্দের জুটে যেতে দেখে রেগে ম্যানেজার নিজেই পরিবেশন করছিল, ছেলেটাকে ফিরতে দেখে সোজা গিয়ে এঁঠো হাতেই আমাদের সামনেই একটা ধাক্কা দিয়ে গোটাকতক চড় লাগায়।

ছেলেটিও রাবণের অন্যতম বংশধর বোধ হয় সেও রুখে দাঁড়িয়েছে। শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ বাধে আর কি! আমরাই উঠে গিয়ে থামালাম।

ছেলেটা তখন বিশুদ্ধ তামিলে কি সব বলে চলেছে ম্যানেজারও ষাঁড়ের মত হাঁক পাড়ছে।

ছাড়াতে গিয়ে আরও বিপদ। দুজনের মুখ থেকে পিচকারীর মত থুথু বের হচ্ছে। মুখ ভরে গেছে ওদের থুথুতে। যে যায় তারই সেই অবস্থা। পাঁচ সাতজন সরে এসেই কলে গেছে মুখ ধুতে।

খাবার আর প্রবৃত্তি নেই। উঠে পড়েছি, বিমলদা বলে।

—সব গট্ আপ ব্যাপার বুঝলি। গোয়ালন্দের হোটেলে খেয়েছিস? খদ্দেরকে ডাকবে আসুনবাবু, পাকা পায়খানা ত পাবেন ভালো, ভাত তরকারী ছুটো মাছ, মাছের মুড়ো পাতে ও ভাত ডাল তরকারী দিয়েই, হাঁকবে ঘণ্টা হইয়া গেল বাবু, ঢাকা মেল—চাঁটগা মেল।

রইল খাওয়া, পুরো পয়সা দিয়ে ছুটলো বাবুরা গাড়ীর দিকে, এদেরও কি সেই মতলব র‍্যা! খেতে বসিয়ে মাঝখানে লাগালো গজ কচ্ছপের যুদ্ধ, কাহাঁতক খাওয়া যায়। খুব খেয়েছি, চলদিকি এইবার' রামচন্দ্র আর দেশ পেলনা র‍্যা?

বেশ বড়সড় ষ্টেশন, ইলা সেই যে হাসতে সুরু করেছে তার হাসি থামেনি, ওদের যুদ্ধের দৃশ্যটা কল্পনা করছে আর হাসছে।

—খুব লেগেছিল যা হোক!

ষ্টেশনে নিওন বাতি জ্বলছে, ওপাশেই রিটায়ারিং রুম-এর সীমানা। সামনের বাগানে ছোট ছোট নারকেলগাছে বিরাট বড় সাইজের কাঁদি কাঁদি ডাব ঝুলছে।

ওদিকের প্লাটফরমে বিরাট তালপাতার চাটাই জড়ানো মাছের পেটি, বাইরে সব চালান যাচ্ছে। সামনেই বের হবার রাস্তা।

ডানহাতে একটা মস্ত হলঘর। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ওয়েটিং হল। সিমেন্টের স্লাব জমিয়ে বেঞ্চের মত করা, অনায়াসে তাতেই বহু লোক শুতে পারে। কল ইত্যাদির ব্যবস্থাও বেশ রয়েছে।

ছোট হলেও ষ্টেশনের বহিরাগত-যাত্রীদের জন্য অনেক ব্যবস্থা আছে। বিমলদা বলে।

—তীর্থযাত্রী এখানে প্রচুর আসে। দক্ষিণ ভারতে যারা আসে তারা এইখানে অতি অবশ্যই আসবে। কন্যাকুমারী দূরের পথ—ঘুর পথ। অনেকে হয়তো যায় না। তবে এখানেই ভিড় বেশী।

কথাটা সত্যিই। তা পরেও দেখেছি।

চাঁদের আলোয় পথ ছেয়ে গেছে। ছোট্ট জায়গা রামেশ্বরম্। সবকিছু ওর বাড় বাড়ন্ত মন্দিরকে কেন্দ্র করে। তবু পথে বিজলী বাতি আছে, পিচালো পথ।

এগিয়ে চলেছি আমরা।

বেত দ্বারকার কথা মনে পড়ে। সেও একটি দ্বীপ। তবে এত

উর্বর নয়। গাছপালা নেই। নেই নারকেল গাছের ভিড়, ঝাউগাছও নেই। এত খোলামেলাও নয়।

—কেমন যেন নির্বাসিত একটা দ্বীপ। তার তুলনায় রামেশ্বরম অনেক সহজ জনবহুল উন্নতও।

রাস্তাটা একদিকে মন্দিরের পানে চলে গেছে—ডানহাতে বেঁকে আমরা সমুদ্রতীরের দিকে চলেছি।

কতকগুলো ঝুলিয়া—জেলেদের বসতি। সামনেই সমুদ্র। চাঁদের আলোয় বালির বুকে রূপালী জ্যোৎস্নার মমতাময় স্পর্শ, নীল সমুদ্র এসে তার প্রান্তে লুটিয়ে পড়ছে।

সামনেই বাঁধের উপর কতকগুলো বড় বড় চৌবাচ্চা মত করা। একপাশে একটা আধুনিক ষ্টাইলের বাড়ী উঠছে।

বালিয়াড়ির উপরই কাঁটাতারের বেড়াঘেরা শেড, খড়ের না হয়ে নারকেল পাতার চাল। এখানে দেখেছি অনেক বাড়ীর চাল ওই নারকেল পাতা না হয় তালপাতা দিয়ে তৈরি। পাতাগুলোকে সরু লম্বা করে চিরে চিরে ছাউনী বানানো হয়।

সামনেই সমুদ্রের দিকে একটা জেঠির মত চলে গেছে। পাহারাও রয়েছে, তারাই জানায়।

—সিলোনের জাহাজ এইখান থেকেই ছাড়তো, কিছু দিন বন্ধ আছে আবার জানুয়ারী মাস থেকে ছাড়বে।

—ধনুষ্কোডী পিয়ার থেকে ছাড়তো না? জবাব দেয় সে।

—আগে ছাড়তো, এখন সে পীয়ারও আর নেই। রামেশ্বরম্ থেকেই এবার জাহাজ ছাড়বে।

ওদিকে বালির উপর জেলে ডিঙ্গিগুলো ওঠানো, কতক নৌকা জলেই রয়েছে। ঢেউগুলো তাদের তলে এসে ছন্দোবদ্ধভাবে আঘাত করে সুর তুলেছে।

বাঁহাতে ছায়া অন্ধকারময় রেখা—সীমারেখা। অন্ধকার চাঁদের

আলোয় মাথা তুলেছে রামেশ্বরম মন্দিরের গোপুরমগুলো। মন্দির থেকে মাইকে স্তোত্র পাঠের সুর শোনা যায়।

শান্ত স্তব্ধ সমুদ্রের বুকে সেই সুর ছড়িয়ে পড়ে—সীমা থেকে অসীমে।

চুপ করে বসে আছি। সমুদ্রের সীমাহীন রেখাটায় ঢেউগুলো জ্বলছে, ওদের মাথায় ফস্‌ফরাসের আভা, গুঁড়ো গুঁড়ো রূপালী আগুন কারা সমুদ্রের বুকে ছিটিয়ে দিয়েছে।

—ক্রীশ্চান এখানে অনেকেই আছে। তাদের একটা পৌরাণিক তীর্থ এখানে!

ইলা চুপ করে বসেছিল। হাতে মুঠো মুঠো করে বালি ধরছে, হাওয়ায় উড়ছে সেই বালি। প্রশ্ন করে সে।

—এখানেও সেই ক্রীশ্চান তীর্থ!

—হ্যাঁ। Abel Cain এর নাম শুনেছো?

—একটা কবিতায় পরেছি।

—শোনা যায় Able-কে হত্যা করার পর শোকাচ্ছন্ন Cain দেবতার আদেশ পায় যে ওই মৃতদেহ নিয়ে তাকে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে হবে। কিন্তু Cain বলে তাতে কি আমার পাপ মোচন হবে? নির্দেশ আসে, হবে তোমারও যেদিন জীবনের মুক্তি ঘটবে, দুইজনে এক মৃত্তিকায় সমাহিত হবে তোমরা, তোমাদের মিলন হবে মৃত্যুর পরপারে।

Cain Able-এর মৃতদেহ নিয়ে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে থাকে। ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত শোকস্তব্ধ Cain-এর অন্তরে ব্যাকুল কামনা কবে ঘটবে তার পাপমুক্তি; এইখানে এসে একটা পাম গাছের নীচে বিশ্রাম করছে দেখে দুটো কাক নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একটা অন্যকে হত্যা করলো।

এইখানেই Cain-এর কাছে দৈবের নির্দেশ মনে হলো, সেই মৃত্তিকায় সমাধিস্থ করলো Able-কে—নিজেও শোকে দুঃখে এইখানেই

দেহত্যাগ করে। এই রামেশ্বর দ্বীপের এই অঞ্চলে দুটো সমাধি আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে এবল্‌ কেনের সমাধি। অনেক তীর্থযাত্রীও আসে বিদেশ থেকে।

—এখানে তাহলে Cain এর পাপ মোচন হয়েছিল? ইলা বলে —এ যে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর মত। সতীর দেহ নিয়ে পরিক্রমা।

—সব পুরাণের কাহিনীর একটা ধারা কোথায় রয়ে গেছে।

বিমলদা বলে—স্তব্ধ সমুদ্রতীর। নবম শতাব্দীতে রামেশ্বরমেও একবার সিংহলী দস্যুরা হানা দিয়েছিল। মন্দিরের প্রভূত ধনসম্পদও লুণ্ঠন করেছিল তারা কয়েক শতাব্দীর আগে। মুসলমানরাও একবার হানা দেয় ১১৭৩ খৃঃ সিংহলরাজ পরাক্রম এই মন্দির অধিকার করেন।

ভারতের এই দিকে বিদেশী বণিকরাও বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে যাতায়াত করতো, রামেশ্বর মন্দিরের থামে তার করিডর নির্মাণ শৈলীতে এমনকি শিলিং-এ যে রং-এর কাজ আছে, তাতেও পুরোনো মিশরীয় ছাপ সুস্পষ্ট।

—তাহলে অনেক আগেকার মন্দির?

জবাব দেয় বিমলদা,

—নিশ্চয়ই। পুরাণে উল্লেখ আছে রামচন্দ্র রাবণ বধের পর লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার সময় ধনুষ্কোডীর রত্নাকর আর মহার্নবের সঙ্গমে স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাতক থেকে উদ্ধার পেয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতা মহাদেবের পূজা করতে চান।

রামেশ্বরমের সমুদ্রতীরে গন্ধমাদন পর্বত, কেউ বলে এই নাকি মৈনাক পর্বত, সমুদ্রতীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজো করবার কামনা জাগতে হনুমানকে নির্দেশ দিলেন, নর্মদাতীর থেকে শিবলিঙ্গ আহরণ করে আনতে। এদিকে লগ্ন সমাগত, হনুমানও ফেরেন না, তখন সীতা যে বালিতে শিবলিঙ্গ তৈরি করেছিল তাকে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে রামচন্দ্র এই রামেশ্বর লিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করেন।

ইলা বলে—তারপর থেকেই তিনি   হয়ে আছেন।

হাসেন বিমলদা।

—তা নিশ্চয়ই নয়, তারপর বহুকাল বহুযুগ কেটে গেছে। কালক্রমে এই মূর্তি লুপ্ত হয়ে যায়। অগোচরেই ছিল সে মূর্তি, কথিত আছে এক পুণ্যবান মারাঠা ব্রাহ্মণ সেতু সঙ্গমে স্নান করতে এসে এখানে দেখেন বনের মাঝে একটি গাভী এক শিবলিঙ্গের মাথায় তার বাঁট থেকে দুধ ঢালছে। ক্রমশঃ তিনিই জনসাধারণের মধ্যে রামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময় সিংহলের রাজা ছিলেন পররাজ শেখর। তিনি রামেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা শোনেন। তাঁর রাজধানী কাস্তিতে নিপুণ শিল্পীদের দিয়ে গর্ভগৃহের সব কিছু তৈরি করে জল পথে রামেশ্বরে এসে মহাদেবকে নোতুন মন্দিরে অধিষ্ঠিত করে যান।

বলি,

—তাহলে রামনাদের রাজারা এলেন তারপর? তাঁরাও এ মন্দিরের নির্মাণকার্যে অনেক সাহায্য করেছেন।

বিমলদা বালির উপর যুৎ করে বসেছে। ওপাশে সমুদ্র এসে নিষ্ফল গর্জনে আছড়ে পড়ছে তীর ভূমিতে। বিমলদা বলে,

—রামেশ্বরের রাজা, শুধু রামেশ্বর কেন দক্ষিণের অনেক অংশের রাজা ছিলেন রামনাদের রাজারা, তা'দের পদবী সেতুপতি। রামনাদের বর্তমানে নাম রামনাথপুরম।

ইলা বলে—ওই ষ্টেশনতো পার হয়ে এলাম মন্তপম্ এর আগে।

—হ্যাঁ। শোনা যায় নাকি রামচন্দ্রের অনুরক্ত ছিলেন, সেতুপথের তদারক করার ভার ওদেরই উপর দিয়েছিলেন রামচন্দ্র। ওরা নাকি গুহকের বংশধর। ওদের বলা হোত মরবর। তামিল ভাষায় মরবর এর অর্থ যোদ্ধা। কেউ কেউ বলেন আসলে ওরা রাজপুতনার কোন ক্ষত্রিয় বংশধর। সিংহলেও মরবর উপাধি আছে।

বলি—চিতোরের রাণা ভীম সিংহের বিয়ে হয়েছিল পদ্মিনীর সঙ্গে,

আসলে পদ্মিনী তো সিংহলের রাজকন্যা। একটা যোগাযোগ তাহলে ছিল।

বিমলদা বলেন—তা থাকা সম্ভব, এমনও হতে পারে রাজপুতনার কোন যোদ্ধাজাত রামচন্দ্রের সঙ্গে এসেছিলো সিংহলে বা এইদিকে, এই সেতুপতি রাজারা পরবর্তীকালে বিবেকানন্দকেও প্রভূত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর বিদেশে ধর্ম প্রচারে যাওয়ার সহযোগিতা করেন তাঁরা।

এই সেতুপতিরা মাদুরার নায়ক রাজ বংশের অধীনে পরে সামন্ত রাজা ছিলেন, নায়ক রাজাদের মালিক কার্ফুদের যুদ্ধে তারা বীরত্ব দেখান, সেই থেকে এই অঞ্চল তাঁদের দান করেন মাদুরার রাজ। এই সেতুপতি রাজারা রামেশ্বরম্ মন্দির নির্মাণে প্রভূত সাহায্য করেন।

রামেশ্বরম্ মন্দিরের স্তম্ভে অলিন্দে বিভিন্ন সেতুপতি রাজাদের মূর্তি আঁকা আছে।···

রাত হয়ে গেছে। ষ্টেশনের দিকে ফিরছি, স্তব্ধ শান্ত পরিবেশ। ঝাউবনে বাতাসে সুর তোলে।···ষ্টেশন প্লাটফরমে একজন দাঁড়িয়ে, সেও এগিয়ে আসে।

—ফিস্ কারী, রাইস। বেঙ্গলীখানা।

বিমলদা ধমক দেয়—রাত দুপুরে ক্ষ্যামা দে পাঁচু। তোর পায়ে পড়ি। ওপাশে প্লাটফরমে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, সস্ত্রীক একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে সখ করে মাদ্রাজ বেড়াতে এসেছিলেন।

তিনি এগিয়ে এসে পরিচয় করেন।

—কলকাতা থেকে আসছেন? আমি আসছি দক্ষিণেশ্বর থেকে। সখ মিটেছে দাদা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবো এইবার। না খেয়ে মরবো এদিকে থাকলে। বরং বাঙ্গালোরেই যাবো। মেয়েটিতো খাওয়া বন্ধ করেছে প্রায়। এই বালি, আর ওই তরকারী।

ভদ্রলোক নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। আজ রাতের মাদ্রাজ মেলে ফিরছেন।

ওপাশে কলরব ওঠে। একটা আস্ত স্পেশাল ট্রেন এসে লেগেছে। বাঙ্গালীও কিছু আছে; কোলিয়ারী অঞ্চল থেকে এই স্পেশাল এসেছে।

তাদের কলরব হাঁক ডাকে ষ্টেশন মুখর। মালকাটা বাবু বিভিন্ন ষ্টাফ মিলিয়ে শুনলাম চারশো যাত্রী আছে।

—মচ্ছব তাহলে লাগলো? কি র‍্যা!

—তাই তো দেখছি।

তবু মন্দের ভালো, তাদের তামাম ট্রেনখানাকে আমাদের এদিক থেকে টেনে ওপাশে পিলগ্রিম প্লাটফরমে নিয়ে গিয়ে ঢোকালো। ইতিমধ্যে তারা প্লাটফরমে গাড়ীর মধ্যে যা বস্তু ত্যাগ করেছেন তার গন্ধে ষ্টেশন ভরে উঠেছে।

রাত নামছে। গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

শোবার ব্যবস্থা করছি, কাল সকালে যাবো মন্দিরে। দেবদর্শন তখনই হবে।

ইতিমধ্যে নেত্যবাবু এক পাণ্ডা পাকড়েছে। সেইই বলে—আমাদের পাণ্ডা—

বিমলদা হাঁকিয়ে দেয়, একবার আগে ঘুরে গেছি বাবা, এখন আমিই পাণ্ডাগিরি করছি। তোমায় আর দরকার নেই।

পাণ্ডা তবু নাছোড়বান্দা।

—জল চড়ান, পূজা দিন, অভিষেক হোক—

পরিষ্কার বাংলা বলছে সে। অবাক হই সবাই, এ যে বাংলা বলে।

—পেটের দায়ে তুই ইংরেজী শিখেছিস, হিন্দী শিখেছিস, এও বাংলা শিখেছে, নোতুন কিছু করেনি।

পাণ্ডাকে শোনায়,—বাবা, ওই নেত্যকালীবাবু শরীফ আদমি, ওঁর কাছেই যাও। তিনিই সব করবেন। আমরা তো বাবা বেড়াতে এসেছি। পুণ্যি এ শরীরে স্পর্শ করবে না।

অগত্যা পাণ্ডাঠাকুর চলে গেল। শুয়ে পড়ি। আবার কাল সকালে দেখা যাবে এই পরিবেশকে।

রাতের আলো আঁধারিতে ভালো লেগেছে ঠাঁইটাকে।

ভোরের আলোয় জেগে ওঠে রামেশ্বরম্ ষ্টেশন।

বের হয়েছি মন্দিরের দিকে। ইলা বলে—এতদূর এলাম রামেশ্বরমে পূজো দেব না? একে তো কাশীর সামনেই জাগ্রত তীর্থ বলে। দক্ষিণের কাশী।

জবাব দিই দাও পূজো! তাই বলে চা খাবো না? চায়ে দোষ কি?

একবেলা না হয় পরেই খাবো। ইলা বলে—খেও।

তবে ভক্তিটা একটু বেশী দেখছি কিনা, তাই সন্দেহ জাগে।

ইলা চাপা স্বরে বলে—তোমার মনই সন্দিগ্ধ।

—হতে পারে!

সকালের আলো জাগা পথ দিয়ে চলেছি। ষ্টেশনে কিছু ঘোড়ায় টানা কাণ্ডির মত আছে। ছই দেওয়া গরুর গাড়ীর মত আকার, তবে ঘোড়ায় টানে।

ইলা বলে,—এই তো মন্দির, এক মুঠো সহর। হেঁটেই যাওয়া যাক।

পথে পথে লোক চলেছে, একপাশে দেখলাম হনুমান ধর্মশালা। রামেশ্বরমের মধ্যে এইটিই নাকি বড় ধর্মশালা, সহরের পথে বিজলীবাতি আছে, টাউনশিপ অফিসও রয়েছে।

রাস্তার দু'পাশের গৃহস্থরা বাড়ীর সামনে গোবর দিয়ে নিকিয়ে সাফ করে তাতে আলপনা দিচ্ছে; চৌকো চৌকো ঘর কাটা আলপনা, তাতে বসিয়েছে কুমড়োর হলুদ ফুল।

ইলা একটি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে—কিসের উৎসব?

ভদ্রমহিলা ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে আর হাসে। ইলা ওর

হাতের গুলুনির বাটি থেকে একটু গুলুনি নিয়ে খানিকটা বাংলা দেশী মতে শঙ্খ মাছ ইত্যাদির আলপনা আঁকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটি চেয়ে থাকে, আশেপাশের বাড়ির মেয়ে বৌরাও জুটেছে আলপনা দেখছে। কি খুশি!

এক ভদ্রলোক জানায়—অতিথিদের মঙ্গলের জন্য আজকের এই পূজো। এ তাদের লোকাচার।

মন্দিরের কাছে এসে পড়েছি। এখানে বসতি বেশ ঘন। রাস্তার মোড়ে গান্ধীজীর একটা মূর্তি; এরা পাথর কেটে এতবড় মূর্তি বানিয়েছে, কিন্তু আজ এদের অনেকেই বোধ হয় সেই শিল্পকলা ভুলে গেছে নইলে গান্ধীজীর মূর্তিটা নিশ্চয়ই আরও ভালো করতে পারতো।

লোকজনের ভিড় শুরু হয়েছে। দু'পাশে দোকান পসার। পশ্চিম গোপুরম্-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম।

বিরাট গোপুরম্! এটা প্রায় একশো ফিট উঁচু।

চারটে গোপুরম্ রয়েছে চারিদিকে। মন্দির সীমার বাইরের দৈর্ঘ হাজার ফিট, প্রস্থ ছয়শো তিয়াত্তর ফিট।

বিমলদা বলেন—সমুদ্রে স্নান সেরে তবে পূজো দিতে যাবো।

ডানহাতে ঘুরে দক্ষিণ দিক ধরে সমুদ্রের দিকে চলেছি। একপাশে নীল সমুদ্র, দেবস্থান কমিটির তৈরি কয়েকটি রেষ্ট হাউসও রয়েছে এইদিকে।

একই মন্দির অনুমান সাড়ে তিনশো বছর লেগেছিল শেষ হতে। দক্ষিণের দিকে মন্দির প্রাকার দেখে অনুমান হয় অনেক পুরাতন মন্দির। প্রাকারের দু'এক জায়গা ভগ্ন করা হয়েছিল বলে বোধ হয়।

বিমলদা বলে, বোধ হয় আক্রমণেরই চিহ্ন ওসব হতে পারে, তাছাড়া চৌদ্দ শতক-এ নির্মাণ কার্য সুরু হয়, শেষ হতে লেগেছিল প্রায় সাড়ে তিনশো বছর। তারপর লোনা বাতাসের ঝাপটায় ক্ষ হওয়ারও অসম্ভব কিছু নয়।

মন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তে এসে বাঁয়ে ঘুরলাম সামনেই সমুদ্র।

সমুদ্রতীরে শঙ্করাচার্যের মঠ, মঠের মধ্যে নোতুন একটি স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হয়েছে। ছোট্ট ঝকঝকে মন্দিরটি এখানের সমুদ্রতীরের সৌন্দর্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বালিয়াড়িতে অনেক স্নানার্থীর ভিড় জমেছে। কেউ কেউ সমুদ্রতীরে স্নান সেরে বালির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজো করছে।

এখানেও দেখি এক পাণ্ডাঠাকুর বেশ ভক্তিযুক্তভাবে শোনায়।

—সীতয়া স্থাপিতে লিঙ্গে রামচন্দ্রেন পূজিতে।

তস্য দর্শনমাত্রেণ পূর্ণ জন্ম ন বিদ্যতে॥

স্নান সেরে নিন, মন্দিরে পূজো দেবেন বহিনজী।

হাসতে থাকি ঠিক খদ্দের পাকড়েছো এবার ঠাকুর।

এখানেও আশপাশে পাথরের উৎপাত তবু স্নানের জায়গা খানিকটা আছে। বেলাভূমি বেশ প্রশস্থ এবং অগভীর। অনেকদূর অবধি কোমর জল, বুকজল, ঢেউ-এর আক্রোশ তত নেই। মাঝে মাঝে এক একটা রোলার আসে মাত্র। বেশ আরামেই স্নান করা গেল।

দেখি বাঙ্গালী মেয়ে পুরুষও অনেকে এসেছেন। দক্ষিণের পথে পথে দেখলাম অনেক বাঙ্গালী দর্শক যান সেখানে। বিশেষ করে রামেশ্বর দর্শন দক্ষিণ যাত্রীদের ঘটেই।

এবার পশ্চিম গোপুরম্ দিয়ে ঢুকলাম মন্দিরে। এটিও অনেক উঁচু গোপুরম্। রামেশ্বরের মন্দিরে ঢুকে এগিয়ে আসছি। এখানের মন্দিরের মূলদেবতা মহাদেব আর তার শক্তি পার্বতী।

তাছাড়াও আছে হনুমান প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, সেতুমাধবর বিষ্ণু, কথিত আছে উনি পাণ্ড্য রাজের কন্যা গুণনিধিকে বিবাহ করেছিলেন ব্রাহ্মণ-বেশে এই গুণনিধি লক্ষ্মীর অংশ, তারই জন্য সেতুমাধবকেও এখানে আসতে হয়েছিল।

দুজনেই এখানে পূজিত হন। তাছাড়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, সীতা দেবী, হনুমান, সুগ্রীব, সেতু নির্মাতা নল, অঙ্গদ, নীল, এবং ইন্দ্রের মূর্তিও আছে।

আলোক প্রবেশের পথ, আলো আঁধারি আর থামের কারুকার্য সমতা ওই বিশাল দৈর্ঘ মিশিয়ে এটি একটি বিস্ময়কর রচনা।

পাণ্ডা ঠাকুর জানায়,

—উপরের ওই রঙ্গীন কাঠগুলোও নাকি মিশরের আদিম চিত্রশৈলীর ছাপ আছে, আর এই করিডর দেখছেন, এও নাকি বিদেশীদের মতে মিশরের রামেশিরা মন্দিরের মতই এর ছাপ।

—ওই ছবিগুলো তত পুরোনো নয়?

পাণ্ডা ঠাকুর জবাব দেয়,

—তা নয় সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু দেবস্থান কমিটি ওর আসল ঢং বদলাতে দেননি, ওই ভাবেই চলে আসছে। মন্দিরের এমনি ছোট বড় করিডর মিলিয়ে দৈর্ঘ হবে প্রায় চার হাজার ফিট; এতবড় করিডর পৃথিবীর কোন মন্দিরেই নেই।

কথাটা আমারও জানা ছিল। বিদেশী পর্যটক শিল্প ফার্গুসান সাহেব বলেছেন—

—If it were proposed to select one temple which should exhibit all the beauties of Dravidian style in the greatest perfection. The choice would almost invariably fall upon that at Rameswaram.

মন্দিরের গোপুরমের ওদিকে দুটি প্রস্তর খোদিত মূর্তি দেখে দাঁড়ালাম। একটিতে দেখা যায় একটি নারীমূর্তি পুরুষকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছে, অপরটিতে রয়েছে তার ঠিক বিপরীত অঙ্কন। নারী এবার পুরুষ বাহিত হয়ে চলেছে।

পাণ্ডা ঠাকুর বলে,—ওগুলো যুগ ধর্মের প্রতীক বাবু, আগেকার যুগের নারী ছিল পুরুষের দাসী, সেদিনের শিল্পীর চোখে পরেরটা হচ্ছে নারীর ভবিষ্যৎ সমাজে স্থান সম্বন্ধে আঁকা।

বিমলদা সাবাস দেন,—বলিহারী দৃষ্টিকোণ ভায়া, এ যুগে নারী হয়েছেন পুরুষবাহিনী।

ইলা হাসি চেপে সরে দাঁড়াল। জানে বিমলদার মুখের আড় নেই, আরও কিছু বলে বসবে। হঠাৎ দেখা যায় সুরপতি ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করতে থাকে ওই মূর্তিগুলোকেই।

ব্যাপারটা বুঝিনা, দেখি নেত্যবাবু হন হন করে আসছে। ওকে প্রণাম করতে দেখে দাঁড়াল, প্রশ্ন করে।

—এটা কি!

সুরপতি শিবনেত্র বলে—কলি দেবতা। পাণ্ডা ঠাকুর বলছে ন'বার প্রণাম সাষ্টাঙ্গে করলে মোক্ষ লাভ হয়। আট···নয়!

কথাবার্তা নেই নেত্যবাবু ব্যস্ত হয়ে চাদরটা স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেও সুরপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুড়োহাড়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করতে শুরু করল।

—এক, দুই—

সুরপতি আমাদের নিয়ে মন্দিরের এদিকে চলে এল। হাসতে পারিনা। ইলাও গম্ভীর হবার চেষ্টা করে। বলি এটা কি হ'ল।

সুরপতি জবাব দেয়—বুড়োর একটু গা হাত পা কোমর টাটাক্। বললাম না। বুড়োর বেশী পূণ্যি হবে। ওর সইবে না। তাই নিজেই লাগল! আমি কি ওকে বলেছি করতে?

মন্দিরের পরিধির মধ্যেই অনেক দোকানপত্র। বেশীর ভাগ শঙ্খ, কড়ি সামুদ্রিক ঝিনুকের তৈরি রকমারি খেলনার। তালপাতার তৈরি চুবড়ি হ্যাণ্ড ব্যাগও আছে।

একটা বড় শঙ্খের দর বললো কুড়ি টাকা, অবশ্য পনেরো টাকায় দিল, তার দাম অনুমান এখানে বাইশ টাকা।

ছোট সাইজের বাজাবার সাদা শাঁখ তিন টাকা—চার টাকা।

পণ্ডিচেরীর সেই রাতের কফিখানার ছোকরাই বলেছিল গলা নামিয়ে এখন সিলোনের সঙ্গে জাহাজ যাতায়াত করছে রামেশ্বরম্ হয়ে, খোঁজ নেবেন ওই দোকানদাররা পিছনের দিকে বিলেতী মালের কারবারও করে। ঘড়ি, ট্রানজিসটার, টেরিলিন অনেক মালই পাবেন।

তাই একটু টোকা দিলাম।

—ভালো কলম আছে ভায়া! কোন বিদেশী কলম।

দোকানদার একবার তির্যক চাহনিতে আমার দিকে চাইল। কি যেন বুঝেছে সে। একটু চুপ করে থেকে বলে।

—কিছুদিন জাহাজ বন্ধ আছে, যা ছিল তাও আর স্টকে নেই। বলেন তো সন্ধ্যাবেলায় দেখতে পারি যদি কারো কাছে থাকে।

সুরপতি জানায়।

—দেখো। একবার খোঁজ নোব।

ইলার কেনাকাটাও শেষ হ'ল। কতকগুলো ঝিনুকের তৈরি খেলনার সেট, রঙীন কোরাল, শঙ্খ—আর ছোট পাথরের মালাও নিল।

—ওসব কি হবে?

হাসে ইলা—শাঁখ নিলাম মায়ের পূজোর জন্তে। এগুলো একে তাকে দিতে হবে।

রামেশ্বর মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম।

মনে হয় এমনি একটি দ্বীপের মধ্যে এতবড় বিরাট মন্দির স্থাপনার পরিকল্পনা করেছিল—রূপদান করেছিল সেদিনের ধর্মপ্রাণ মানুষ।

তাদের নিষ্ঠা শিল্পশৈলী আর সামর্থ্যের কথা ভাবলে এই বিজ্ঞানের যুগে বিস্ময় জাগে।

বিমলদা বলে,

—মীনাক্ষী মন্দির দেখ, তারপর বলিস ওই দশতলা পেল্লাই খোলের বাড়ি তৈরী করে যারা বড়াই করে তাদের; কি করেছ বাবা, দেখে এসো আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে তানারা কি করে গেছেন। একা তাজমহলই নেই ভারতে—আরও অনেক কিছু আছে। স্থাপত্যের শেষকথা তোমরা কিছু বলোনি। কথা সত্যিই মনে হয় ওর।

মিঠে রোদের আভাস জেগেছে।

এইবার মন্দিরের কাছে একটা কফির দোকানে ঢোকা গেল। গরম গমম বড়া আর সেঁও ভাজা, সেই সঙ্গে কফি।

মন্দ লাগেনা।

ইলার মনে আজ একটা খুশির ভাব। সেই বলে,

—দাম আমি দিচ্ছি।

বিমলদা বলে—তীর্থে এসে ব্রাহ্মণ ভোজনের পুণ্যি করবে স্রেফ কফি দিয়েই? চলবে না। বেশ সস্তায় পুণ্যলাভ করার ফন্দী মেয়েদের মাথাতেই খেলে।

ইলা বলে,

—আর কি খাবেন খান। ইডলি—ধোসা উপ্‌মা!

বিমলদা বলে,

—হেরে গেলাম। ওসব খেতে সাধ্য নেই। উপ্‌মা নুন দেওয়া সুজিঘঁাটা ওতো যমের অরুচি।

ছোট্ট সহর। পার হয়ে চলেছি দ্বীপের অন্তপ্রান্তের দিকে। বসতি ফুরিয়ে এসেছে, দুএকটা ঝুপড়ি দেখা যায় মাত্র। দুপাশে শুরু হয়েছে উঁচু নীচু বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে দুএকটা সজনে গাছ। বসতি এখানে হতদরিদ্র লোকদের।

তারা গাছ গাছালির শুকনো কাঠি নিয়ে সহরে আসছে। জ্বালানী বিক্রি করে।

সারা দ্বীপের এই দৈন্যদশা; মরুভূমিরই যেন রূপান্তর এখানে, রাস্তাটা উঠেছে, ওই বালির জগতে ছোট্ট রাস্তাটা টিঁকে আছে কোনমতে।

রোদের আভা পড়েছে বালির পাহাড়ে দুএকটা বাবলা গাছের মাথায়, নিঃস্ব দ্বীপ। রুক্ষ পৃথিবী।

গাড়িটা গিয়ে একটা পাহাড়ের নীচে থামল।

চারিদিকে পাথরের তৈরি ভগ্নপ্রায় মন্দির। এককালে এখানে বসতি ছিল।

মন্দির ছিল, আজ সে সব পরিত্যক্ত।

সামনের চড়াই দিয়ে উঠে চলেছি। রামেশ্বর দ্বীপের এইটিই শীর্ষ দেশ, তারও মাথার উপরে রয়েছে রাম ঝরোখা।

প্রশস্থ সিঁড়ি বেয়ে শীর্ষদেশের মন্দিরে উঠলাম।

এই ছিল অগস্ত্য মুনির আশ্রম। তারই পাদুকা রয়েছে—পাথরের বুকে তারই পদচিহ্ন।

কেউ বলে রামচন্দ্র নাকি এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। এইটাই মৈনাক পর্বতের শীর্ষ দেশ।

সুন্দর স্তব্ধ মন্দির, চারিদিকে চেয়ে দেখলে রামেশ্বরম্ দ্বীপের একটা ছবি দেখা যায়। দূরে রামেশ্বরম্-এর লোকালয়।

মন্দিরের গোপুরমগুলো দেখা যায়।

সামনেই বহু নীচে মাটি সমুদ্র থেকে জল এসে সেই মাটির বুকে জমেছে, উপর থেকে মনে হয় কাঁচের মত স্বচ্ছ সেই জলধারা, দু-চারটে গরু চড়ছে ওপাশে মৃত্তিকার বুকে নারকেল বন সমাকীর্ণ প্রায়, দু-একটা বসতি। তার পরই অন্তহীন সমুদ্র তার নীল আর দিগন্তের নীল—একাকার হয়ে গেছে।

বাঁহাতে আরও দূরে মাটি উঠে গেছে, সেইদিকে নারকেল গাছের জঙ্গল, ওই সবুজ অসীমে বাইনাকুলার দিয়ে দেখা যায় চার্চের চূড়া, ওই দিকে পাম্বান। ভারত মহাদেশ।

অন্যদিকে দেখা যেতো ধনুষ্কোডি পীয়ারের ধোঁয়া, এখন সেখানে আর কেউ নেই। কোনচিহ্ন নেই।

আবহাওয়া অফিসের কিছু লোকজন টিঁকে আছে মাত্র, তারাও ওই দ্বীপপ্রান্তে সমুদ্রের রাজ্যে হারিয়ে গেছে।

ছোট একটি স্বপ্নময় জগৎ, মন্দিরের পিছনের অলিন্দে বসে আছি আমরা ক'টি প্রাণী। সমুদ্রের হাওয়া এসে লাগে—দিকহীন অকূলে মানুষ বোধহয় নিজের অন্তরের সত্ত্বাকে এমনি নিকট করে খুঁজে পায়।

বাতাসে উড়ছে ইলার এলোমেলো চুল-রঙীন শাড়ির আঁচল। মুখে পড়েছে একঝলক সূর্যের আলো।

—জায়গাটা চমৎকার, তীর্থস্থানের দাপট নেই। শান্ত স্তব্ধ। অগস্ত্যমুনির রুচিবোধ ছিল!

জবাব দিই, তা থাকবে না! এই দক্ষিণ ভারতে সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে অগস্ত্যমুনির অবদান কম নয়। তিনিই উত্তরাপথ থেকে আর্য সভ্যতার আলো এনেছিলেন দক্ষিণে। দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গাতেই তার পুজোর ব্যবস্থা আছে। পর্বত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এই দূরদুর্গম দক্ষিণে এসেছিলেন।

...স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

জায়গা সত্যই মনোরম। সারা পৃথিবী যেন এখানে ঘেরাটোপের আবরণে আবৃত হয়ে শেষ হয়ে গেছে। উর্মিমুখর সমুদ্র নীল তাল নারকেল সীমা ঘেরা এই ভূখণ্ডকে একদিন মহাকবি কালিদাস বর্ণনা করেছিলেন।

দূরাদয়চক্র নিভস্য তন্বী,
তমাল তালি বনরাজিনীলা আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশিধরা—
নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সমুদ্র পথে সিংহল থেকে দেশে ফিরছেন প্রথম দর্শনের এই বেলাভূমিকে কবি তাঁর কাব্যে অমর করে রেখে গেছেন।

সেই পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি আজ।

আমিও সেই মহাকালের এক নিমিষকেও চিরসত্য সুন্দর রূপে প্রত্যক্ষ করেছি, ধন্য হয়েছি ইলা।

ইলা স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওই আকাশসীমার দিকে।

—বেলা বেড়ে উঠছে, গাড়িটা ফিরছে ষ্টেশনের দিকে। পথে পথে লোকজনের ভিড়। সেই স্পেশাল ট্রেনের তীর্থযাত্রীরা দলবেঁধে ছুটছে। পথে পথে দু-একটা ছেলে সামুদ্রিক শাঁখ বিক্রী করছে। বাজিয়ে চলেছে তারা সেই শঙ্খ।

—দাম!

—চার টাকা।

শেষ অবধি এক টাকায় নামে।

ষ্টেশনে ফেরবার পথে ডাব মিললো। চার আনা তিরিশ পয়সায় বিরাট সাইজের ডাব। বেশ মিষ্টি জল। ফিরে দেখি সাইডিং-এ আমাদের গাড়ির পাশেই, ছুটো ফার্ষ্টক্লাশ ট্যুরিষ্ট কোচ সেলুনমত কার দাঁড়িয়ে।

অনেক বাঙ্গালীকেই দেখলাম, বেশ রুচিবান—তথাকথিত উঁচু-মহলের বলেই মনে হ'ল। শুনলাম কোন এক বাঙ্গালী প্রখ্যাত সাধু রামেশ্বরমে তীর্থে এসেছেন, সঙ্গে এসেছেন ওই ভক্ত শিষ্য এবং অনুরাগীর দল।

কলকাতায় তাঁর নাম শুনেছি।

তিনি এখানে আমাদের উঁচুতলার বরেণ্য মহারাজ। যেখানে এসে ওঠেন সেখানে জমে বিরাট দর্শনপ্রার্থীদের ভিড়। রাস্তায় গাড়ির সারি ধরে না। পুলিশ ছোটে ভিড় সরাতে।

কলকাতায় তাঁর দর্শন পাইনি, অবশ্য পাবার মত আত্মিক তাগিদও বোধহয় ছিল না। এখানে এত কাছে তাঁকে পেয়ে দর্শন করতে গেলাম।

রেলকর্তৃপক্ষ এখানে দরাজ দিল।

ঝকঝকে বার্ণিশকরা দামী সেগুন কাঠের সাজানো কোচ; মেঝেতে ঝকঝকে আকাশী রং-এর লাইনোলিউম পাতা। কেবিনের ডোর নবগুলো পালিশ করা। সামনে বেশ বড় একটা বসবার ঘর। সোফায় বসে আছেন মহারাজ।

সৌম্য সুন্দর অপূর্ব মনোরম চেহারা। গলায় ফুলের মালা। সারা ঘরে দামী সেণ্ট ধুপের সৌরভ। ওপাশে বসে আছেন অনেক নারী-পুরুষ। তাদেরও তেমনি শ্রী সৌন্দর্য। একজনের হাতে যজ্ঞ শেষের তিলকপাত্র।

প্রণাম করলাম মহারাজকে, তিনি তিলক পরিয়ে দিলেন। ওপাশে একজন প্রসাদ দিলেন। দামী ক্ষীরের সন্দেশ, দক্ষিণে এসে অবধি এ দ্রব্যের স্বাদ পাইনি।

এক মিনিট। ···ওকে দর্শন করে প্রণাম করে বাইরে এলাম। বিমলদা আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে।

—কি ভাবছিস ?

জবাব অন্য কাউকে দিতাম না। বিমলদাকেই দিলাম।

চোখের সামনে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার একটা কল্পনার ছবি ভেসে ওঠে। সারাভারত পরিক্রমা করছেন দণ্ড কমণ্ডলুধারী এক সন্ন্যাসী। কখনো পদব্রজে কখনও ট্রেনে পার হয়ে চলেছেন ভারতের নদী পর্বতমালা বনসীমা। অন্তরে তার কি দুর্বার ব্যাকুলতা, দুচোখে দীপ্তি। সারা মনে দেশের কল্যাণ চেতনার স্বপ্ন নিপীড়িত ভারতবাসীর বেদনাকে সারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, তিনি পথে প্রান্তরে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছেন।

এলেন ভারতের সীমাপ্রান্তে—কন্যাকুমারীকার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র অনায়াসে সাঁতরে গিয়ে উঠলেন মহোদধির এক পর্বতশিলায় ; ······ সারা অন্তরে ওই মহাসমুদ্রের উদ্বেলতা ; পথ কোথায়। ঈশ্বরের নির্দেশ এলো আকাশে বাতাসে সমুদ্র গর্জনে—এগিয়ে যাও তুমি।

সেদিনের অপরিচিত সেই বাঙ্গালী সন্ন্যাসী হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

······সেদিনের সেই সন্ন্যাসীকে মনে পড়ে—এঁকেও দেখলাম। কোন রাজা মহারাজার মতই তিনি তীর্থ প্রদক্ষিণ করছেন, বিলাস ব্যসনের কোন উপচারের ত্রুটি নেই। কিন্তু এর কাছেও কি আজকের সমাজ—এত দুঃখপীড়িত সর্বহারা মানুষ কিছু আশা করে না ?

বিমলদা চুপ করে থাকে।

ইলা বলে—তবে যুগ বদলেছে। যুগধর্মও বদলাবে বৈকি।

বললাম—এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না, শুধু মনের এই ভাবান্তরের বেদনাটাই জানালাম আর কি।

সুরপতি ক্ষীরের সন্দেশ খেতে খেতে বলে।

—যাই বলুন দাদা, প্রসাদটা কিন্তু সত্যই উপাদেয়। ভাবছি আর একবার প্রণাম করে আসবো কিনা।

ইলা বলে—কপালে যে ফোঁটা দিয়ে ফেলেছেন। ধরা পড়ে যাবেন এইবার।

দেখি নেত্যবাবু গিন্নীকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

—শীগগির চলো, মহাপুণ্যির ফলে ওনার দর্শন পাবো। ওরে বাপ্‌রে—মহাপুরুষ। ওঠো, ওঠো দিকি।

ঠেলে তাকে গাড়িতে তুলছে নেত্যবাবু।

—রামেশ্বরম্‌ তীর্থও হয়ে গেল।

ইলার কথায় ওর দিকে চাইলাম। তীর্থের দিকে নয় এবার চলেছি আনমনে সমুদ্র সৈকতের ওই বালিয়াড়ির উপর দিয়ে।

বৈকালের আলো নেমে আসছে। হাওয়ায় বালি গুলো এসে জমছে সমুদ্রের দিক থেকে।

এককালে এদিকে হয়তো সমতল মাঠই ছিল, গাছগুলো উঠেছিল মাটি থেকে। আজ পাহাড় প্রমাণ বালিরাশি এসে তাদের সারা দেহ ডুবিয়ে দিয়েছে।

শীর্ষ দেশের পাতাগুলো কোনরকমে বালির উপর পাতা ক'টা বের করে দম নিচ্ছে।

বলি—বুঝলে ইলা আমাদের অবস্থাও ওই রকম। সব ভবিষ্যৎ সব কর্মকৃতি হতাশার বালির অতলে চাপা পড়ে গেছে, কোনরকমে পাতাগুলো মেলে বাইরের আলো হাওয়ার দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছি বাঁচার আশ্বাসে। সেও কবে নিশেষে অতলে চাপা পড়ে হারিয়ে যাবে।

ইলা আমার দিকে চাইল। বলে,

—তবু বেঁচে থাকবো আমরা। জীবনে কি পাইনি তার হিসাব করতে আজ মন চায়না। মনে হয় এই উন্মত্ত উদার পৃথিবীতে সূর্যের আলোর আশ্বাসে হাসি নিয়ে বাঁচার সঙ্কেত আছে। অতীতকে ভুলে যেতে চাই দীপক।

ইলা বসে পড়েছে বালিয়াড়ির উপর।

বাতাস এসে বালিস্তরে কি একটা নূপুরের ছন্দ তুলেছে। ওর হাতের মুষ্টিবদ্ধ বালি ঝুর ঝুর করে ঝরছে। বলি,

—তবু ওই হাতের বালির সব সঞ্চয় উদ্বেল হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় ইলা। পূর্ণ মুষ্টি শূন্য সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে যায়।

হাসে ইলা।

—মনের এ জ্বালার কারণ বুঝি। এখনও মোহমুক্ত হতে পারো নি।

—মোহ। অবাক হই তার কথায়।

—হ্যাঁ মোহই। কিছু পাবার মোহ—নাম, খ্যাতি, অর্থ, ভালবাসা সব পাবারই মোহ থাকে। আমারও আছে—ছিলও।

—তবে।

—অনেক বেদনায় মনকে বুঝিয়েছি সে ভুল। অতীতের মৃত পুঁজির হিসাব করে লাভ কি। যা পাই—সেইটুকু নিয়েই খুশি হতে চাই।

ইলা তার জীবনের বেদনাটাকে ভুলতে পেরেছে। ঝাউবনে বাতাসে সুর তুলেছে। পাখিগুলো কলরব তুলেছে বালিয়াড়ির বুকে, মেতে উঠেছে অপরাহ্নের সমুদ্র।

চুপ করে বসে আছি। বলে ইলা,

—মনকে সেই কথাই বার বার শুধোলাম, জবাব পাইনি এতদিন। আজ মনে হয় যেটুকু পাবার তাই নেবো মোহমুক্ত মন নিয়ে।

—ইলা।

ইলা আজ সহজ হয়ে উঠেছে। আমার দিকে চাইল সে। সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

—বলবে কিছু ?

সারা মনে একঠা স্তব্ধতা জাগে। জীবনের পাত্র এত তীর্থ-বারিতেও পূর্ণ হয়নি, এক জায়গায় চিররিক্ত—চিরশূন্য সে দৈন্যের কথা জানাতেও সঙ্কোচ লাগে।

ইলা আমার দিকে স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে চাইল। ওর হাতখানা আমার হাতে। বাতাসে ওর আঁচল উড়ছে। বলে ইলা,

—থেমে গেলে যে !

জবাব দিলাম না। ইলা বলে,

—তোমার কথা আমি জানি।

ওর দিকে চাইলাম : মনের সেই না বলা কথা ওর সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে, এটা আমারই লজ্জার কথা।

ইলা বলে—সে কথার জবাব আজ থাক দীপু। আমাকেও একটু ভাবতে দাও।

ওকে কেমন এড়াতে চাই। আমার মনের চরম দুর্বলতার সংবাদ ওর কাছে আজ প্রকাশিত। একটা জায়গায় ওর কাছে আমার মনের আসল ছবিটা ধরা পড়ে গেছে।

বলি—ওদিকে একটু ঘুরে যাই।

একলা থাকতে সমীহ বোধ করে মন। ইলা চুপ করে কি ভাবছে, উঠে দাঁড়াল সে। হাতের বালিগুলো বাতাসে ছিটিয়ে দেয়। বলে—চলো। একটা কথা তবু জানাবো দীপু, মনকে চোখ ঠারা যায় না। সবকিছুর জন্য মনকে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার।

আমি সত্যিই ক্লান্ত। একা। একা একা পথ চলার অনেক কষ্ট দীপু।

দুজনে এগিয়ে আসছি বেলাভূমির দিকে।

জেলেদের বসতিতে সাড়া জেগেছে। নৌকাগুলো পাল তুলে

তীরের দিকে ফিরছে। মাছ বোঝাই নৌকা। সারাদিন ওরা দূর সমুদ্রে উধাও হয়েছিল—আবার ফিরছে ঘরের দিকে।

মাছ বোঝাই খোলের আশপাশে নীলসমুদ্রে সাদা চলিষ্ণু বিন্দুর মত গাংচিলগুলো উড়ছে; ঢেউ-এর দাপটে নৌকা ওঠে আবার ঢেউ-এর আড়ালে তলিয়ে যায়।

তীরে প্রতীক্ষা করছে জেলেদের স্ত্রী ছেলেমেয়েরা। দু'একটা নৌকা ফিরেছে। তাদের খোল থেকে ঝুড়িতে করে ছোট ছোট মাছগুলো খালি করছে মেয়েরা, সমুদ্রের তীরে সেই বাঁধানো চৌবাচ্চার ধারে মহাজনের লোক কাঁটা টাঙিয়ে আছে। ঝুড়িসমেত ওজন করে চৌবাচ্চায় ফেলছে মাছগুলো, নুন ছিটিয়ে সেগুলোকে চাপা দিচ্ছে, পরে ওগুলো শুঁটকী মাছ হয়ে চালান যাবে।

……দু'একটি বড় বড় শঙ্কর মাছ না হয় ডলফিনও ধরা পড়ছে, এক একটার ওজন নব্বুই পাউণ্ড—একশো বিশ পাউণ্ড অবধি।

তাই নিয়ে টানাটানি করছে বালিতে জেলেদের ছেলেরা। কর্মব্যস্ত সমুদ্রতীর।

অনেক সুখ-দুঃখের মেলা বসেছে সেখানে। প্রত্যহের দিন যাপনের বেদনা ওদের মুখে চোখে। তারই মাঝে এমনি করে বেঁচে আছে ওরা।

সমুদ্রের জীবন—কবে ওই সমুদ্রের ফেরারী হয়ে ফেরে না।

……সন্ধ্যা নামছে।

সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। ইলা চুপ করে বসে আছে।

—ফিরবে না?

মন্দিরে আরত্রিকের সময় হয়ে এল। ইলা শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। ও কি ভাবছে।

ভাবছে ওই দূর সমুদ্রের ওপারে কোন দূর দেশে হারিয়ে যাবার স্বপ্ন। মন থেকে সব যেন মুছে ফেলেছে সে। আমার কথায় হাতটা বাড়িয়ে দেখায়।

—চলো!

……নরম পেলব হাতের একটু স্পর্শ! সারা মনে নীরব একটা ঝড়ের সঙ্কেত আসে। সব চেতনা যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে।

—ইলা!

……ওর দু'চোখের পাতায় টলোমলো একটি সকরুণ আবেশ। আজ ওই চাঁদের আলোমাখা সমুদ্র কি আবেশে বিভোর হয়ে উঠেছে। ঝাউবন কাঁপছে শব্দমর্মরে। ইলার প্রকম্প হাতটা আজ যেন একটি নির্ভর সান্ত্বনা, অন্তরের নিবিড় স্পর্শ অন্বেষণ করে।

দু'জনে স্তব্ধ নির্বাক। পথ চলেছি—এ পথ এসেছে সমুদ্র নির্জন থেকে লোকালয়ের দিকে।

মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললাম।

আজ সন্ধ্যায় দেবতাকে দর্শন করে আসবো। রাত্রেই চলে যেতে হবে এখান থেকে। কে জানে এই পুণ্য মৃত্তিকায় আর কোনদিন আসবো কি না; তাই মনে হয় এ মৃত্তিকার সত্যই একটা আকর্ষণ আছে।

ভালো লেগেছিল এই বালিয়াড়ি—এই সমুদ্র এর আশপাশ—মৈনাকের ওই শিখর থেকে দেখা রামেশ্বরের সেই প্রশান্ত সমুদ্রমেখলা রূপটি স্বপ্নেও হয়তো কোনদিন দেখা দেবে আমার সামনে।

মনে পড়বে রহস্যময়ী কোন নারীকে—যে নিজেকে চকিতের জন্য হারিয়ে গিয়েও সুখী হতে চায়।

নিজের এই দুর্বলতার কথাও জানা ছিল না। নিজের কাছে এ এক দুঃসহ লজ্জা হয়তো কাপুরুষতাই।

কথা কইছ না যে!

ইলা সহজভাবে প্রশ্নটা করে। জবাব দিই,

—এমনিই।

……একটা ষ্টেশন ওয়াগন বের হয়ে গেল। দ্বীপে কোন গাড়ি

দেখিনি। এখানে আসার কোন পথও নেই। তবু ঝকঝকে ষ্টেশন ওয়াগনখানাকে একনজর দেখলাম।

……মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দেখলাম রামেশ্বরমের হেড পাণ্ডা নিজে এসে অভ্যর্থনা করে সকালের দেখা সেই স্বামীজীকে সাদরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

গাড়িখানা তাঁর জন্যই বোধহয় ট্রেনে করে আনা হয়েছে।

মন্দিরে ঢুকলাম। রাতের বেলায় বিজলীর আলোয় মন্দির উদ্ভাসিত! দোকানপসারেও আলোর বাহার।

মৃদঙ্গম নাদেশ্বরের সুর ওঠে। গর্ভগৃহে সব বাতি জ্বলছে,…… একটা ছোট থালায় জ্বলন্ত দীপশিখা নিয়ে পূজারী দেবতার আরতি করছেন।

……আজকের স্তব্ধ সন্ধ্যায় একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয় ক্ষণিকের জন্য ওসব ভুলে গেছি, আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেই জীবনধারণের গ্লানির পাঁকে ডুবতে হবে, রক্তাক্ত হবে অন্তর শুধুমাত্র বেঁচে থাকার পাথেয় সংগ্রহ করতে।

……সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

মহাকালের এই বোধহয় মহিমা, কালকেও সে মোহে আচ্ছন্ন করে দেয়, আচ্ছন্ন করে দেয় সব চেতনা—যন্ত্রণাকেও।

আবার সেই পাম্বান ব্রিজ।

চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল উছলে উঠেছে, ব্রিজের গায়ে এসে আছড়ে পড়ে জলধারা।

ভীতত্রস্ত ট্রেনখানা কোন রকমে যেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছে। রাতের আবছা অন্ধকারে এবার ফেরার পালা। মন্তপম্ ষ্টেশনে পৌঁছলাম; খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেছে। জল নেই।

সুরপতি শূন্য ওয়াটার বটলগুলো নিয়ে ফিরে এল। জানায়—নেক্‌সট ওয়াটারিং ষ্টেশন রামনাথপুরম্। সেই খানেই মিলবে তৃষ্ণার শান্তি।

…অগত্যা জেগেই রইলাম। চাঁদের আলো ঢাকা গ্রাম প্রান্তরসীমা। ট্রেনখানা রামনাথপুরমের দিকে চলেছে।

ইলা বলে এইতো রামনাদের সেতুপতিরাজাদের রাজধানী।

—হ্যাঁ।

বিমলদা শোনায়—রামনাদের সেতুপতি হিরণ্যগর্ভযাজী খুব নাম করা রাজা ছিলেন। উৎসবের সময় তাকে তুলাদণ্ডে সোনা দিয়ে ওজন করে সেই সোনা দান করা হয়েছিল একবার। এ অঞ্চলেই তার প্রতিপত্তি দেখে ইংরাজদের সহযোগিতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিচনোপল্লীর হজরত নবাব তাঁকে পরাজিত করে বন্দী করে নিয়ে যান।

পরে অবশ্য মুক্তি দেয় নানা কারণে।

রামনাথপুরম এসে গেছে। সহরের আলো তখনও নেভেনি। জল খেয়ে বোতলে কিছুটা রাতের মত সঞ্চয় করে আমরা গাড়িতে উঠলাম।

বিমলদা তাগাদা দেয়—শয়নে পদ্মনাভঞ্চ হও দিকি এইবার। কাল সকালে আবার মাদুরায় ক্ষেপ আছে।

ক্ষেপ! হাসে বিমলদা—একই কথা বাবা। 'এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।' এতো তাই হয়েছে।

ওদিকে গাড়ির চাকার তালে তালে বিজয় মাষ্টারের সুর শুরু হয়েছে। তুম না না—তেরি না না। বেঞ্চ পিটছে আর গান ধরেছে, বিমলদা হাঁক পাড়ে—

—এত পুলক জাগল যে হঠাৎ অ মাষ্টার?

বিজয়দা বলে—একটু রেওয়াজ করছি।

—ওটা কাল প্রাতঃকালে করো। এখন শুয়ে পড় দিকি।

চুপ করে গেল বিজয় মাষ্টার।

মাদুরাকে সেদিন দেখেছিলাম এক চোখে, সেদিন মন টেনেছিল কোদাই কানালের দিকে। প্রকৃতির লীলা নিকেতনের যাত্রী সহর তাকে বাঁধতে পারেনি।

আজ আর সে টান নেই। মাদুরাকেই দেখবো, সেই মন নিয়েই এসেছি। মাদুরা দেখে ফিরবো মাদ্রাজে।

এবার যেন ফেরার পালা। এতদিন দুঃখ কষ্ট অসুবিধার মধ্যেও দিনরাত কেটেছে, ভাষার সমস্যা এখানে বিরাট।

কোন কথাই বোঝে না কেউ ; সেও বলে নিজের ভাষায় আমরাও বলি ইংরাজী না হয় বাংলায়, শেষকালে ইসারা চলে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও তাই।

দুবেলা আসল খাবারের চেয়ে এটা সেটা গিলে দিন কাটাতে হয়েছে! তবু এই পরিক্রমা ভালো লেগেছিল। যাযাবর মন পথে পথে নিত্য নোতুন দেশ—নোতুন মানুষ দেখেছে। চলার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।

মাদুরা শেষ করে মাদ্রাজ ফিরে আবার যেতে হবে বাঙ্গালোর মহীশূর হয়ে নীলগিরির পার্বত্য সহর উতকামণ্ডের দিকে।

তবু দক্ষিণ থেকে উত্তরে উঠছি কথাটা ভাবলেই মমে হয় এবার বুঝি ফেরার পালা। আবার ফিরতে হবে সেই কলকাতায় অগুনতি মানুষের ভিড়ে পিষে যেতে হবে। আবার সেই কষ্টক্লিষ্ট জীবন।

তাই মাদুরাকে আজ ভোরের প্রথম আলোয় ভালো লাগে, চেনা চেনা মনে হয়।

সেই প্লাটফরমেই আবার ফিরে এসেছি। এবার এর নাড়ী নক্ষত্র জানা হয়ে গেছে।

তাই ভোরে উঠেই প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। সকালেই মন্দির খোলে ষ্টেশন থেকে এক মাইলেরও কম দূরত্ব হেঁটেই চলে যাবো।

পরে, দেখা যাবে।

ষ্টেশন থেকে বের হয়ে চৌরাস্তার দিকে এগোচ্ছি। সামনেই বেশ বড় একটা গির্জা একেবারে আধুনিক রীতিতে তৈরি।

পথের ধারে কাঁকায় দেখা যায় তাঁতিরা রঙ্গীন সুতো দিয়ে শাড়ীর

লম্বা খোলের সাজ তৈরি করছে। ওগুলোকে এইবার ড্রামে জড়িয়ে ভরনা দিয়ে বোনা হবে।

মাহুরার এই শাড়ী বয়নশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। বহু শতাব্দী আগে গুজরাট অঞ্চল থেকেও কিছু বয়নশিল্পী এখানে এসেছিল, তাদের বংশধররা আজও এখানে সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইলা জিজ্ঞাসা করে—মথুরা তাহলে বহু পুরাতন সহর? এখন তো দেখছি রীতিমত আধুনিক!

জবাব দিই-এ কালের মথুরা মাদ্রাজ প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর নগরী। জেলা সদর, তাছাড়া অন্যতম বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র। কল-কারখানাও রয়েছে। বিশেষ করে কটনমিল সুতোর মিলও দেখলাম। তাছাড়া মীনাক্ষী মন্দিরে তীর্থযাত্রী ট্যুরিস্টদের আনাগোনার বিরাম নেই। সহরে বাসও চলছে। সিটি বাসও আছে। তাছাড়া রয়েছে টাঙ্গা—ট্যাক্সি সব কিছুই।

বিমলদা বলে—এতো আজকের রূপ দেখছো মাহুরার। অতীতেও এ বিরাট সমৃদ্ধ নগর ছিল। পুরাণে আছে এক বণিক সমুদ্র উপকূল থেকে বাণিজ্য করে ফিরছিল, তিনি দেখেন অরণ্যের মধ্যে এক শিবলিঙ্গ দেবরূপী সুঠাম পুরুষ তাঁকে আরাধনা করছেন। পুরুষ বণিককে নিজের পরিচয় দেন তিনিই দেবরাজ ইন্দ্র।

তখনকার রাজাদের কাছে বণিক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন, রাজা অরণ্য সাফ করিয়ে সেই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই মীনাক্ষী মন্দিরের অন্যতম দেবতা সুন্দরেশ্বর শিব।

পরে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে আরও জনপদ গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠা হয় মাহুরা নগরীর।

সেই রাজবংশের তারপর কি হ'ল? ইলা প্রশ্ন করে,

—সেই রাজবংশই পাণ্ড্যরাজ বংশ। এর বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায় বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হলসঃ মহাত্ম্যম্। তামিল ভাষাতেও তারই একটা সমকালীন গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। তাতেই রয়েছে মন্‌ন্‌ভুর-এর

শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় চৈত্রী পূর্ণিমার দিন দেবরাজ ইন্দ্রকে এই মহাদেবের পূজো করতে দেখেন।

পাণ্ড্য রাজারা সেকালের অন্যতম প্রখ্যাত শাসনকর্তা ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা, স্থাপত্য তাঁদের সময় থেকেই একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

এই পাণ্ড্যরাজাদের সময় ভারতের বাইরেও তা'দের অন্য পণ্য জাহাজ যেতো। বিশেষ করে রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবসার যোগাযোগ ছিল। রোমের ইতিহাসে ভারত মহাদ্বীপের মাদুরৈ নামে এক সহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই মাদুরার কাছাকাছি একটা গ্রামে রোমরাজ অগষ্টাসের আমলের স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। এসব থেকেই মনে হয় মাদুরাই সেই মাদুরৈ; পাণ্ড্যরাজারাও এখানেই বাস করতেন। সেকালে মথুরা দক্ষিণভারতে বিদ্যাচর্চার স্থান ছিল, আবার এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতরা আসতেন, শাস্ত্র কাব্য চর্চা হতো। কথিত আছে এমনি এক কাব্য চর্চা সভায় স্বয়ং সুন্দরেশ্বর মহাদেবও কবিতা পাঠ করেছিলেন।

হাসতে থাকে ইলা।

বিমলদা বলেন—হাসার কিছু নেই, মহাদেব তো সব কলাবিদ্যার আধার। নগরীর অপূর্ব সৌন্দর্য আর শ্রী দেখে, দেবরাজ এই নগরীর উপর নাকি মধু বর্ষণ করেছিলেন। তাই এর নাম হয়েছিল মথুরৈ।

জবাব দিই—আবার এমনও হতে পারে মথুরারও তখন খুব খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, উত্তর ভারতের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল মথুরা। তারই নাম অনুসারে একে বলা হোত দক্ষিণের মথুরা।

—হতে পারে।

তাঞ্জোরের চোল রাজা ছিলো বিজয়নগর রাজাদের আশ্রিত। বিজয়নগর রাজবংশ তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। চোল রাজারা একবার পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরা দখল করেন দশম শতাব্দীতে। পরে পাণ্ড্য রাজবংশ তা পুনরাধিকার করেন।

এর কিছুদিন পরই অনুমান চতুর্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এল মুসলমান অভিযান। দক্ষিণের রাজশক্তি তেমন কঠিনভাবে তাদের বাধা দিতে পারেন নি। বোধহয় যাদুবিদ্যায় তারা তত রপ্ত ছিলেন না। আলাউদ্দিন খিলজীর ধূর্ত সেনাপতি মালিক কাফুর সেই সুযোগে কাঞ্চিপুরম্ ত্রিচনাপল্লী অধিকার করে হানা দিল মথুরা সহরে। পাণ্ড্য-রাজবংশ সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি। মাদুরা সহর মুসলিম অধিকারভুক্ত হ'ল।

সেদিনের ধ্বংসযজ্ঞে মাদুরাও বাদ যায় নি। প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল মুসলিমরা এখানে শাসন করেন, ওদিকে বিজয়নগর রাজবংশ তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। তাঁরাই মাদুরা আক্রমণ করে মুসলিমদের হাত থেকে মাদুরা দখল করে নেন।

মথুরার ভূতপূর্ব পাণ্ড্য রাজবংশকে এ রাজ্যের ভার দিয়ে একে বিজয়নগরের অধীনে একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা হোল।

এদিকে তাঞ্জোরের চোল রাজবংশ সুযোগ খুঁজছিলেন তারা হঠাৎ পনের শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মাদুরা আক্রমণ করে পাণ্ড রাজাদের পরাজিত করে দখল করে নেয়।

পরাজিত পাণ্ড্য রাজারা বিজয়নগরের শরণাপন্ন হ'ল, আসলে মাদুরা তো তাদেরই করদরাজ্য। বিজয়নগরের রাজা চোল রাজাদের এই কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তারা মাদুরা আক্রমণ করতে মনস্থ করেন।

বিজয়নগর রাজার সেনাপতি ছিলেন নাগম নায়ক। তিনিও এমনিতে কৌশলী লোভী লোক, তার উপরই সেনাবাহিনীর ভার দিয়ে বিজয়নগর রাজারা মাদুরা আক্রমণ করতে পাঠালেন।

বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে নাগম নায়ক মাদুরায় এসে বোসদের সহজেই পরাজিত করে মাদুরা অধিকার করে নেয়।

তার মনে ছিল রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা, এই সুযোগে নাগম নায়ক বিজয়নগর রাজাদের না জানিয়ে নিজেই মথুরার রাজপদে অধিষ্ঠিত করল নিজেকে।

সংবাদ পৌঁছল বিজয়নগর রাজার কাছে। তিনি নিজের সেনাপতি নাগম্ নায়কের এই নীচতার কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে আদেশ দিলেন।

—এই নাগম্ নায়ককে বন্দী করে আনতে পারলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। তাঁর রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই।

নাগম্ নায়ক মহাবীর যোদ্ধা, তাকে বন্দী করে আনার সাহস সহজে কারোও হয় না? এগিয়ে এল এক তরুণ সেনানায়ক। এই কঠিন কাজের ভার সে তুলে নিল নিজের কাঁধে। রাজাও বিস্মিত হন, এই তরুণ সেনানায়কের নাম বিশ্বনাথ নায়ক। নাগম্ নায়কের পুত্র।

বিশ্বাসঘাতক পিতাকে সেও ক্ষমা করতে পারেনি। এই তরুণ বিশ্বনাথ নায়ক যুদ্ধে পিতাকে পরাজিত ও বন্দী করে; অবশ্য বিজয়নগরের রাজা নাগম্কে ক্ষমা করেন, বিশ্বনাথ নায়কের রাজভক্তিতে খুশি হয়ে তাকেই মাদুরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

এই বিশ্বনাথ নায়কই মাদুরার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালক্রমে এই বংশের থিরুমল নায়ক নিজেকে মাদুরার রাজা বলে ঘোষণা করেন, তখন রাজধানী ছিল ত্রিচিনাপল্লীতে।

বিশ্বনাথ নায়ক মাদুরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর থেকেই বর্তমান মাদুরা নগরীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হ'ল। তিনিই পর্বতঘেরা এই উপত্যকায় মাদুরা সহরকে আরও সুরক্ষিত করলেন, চারিদিকে এর প্রাকার প্রাচীর গড়ে উঠল, গড়ে উঠল মন্দির। ভোগাই নদীর ধারে মাদুরা নগরীর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

এর সমৃদ্ধির কথা ঘোষিত হ'ল সর্বত্র।

নায়ক বংশের অন্যতম রাজা থিরুমল নায়েকের নাম আজও মাদুরায় সুপরিচিত। ইনি ১৬২৩ হতে ১৬৫৯ খৃঃ সিংহাসনে ছিলেন। তখন রাজধানী ছিল ত্রিচিনাপল্লী।

ইলাই জিজ্ঞাসা করে।—ত্রিচিনাপল্লী থেকে মাদুরায় এলেন কেন?

বিমলদা শুনিয়ে চলেছে,

—এর সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই শোনা যায়। এর জীবনটাও একটি করুণ নাটক। শোনা যায় তাঁর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে আসে, অনেক চিকিৎসাতেও কোন ফল হয় না।

এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন মাদুরায় মীনাক্ষী দেবী এবং সুন্দরেশ্বরদেব তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন—তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।

রাজা থিরুমল নায়ক বিস্মিত হলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসছে! চোখের রোগ ভালো হয়ে গেছে।

তখন থেকেই থিরুমল তাঁর রাজধানী সরিয়ে আনলেন মাদুরাতে, ওই যে মন্দিরের রায় গোপুরম্ সেটি নায়করাজ থিরুমলের দ্বারাই তৈরি হয়। তিনি তারপর থেকেই এইখানেই থাকেন, তার প্যালেস আজ থিরুমল প্যালেস বলে পরিচিত।

জিজ্ঞাসা করি,

—কিন্তু জীবনের করুণ নাটকটা কোথায়?

বিমলদা হাঁপাতে থাকে।

—বলছি বাবা। এই থিরুমল নায়কও শেষকালে হিন্দুধর্মের উপর নাক সেঁটকালো। মাদুরাতে রবার্ট ড্য নোবিলি নামে একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক আছে, পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহে থিরুমল তাকে বরণ করে নেন, ক্রমশ থিরুমল নায়ক হয়তো তারই প্রভাবে হিন্দুধর্মের উপর বিরূপ হয়ে উঠে খৃষ্ট ধর্ম বরণ করতে মত প্রকাশ করেন।

খবর গেছিল মাদুরার মন্দিরের ধর্মপ্রাণ পূজারীদের কাছে। তারাও রাজাকে ফেরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। সমাজ এবং ধর্মের ধারক রাজা, সেই রাজাই যদি এমনি হয়ে যায় তাহলে আরও বিপদ। শেষকালে পুরোহিতরা একদিন রাজাকে জানালেন—যে মীনাক্ষী মন্দিরের মধ্যে এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখা গেছে তাতে পাণ্ড্য-রাজাদের গুপ্ত ধনাগার রয়েছে। তাই দেখবার জন্য থিরুমল নায়ককে তাঁরা মন্দিরের গুপ্ত এক সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে তার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ

করে দেন, ক্রমশ রটে যায় মহাপ্রাণ রাজা থিরুমল—মন্দিরের দেবীকে পূজা করতে করতে বিলীন হয়ে গেছেন।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে অনাহারে প্রাণ দেন রাজা থিরুমল নায়ক। অবশ্য তার মৃত্যু সম্বন্ধে এইটাই সঠিক কথা নয় প্রবাদ মাত্র।

চুপ করে এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে। পথের দুদিকে দোকান পশার, বাজার। ফলও প্রচুর আমদানী হয় এখানে। নীলগিরি বা কোদাই কানালের নীচেকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে কমলালেবু, আঙুর, কলা, ত্রিবান্দ্রম অঞ্চল থেকে আম, কাজুবাদাম নানা রকম ফল আসে।

অনেক কাপড়ের দোকানও রয়েছে।

ষ্টেশন থেকে পিছু নিয়েছে একটি লোক, সে নাকি গাইড।

অনেক বলে কয়েও তাকে পিছু ছাড়াতে পারিনি; এইবার মন্দিরের কাছে এসে তার স্বরূপ চিনলাম। মন্দিরের আশেপাশে অনেক কাপড়ের দোকান।

জুতো খুলে মন্দিরে যেতে হবে।

সেই সঙ্গীটিই দেখায়।

—ওই দোকানে জুতো খুলে রেখে যান। ফিরে এসে শাড়ী ব্লাউজপিস্ ফাস্টক্লাস চিজ দেখবেন।

বিমলদা বলে,

—ওরে দীপু গাইড যে দালাল হয়ে গেল এবার। শাড়ী কেনার বায়না হিসেবে জুতো জিম্মা রাখতে পারবো না বাবা।

বাইরে টিকিট নিয়ে জুতো রেখে গেলাম মন্দিরের ভিতরে।

প্রথম প্রাকার; মন্দিরের চারিদিকেই কয়েকটি প্রাকার। এদিকে ওদিকে মাথা তুলেছে কতকগুলো ছোটবড় গোপুরম্। আকাশ সীমায় ওই বিরাট শীর্ষদেশ মনে ভাবগম্ভীর স্তব্ধতা আনে।

বিমলদা বলে,

—মূল মীনাক্ষী মন্দির আর সুন্দরেশ্বর মন্দির ছাড়া অনেক অংশই

মালিক কাফুরের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এসব গোপুরম্
অন্যান্য সবকিছুই তারপরে গড়ে উঠেছে।

অর্থাৎ ১৩১০ সালে মালিক কাফুর আক্রমণ করেছিল, তারপরে।
—হ্যাঁ। অনেক পরে। এই মন্দিরের বহিরাঙ্গের পত্তন করেন রাজা বিশ্বনাথ নায়ক প্রায় ১৫৬০ খৃঃ। তারপর আরও অনেক রাজারাই করেন, থিরুমল নায়কও এর গঠন করেন। এইভাবে গড়ে উঠতে প্রায় একশো তিরিশ বছর সময় লেগেছে।

বাঁদিকে মন্দির প্রদক্ষিণ করে সামনের দিকে চলেছি। বাঁহাতে বিরাট মণ্ডপ; আইরাক্কল মণ্ডপম্!

বিমলদা বলে এর নামই সহস্র মণ্ডপম্। এর নির্মাণকাল ১৫৬০ খৃঃ। সুন্দর থামগুলো বিরাট এক ভাব গাম্ভীর্যময় পরিবেশ রচনা করেছে। এই মণ্ডপ্ রচনা করেছিল বীরাপ্পা নায়ক। মীনাক্ষীদেবীকে তিনি একটি সুন্দর মণিমুক্তা রচিত স্বর্ণকবচ তৈরি করিয়ে দেন।

ওপাশেই আর একটি সুন্দর মণ্ডপ্। 'অষ্টশক্তি মণ্ডপ্ম'।

দক্ষিণের যতো মন্দির দেখলাম। কিন্তু সেখানে তো দুই দেবতা মূল শিব না হয় বিষ্ণু! কিন্তু মাতৃমন্দির এই প্রথম।

বিমলদা বলে, শুধু প্রথমই নয় প্রধান। মীনাক্ষী-মাতৃশক্তির অংশসম্ভূতা। চণ্ডীতে মহিষাসুর নিধনকালে যে অষ্টশক্তির বর্ণনা আছে এই মণ্ডপে সেই বিভিন্ন শক্তির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

চণ্ডিকা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডোগ্রী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, অতিচণ্ডার এই অষ্টশক্তির মূর্তি রয়েছে।

ওপাশে এগিয়ে যাই।

মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরের ওদিকেই আর একটি বিরাট মণ্ডপ। তার থামে মনুষ্যমূর্তি খোদিত। ইলা বলে,

—এটা মনে হয় অনেক পরে তৈরি?

গাইড জানায়—তাই-ই। এটার নাম পুড ডু মনডপমু। এটা তৈরি করা অনেক পরে। এইসব মূর্তিগুলো দেখছেন, এগুলো নায়ক

রাজবংশের বিভিন্ন রাজা রাণীদের মূর্তি। এবং শিল্পশৈলীও অনেক নিখুঁত। গ্রীষ্মকালে দেবতাকে এইখানে আনা হ'ত। তাই এর নাম বসন্তমণ্ডপম্। একটা স্তম্ভে একটি অতিসুন্দর মূর্তি খোদিত আছে সেটা পার্বতী কল্যাণসুন্দরের বিবাহের মূর্তি।

মাদ্রাজ প্রদেশের মন্দিরের মত এখানেও দুই মূল দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত। মীনাক্ষী দেবী আর সুন্দরেশ্বর মহাদেব।

পাশাপাশি মন্দিরে তারা দু'জনে প্রতিষ্ঠিত। ওপাশেই আর একটি সুন্দর মণ্ডপ এটির নাম মীনাক্ষী মণ্ডপম্। এই মণ্ডপের প্রবেশ পথে প্রতিষ্ঠিত গণপতি মূর্তি। বিমলদা বলেন—এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল এখান থেকে তিন মাইল দূরের একটি জায়গায় মাটির নীচে থেকে। থিরুমল নায়কের প্রাসাদ নির্মাণের সময় সেখানে মাটি খোঁড়া হয়েছিল, এই মূর্তিটি সেইখানেই পাওয়া যায়। পরে এখানে এনে একে প্রতিষ্ঠিত করে।

আর সেই জায়গাতেই এখন বিরাট এক পবিত্র পুষ্করিণী হাজার ফিট দৈর্ঘ হাজার ফিট তার প্রস্থ, মধ্যে একটি দ্বীপের মত মন্দির আছে।

ইলা বলে—কিন্তু গণেশের বাম উরুতে একটি নারী মূর্তি।

বিমলদা বলে—ওইটাই গণেশের নারী প্রতীক। পুরাণে আছে গণপতির বিবাহযোগ্যা কোন কন্যা মেলেনি। বাবা শুঁড়ওয়ালা কদাকার হলে কি হবে তার রুচির বাহার আছে। তিনি তো জানালেন তার মায়ের মত রূপবতী গুণময়ী কোন কন্যা না পেলে তিনি বিবাহ করবেন না, সেরকম কন্যা আর দুটি নেই পৃথিবীতে, তাই গণপতি আইবুড়োই রইলেন।

মন্দিরের পথে বসে আছেন যদি তেমন কোন কন্যা পান এখনও বুড়ো বয়সেও বিয়ে করবেন এই আশায়।

ইলা বলে—আপনার যত্তো সব বাজে কথা। সেই শুঁড়ওয়ালা

একটা চিজকে কোন মেয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়নি, তাই আইবুড়োই রয়ে গেল বেচারা।

সামনে দেখা যায় বিরাট একটি নটরাজের মূর্তি।…প্রদীপ জ্বলছে। অপূর্ব সুন্দর লাস্যময় সেই তাণ্ডব মূর্তি।

গাইডও রয়েছে সঙ্গে। মন্দিরে ঢুকেই ওকে পেয়েছিলাম, তরুণ, ঠিক ব্যবসায়ে এখনও পাকা হয়নি তাই দর্শকদের এটা সেটা দেখাবার তার সাধ্যমত বোঝাবার আন্তরিক চেষ্টা করে।

সেই জানায়…এটি মহাদেবের আনন্দ তাণ্ডবমূর্তি—রুদ্র তাণ্ডব নয়।…রুদ্র তাণ্ডব শিবের নৃত্যছন্দে সৃষ্টি ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল। বামপদতলে পৃথিবীকে দলিত করে তার বুক থেকে সব অমঙ্গল অকল্যাণ ধ্বংসকেই তিনি জাগরূপ করতে চেয়েছেন, দক্ষিণ পদ এখানে ধরণীতল স্পর্শ করেছে। ফুটে উঠেছে তাই লাস্যে বর্ণে-ছন্দে ধরণীর সব কল্যাণ আনন্দ।

এ মূর্তি মাদুরাতেই আছে, আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ওপাশেই এক ভক্তের মূর্তি। সহস্র মণ্ডপে এখন সুন্দর একটি মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে।

গাইড শুধরে দেয় সহস্র মণ্ডপম্ হলেও ওতে সতেরোটি গুপ্তকক্ষ আছে।

ইলাই বলে দেবীদর্শন করে এসে মিউজিয়ামে ঢুকবো। নই'লে আপনাদের কচ্‌কচি শুরু হলে আর থামবে না। মন্দির দেখছেন—দেবমূর্তি দেখুন। পূজো দিয়ে মা মা বলে ডাকুন। তা নয় এখানেও সেই ইতিহাস আর স্থাপত্যের কচ্‌কচি ভালো লাগে?

—তবে মীনাক্ষীদেবীর কথাও শুনতে হয় তাহলে?

বিমলদার কথায় ইলা দাঁড়াল। মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই। গাইড বলে।

—পাণ্ড্যরাজকন্যার নাম ছিল মীনাক্ষী; তিনি ছিলেন পরম ভক্তিমতী; মহাদেবের আরাধনা করতেন, তিনি ছিলেন শক্তির অংশ।

সেই পুণ্যফলে তিনি দেবীত্বে উপনীত হন। তারই মহিমায় এই দেবী প্রতিষ্ঠা।

বিমলদা বলে, এইবার বুঝলাম মহাদেবের মন্দির থাকতেও এর নাম কেন হ'ল মীনাক্ষী মন্দির। বাপের বাড়ীতে মেয়েদের জোর প্রতিষ্ঠাতো থাকবেই। আর মহাদেবতো এখানে ঘরজামাই। তাই কেয়ার অব্ হয়েই রয়েছেন বাবা এখানে। কিন্তু আর একটা পুরাণের কথাতো বল্লে না বাবা।

গাইড যুবকটি বলে,—সেটাই প্রবাদ আছে মীন অর্থাৎ মাছ যেমন তার ডিমের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তাকে সঞ্জীবিত করে; এই মূর্তির দিকে চাইলেও অনুরাগী ভক্তরা সারা মনেপ্রাণে একটা সঞ্জীবনী শক্তি অনুভব করে। দেবীর এই মহিমা থেকেই এই দেবীর নাম হয়েছে মীনাক্ষী।

দেবী শক্তির আধার। শক্তিস্বরূপিনী মাতৃমূর্তি! পূজোর জন্ত এখানে গাঁদা ফুল ছাড়াও মেলে অনেক। গোলাপ ফুল। রক্ত গোলাপ। এ সবই কোডী যাবার পথে পাল্নী পাহাড়ের নীচে জন্মায়।

সুন্দর পরিবেশ। বাঙালী শিব থেকে মাতৃমূর্তির বেশী ভক্ত। তাদের কাছে শিব শ্মশানচারী ত্যাগী। মাতৃমূর্ত্তি শক্তি—ভক্তির প্রতীক।

অন্তর দিয়ে তাই মাকে প্রণাম জানাতে দ্বিধা হয় না।

সুবর্ণ অলঙ্কারে আদৃত দেবীমূর্তি বিরাট বৈভব। তবু মূর্তিটি সুন্দর স্নিগ্ধকর।

এইবার এপাশে সুন্দর একটি পুষ্করিণীর ধারে এসে বসলাম। অনেক ঘুরেছি, ক্লান্ত, চারিদিকে থাম দেওয়া সুন্দর করিডর, নীচে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে।

গাইড বলে—এই পবিত্র সরোবরে ইন্দ্রদেব স্নান করে শিবের পূজা করতেন। এইখানে স্নান করে তিনি বৃহস্পতির শাপমুক্ত হন।

এখান থেকে দেখা যায় বিরাট গোপুরম্। পশ্চিম দিককার ওইটিই মূল প্রবেশ পথ, গাইড বলে।

—ওর নাম মট্টটে গোপুরম্। দীর্ঘদিন ধরে ওর শীর্ষদেশ ন্যাড়া অবস্থায় ছিল, পরে ওটা সুন্দর করে তৈরি করা হয়। তামিল ভাষায় মট্টটে মানে মুণ্ডিত।

সকালের আলোয় বিরাট ওই গোপুরম্‌গুলো উদ্ভাসিত হয়েছে, এই সরোবর থেকে ওর শীর্ষদেশ চমৎকার লাগে। টিয়াপাখির কলরব উঠছে। টিয়াপাখিই নাকি মীনাক্ষী দেবীর প্রিয়, তাই মন্দিরের খাঁচায় ওদের পোষা হয়েছে।

তারা কলরব করছে। পুলক আর প্রশান্ত ক্যামেরা খুলে ছবি নিচ্ছে।

এমন সময় ওদিক থেকে তেড়ে মেড়ে হাঁক পাড়তে পাড়তে ছুটে আসে একজন মন্দির রক্ষী। ব্যাপারটা বোঝা যায়, অনেক মন্দির কর্তৃপক্ষ ছবি তুলতে দিতে নারাজ।

এঁরাও বোধহয় চাননা, তখুনিই পুলক আর প্রশান্তকে সরে যেতে বললাম আড়ালে, বিমলদা আমি আর ইলা দাঁড়িয়ে রইলাম।

তেড়ে মেড়ে সে এসে দাঁড়াল। আমরা খাপ সমেত দুটো বাইনাকুলার তাকে দেখালাম,—এতে তো ছবি আসে না বাবা।

লোকটাও বুঝল, মাথা নেড়ে সরে গেল ইতস্ততঃ করে। ব্যাপারটা কি ঘটল বুঝতে পারল না সে।

অবশ্য তার আগেই কাজ হাসিল হয়ে গেছে, ওই সুন্দর ছবিটা নেওয়া হয়ে গেছে।

চত্বরে এসে দাঁড়ালাম, পূবদিকেও সুন্দর একটা গোপুরম। অনেক পুরোনো আর ওর কারুকার্যও সুন্দর।

গাইড বলে—ওটা আর ব্যবহার করা হয় না, ওটা নাকি ভূতুড়ে হয়ে গেছে।

অবাক হই—ভূতুড়ে গোপুরম্ মন্দিরে—আবার ভূত থাকে নাকি?

গাইড বলে—ওর সঙ্গে একটা অশুভ ঘটনা জড়িয়ে আছে। নায়ক বংশের রাজা বিজয়রঙ্গ চোক্কানাথের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটে।

চোক্কানাথ ছিলেন স্বার্থপর রাজা, তিনি রাজধানী মাদুরা থেকে আবার ত্রিচিনাপল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যান, প্রাসাদের অনেক ধনসম্পদও নিয়ে চলে গেছেন সেখানে। মন্দিরের কর্মচারী পূজারীদের জন্য রাজা বিনা রাজস্বে জমি দান করেছিলেন, চোক্কানাথ সেই জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণ করেন, ফলে কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, একজন কর্মচারী তারই প্রতিবাদে ওই পূর্ব গোপুরমের শীর্ষ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

তাই ওই গোপুরম্ অশুভ হয়ে গেছে। ওদিককার প্রবেশ পথও বন্ধ। এখন ওর প্রথম দিককার আঠারোটি সিঁড়ি শুধু শপথ গ্রহণের কাজে লাগে। প্রবাদ আছে কেউ যদি ওই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বীকারোক্তি করে, আর মিথ্যা প্রমাণিত হয় আঠারো দিনের মধ্যেই সে মারা যায়।

ইলা বলে—তা হোল। কিন্তু রাজা রাজস্ব ধার্য করলেন পূজারীর জমির উপর, তারা আত্মহত্যা করবে এটা কেমন কথা। এখন সরকার তো সব জমিতেই খাজনা করেছেন।

জবাব দিই—আর পুরোহিতরাও এখন স্রেফ খাজনা দিয়ে জমি নিচ্ছেন, দেবতাকে আর ভোগরাগ তো দিচ্ছেন না। সে সব তো সরকারেরই দায়ে পড়েছে এখন? তারাও মন্দির-ধর্ম ছেড়ে দিলেই পারতেন? তা তো দেননি।

বিমলদা বলে—দেবেন কি করে। ধর্ম আর পূজারারাই সেদিন সমাজের শীর্ষে, রাজার জীবন-মরণও তাদের হাতে নির্ভর করতো। এত বড় প্রাইজ পোস্টটা কি সহজে ছাড়া যায়, মরাও এর থেকে সোজা!

—থিরুমল নায়ককে তারাই শেষ করেছিল।

গাইড চুপ করে থাকে। সে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে নারাজ। হয়তো

ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে কেউ বিবাদ করতে চায় না।

বেলা বাড়ছে, মিউজিয়াম দেখে এবার প্যালেসে যাবো। দর্শনী বোধহয় দশ নয়া পয়সা। সহস্র মণ্ডপ হল জুড়ে সুন্দর একটি মিউজিয়াম।

এর প্রদর্শনীও চমৎকার। মাদুরা মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই মিউজিয়াম। তবু মনে হয় দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্য তার ক্রমবিকাশের ধারা এবং বিভিন্ন দক্ষিণীরাজবংশের তাতে অবদান এসব নিয়ে প্রামাণ্য সারগর্ভ প্রদর্শনী করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে মূলতঃ পল্লভ চোল, পাণ্ড্য বিজয়নগর নায়ক রাজবংশই রাজত্ব করেছিল। চালুক্যরা ছিল আরও উত্তর পশ্চিম অংশে। পল্লব রাজবংশের আগে দক্ষিণ ভারতে মন্দির তৈরি হয়েছিল খুব টেঁকসই পদার্থ দিয়ে নয়। তাই তারা কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেছে। পল্লব আমল থেকেই পাথর কেটে মন্দির তৈরির ধারা প্রবর্তন হয়, ক্রমশ তা উন্নত মানের হয়ে ওঠে। সেই নির্মাণ শৈলীর চরম পরিণতি এই মাদুরা শ্রীরঙ্গম মন্দির।

মন্দিরের পরই আসে মন্দিরের দেবমূর্তি নির্মাণ শৈলীর প্রসঙ্গ।

বিমলদা বলে—এই বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ। প্রস্তর মূর্তি, তাম্রমূর্তি, ব্রোঞ্জ অন্যান্য ধাতুমূর্তি ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি সংগ্রহও রয়েছে। গণপতির মূর্তিই কতরকম?

ইলা দেখে চলেছে—হেরম্ব গণপতি, পঞ্চমুখ গণপতি, নিরুথ গণপতি, বাতাপি গণপতি, সোদ্ধবুদ্ধি গণপতি, লক্ষ্মী গণপতি, বল্লভ গণপতি, উৎশ্চিতা গণপতি, সুহাসন গণপতি।

বিমলদা বলে—কত ওলটাবে ওলটাও। উলটে শেষ করতে পারবে না; এবার এলেন বাবা মহাদেব। এও দেখ প্রায় বত্রিশ

রকম মূর্তি, এরপর আছে বৈষ্ণববিভাগ, বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি ছাড়া আরও অনেক মূর্তি রয়েছে।

—এরপর চলুন দেবী বিভাগ। সেখানেও আছে তিনটে শাখা। একটি শঙ্করী শিবের শক্তি; অন্যটি বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, তারপর ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী তাদের বিভিন্ন রূপ।

এ ছাড়াও পূজা কর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, মন্দিরসজ্জা, মন্দির মূর্তি ছাড়াও ধর্মভিত্তিক শিল্পকলার নানা ছবিও আছে।

সুন্দর বলি।

মন্দির তো সুন্দরই। এই মিউজিয়ামও সুন্দর বিমলদা।

সারা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরমূর্তি শিল্পকলা লোকাচার ধর্মানুষ্ঠানের এত নিখুঁত সংগ্রহ কম দেখেছি।

একপাশে একা একটি সুন্দর থামের কাছে এসে দাঁড়ালাম। মূল থামটার চারপাশে অপেক্ষাকৃত সরু থামগুলো সাজানো। একে আঘাত করলে সা-রে গা-মা সাতটি স্বর ফুটে ওঠে।

বলে গাইড—পাথরের থামগুলো ভিতরে ফাঁপা, সেইখানে কমবেশী বায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি করে, তাতেই বিভিন্ন সুর উঠছে।

তবে সুরগুলো বেশ স্পষ্টই।

বেলা বেড়ে উঠেছে। সহরে লোক চলাচল বেড়েছে। অফিস যাত্রীদের ভিড়ও আছে, রাস্তার সামনেই দেখি হৈ চৈ ব্যাপার। পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। মাদ্রাজের রাজ্যপাল এসেছেন মীনাক্ষীদেবী মন্দিরে পূজো দিতে তাই এত আয়োজন।

গাইড বলে—মীনাক্ষীর সম্পদও প্রচুর। সপ্তম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ছিলেন, তিনি তখন এই মন্দির দেখতে আসেন। মন্দিরের দেবমূর্তির একটা মণিমুক্তা বসানো হার দেখে তিনি বিস্মিত হন, এত দামী হার আর এমন সুন্দর জিনিস তিনি দেখেননি। মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন যদি এটা একবার বিলেতে নিয়ে গিয়ে তার মাকে দেখাতে দেন তিনি বাধিত হবেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁর

সে অনুরোধ রক্ষা করেন। অবশ্য সপ্তম এডওয়ার্ডও সেটা ভিক্টোরিয়াকে দেখিয়ে বিশেষ দূত দিয়ে আবার ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।

পথ দিয়ে চলেছি।

মীনাক্ষীদেবীর সম্বন্ধে বলে চলেছে গাইড।

১৮৭০ সালে তখন মাদুরার কালেক্টার ছিলেন রোজ পিটার নামে এক সাহেব। তখন কালেক্টারই ছিলেন মন্দির বোর্ডের চেয়ারম্যান। ওই পিটার সাহেব ছিলেন মীনাক্ষীদেবীর একান্ত ভক্ত।

রোজ কাজে যাবার আগে মন্দিরের মাইরে এসে দেবীকে প্রণাম করে তিনি এজলাসে যেতেন। শোনা যায় এক রাত্রে ঘুমুচ্ছেন তিনি, হঠাৎ মনে হয় একটি মেয়ে তাকে জোর করে বিছানা থেকে তুলে বারান্দায় বার করে আনে। কি এক স্বপ্নের ঘোরে হকচকিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াবামাত্র প্রচণ্ড শব্দে তাঁর শোবার ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়ল তার বিছানায়।

চমকে ওঠেন তিনি।

পরে মীনাক্ষীদেবী সেদিন বিজয় শোভাযাত্রায় বের হয়েছেন। দেবীর অশ্বারূঢ় মূর্তি দেখে সাহেব চমকে ওঠেন, সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখা তার প্রাণদাত্রী মেয়েটির মুখও ছিল ঠিক তেমনি।

পিটার সাহেব দেবীর অশ্বারূঢ় মূর্তির জন্য দুটি সোনার রেকাব করিয়ে প্রণামী দেন। আজও সেই রেকাব রয়েছে।

চুপ করে শুনি, হায় কে জানে এর মূলে কি আছে। ইলা বলে, কেন হবে না। দেবদেবীদের সম্বন্ধে এরকম অনেক কাহিনীরই প্রচলন আছে। এর মূলে কি কোন সত্য থাকতে পারে না?

জবাব দিই—অস্বীকার তো করিনি ইলা।

বাজার এখনও চলেছে। মাদুরায় দেখলাম কিছু গুজরাটি ব্যবসাও রয়েছে। মাদ্রাজের অন্য সহরে বিশেষ তাদের দেখা মেলে না। সেখানের ব্যবসা সবকিছু মাদ্রাজীদের হাতেই। এমন কি খাস মাদ্রাজ সহরেও সেই অবস্থা।

ওদের প্রদেশে তাদেরই প্রাধান্য, ব্যবসা বাণিজ্যও মোটামুটি তাদের নিজেদের হাতে।

এটা বরং ভালোই লাগল। ইলা বলে।

—কলকাতা কস্‌মোপলিটান সিটি—সকলেই এখানে আসে; বিমলদা জবাব দেয়।

—আর পেটে উপোস দিয়ে তামাম কলকাতা পরের হাতে তুলে দিয়ে কস্‌মোপলিটান হবার মত সুখ-গৌরব না হলেই হয়তো ভালো ছিল? এরা কি খারাপ আছে?

সুরপতি বলে।

—দাদা, একটু কফি হোক। নইলে আপনার মেজাজ আরও চড়বে। তারপর প্যালেসে রাজকীয় মেজাজ নিয়ে ঢুকবেন।

কফির দোকানে মিললো পুরি।

ইলা বলে—অনেক দিন পর ওটা পেয়েছি, আজ খাবোই। চারখানা করে পুরি দিন।

দোকানদার বোধহয় ইংরেজী বোঝে। কলাপাতায় করে পুরি আর সেই সঙ্গে স্রেফ লাউ-এর তরকারি নয় রসমই বলা যায় তাই দিল।

খিদের মুখে মন্দ লাগল না।

—লাড্ডু দেখি? ওয়ান পিস্।

বাদামতেলে ভাজা পুরি বিশ পয়সা আর ওই বাদামতেলে ভাজা শুকনো গুড়ের ছিটে দেওয়া লাড্ডু চার আনা। কফি বিশ পয়সা।

বিমলদা বলে।

—পোড়া দেশ থেকে কবে যাবো বলতে পারিস?

কেন?

—এ যে পেঁচিয়ে গলা কাটছে বাবা।

জবাব দিই—অদ্য শেষ রজনী। তারপর তো বাঙ্গালোর—মহীশূর সেখানে তো ক্যানারিজের রাজত্ব।

বিমলদা গজ গজ করে।

—তারা তোকে এমনি রাজভোগ খাওয়াবে। চল দেখিগে সে আবার কেমন মুলুক।

পথে বের হলাম। একটু ওপাশেই প্যালেসের সীমানা।

গাইড বলে

—নায়ক বংশের একজন রাণী মংগমামল। নায়ক বংশের মধ্যে অন্যতমা।

খ্যাতনামা রাণী ছিলেন তিনি। তার স্বামীর মৃত্যুর পর সিংহাসনের ওয়ারিশান হল তাঁর নাবালক পৌত্র, সেই পৌত্রের অভিভবক হয়ে তিনি রাজকার্য চালাতেন। রাজ্যের অনেক জনহিতকর কাজ তিনি করেন। দানও ছিল তাঁর অনেক। মন্দির, পথ, ঘাট, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অনেক অর্থই ব্যয় করতেন তিনি।

আর সাধু এই সাধুতাই হ'ল কাল। অনেক দুষ্টু বুদ্ধির লোক নানা কাহিনী রটাতে লাগলো যে রাণীর সঙ্গে মন্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক কিছু আছে।

এদিকে নাবালক পৌত্র সাবালক হয়ে উঠেছে। স্বার্থপর কিছু লোক এইবার রাজ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। এরই ফলে রাণী মংগ্‌মামলকে কারারুদ্ধ করে অনাহারে তিলে তিলে হত্যা করা হয়।

প্রতি প্রাসাদের ইতিহাসই বোধহয় এমনি সকরুণ, ওর হর্ম্যতলে এমনি কত নীরব হাহাকার গুমরে ফেরে।

আজ থিরুমল প্রাসাদ স্তব্ধ।

সামনে বাগান একটু। গাইড বলে।

প্যালেসের এটা একটা অংশমাত্র, মূল প্রাসাদ আরও অনেক বড় ছিল। এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রায় তার বিস্তার ছিল। সে সব ভেঙে আজ পথ-ঘাট বাড়ি হয়ে গেছে। দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শেষ রাজ বংশ।

প্রাসাদের শিল্পশৈলীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, থামগুলো আর গম্বুজ। বিশাল গম্বুজ তাতে কোন লেচ্ছা কাঠ কোন নির্ভরই নেই।

থামগুলো চারজনে হাত ধরাধরি করেও বেড় পাই নি, আর প্রায় সত্তর ফিট দীর্ঘ। শিলিং-এ পেইন্টিং-এর পুরোনো কাজ এখনও কিছু টি*কে আছে।

ভিতরে রাণীর মহল। সেখানে কিছু পঙ্কের কাজ রয়েছে। মাত্র দু প্রস্থই এখন আছে। তাতেও এখন জেলা জজের এজলাশ, সরকারী অফিস্।

একজন কোর্টের পেয়াদা এসে হাজির হয়।

—দর্শনীর জন্য ফি লাগবে। দশ পয়সা।

একটু অবাক হই।

—ফি তা রসিদ দাও গোপাল। এ তাবৎ সর্বত্রই তো দর্শনী দিয়েছি, রসিদ পেয়েছি।

সরে গেল সে।

বিমলদা বলে,

—ওরে বাবা এযে কাছারি দেওয়াল শুদ্ধ হাত বাড়াবে, ও যে প্যায়াদা বাবা! এমনিই হাঁকিয়ে দিলি।

প্রাসাদ থেকে বের হয়ে গাইডকে বিদায় করে এই বার রাস্তায় ঘুরছি লক্ষ্যভ্রষ্টের মত।

ইলা এদিক ওদিকে কিসের দোকান খুঁজছে।

পথে দেখলাম একটা সাইকেল রিক্সায় ফিরছে নেত্যবাবু। সঙ্গে সেই পুঁটুলি গিন্নী। একগাদা কি জিনিসপত্র কেনা হয়েছে।

সুরপতি বলে, যারা কেনবার তারা কিনে নিয়ে গেল দাদা। নেত্যবাবু চালের কারবারের সঙ্গে এবার কাপড়ের ব্যবসাও করবে বোধহয়। টাকাতো তুলতে হবে!

ইলা হাসছে। বলে, এলাম, মাদুরায় শাড়ি কিনবো না? চলুন মন্দিরের ওখানে।

ওপাশেই কতকগুলো কাপড়ের দোকানও মিললো। বিমলদা বলে, মন্দিরের পাশে আর স্টেশনের ধারে পারতপক্ষে বাজার দোকানে কিনো না।

—কেন ?

—ওরা জানে মন্দিরের যাত্রী, গলা কাটবে। আর স্টেশনের ধারেই দেহাতের লোকের আনাগোনা, তাদের জবাই করার সুবিধে।

সামনের দোকানেই ঢোকা গেল।

শাড়ি আর ব্লাউজ পিস এসে জমা হচ্ছে। রকমারি শাড়ি।

—দাম !

—কুড়ি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা অবধি আছে, ওতে দাম খুব এমন বেশী ফারাক হয় না কলকাতা থেকে, তবে রকমারি শাড়ি ব্লাউজ পিস মেলে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। কেনাকাটা করে পথে বের হলাম তখন চন চন করছে রোদ। রোদের তাপও আছে।

তেষ্টাও পেয়েছে। পথের ধারে আখের রস বিক্রি হচ্ছে। চার আনা গ্লাশ। বেশ কালো আখগুলো রসে ভরা।

আদা—লেবু দিয়ে আখের রসটা মন্দ লাগল না। এবার স্টেশনে ফেরার পালা।

স্বরপতির কথাটা মনে পড়ে।

দেখি নেত্যকালীবাবু একটা ছোট খাট গাঁট বন্দী কাপড় কিনেছে মাদুরায়। আরও কিনবে বাঙ্গালোর মহীশূরে। গাড়িতে জায়গা কম, তাতে নেত্যবাবুর ছুটো বিছানা বাক্স এটা সেটা একবস্তা শাঁখ সর্বমোট প্রায় পনেরো দফা মাল। ওর পাশের বাঙ্কের সরখেলমশাই বলে,—জায়গা কোথায় এত মালের ?

নেত্যবাবু বলে,—রাখতে হবে। তীর্থদর্শনে এসেছি—কিনলাম।

—এই আপনার তীর্থ দর্শন। হাজার দেড়েক টাকার কাপড়

গ্যাস্ত করলেন, আবার শোনাচ্ছেন বাঙ্গালোরে মাইশোরে কিনবেন। ব্যবসা করতে বের হয়েছেন, এখানেও সেই ব্যবসা।

নেত্যবাবু জবাব দেয়,—ব্যবসা তো সবাই করছে। আপনারাও যা কাণ্ড করছেন ছিঃ ছিঃ।

বিজলী এগিয়ে যায়।

—কি বলছেন আপনি।

নেত্যবাবু ঘাবড়ে যায় ওর মূর্তি দেখে। বিজলী বলে চলেছে—ভদ্রভাবে কথা বলবেন। আর এত মাল আপনার যাবে না এখানে। বুকিং করে দেন।

নেত্যবাবু শক্ত পাল্লা দেখে সরে গেল। ধূর্তলোক। আর ঘাঁটাল না।

বিশু মল্লিক আর মলিনা খুশি মনে ফিরছে। ওরাও কিছু কাপড়-চোপড় কিনেছে। ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখলাম ওদের তু'জনকে। মলিনার খোঁপায় গোঁজা লাল একটা গোলাপ :

তার কণ্ঠে আজ সুরের আলাপন। এই ভর্তি তুপুরেও আজ গান গাইছে মলিনা।

বিজয়মাষ্টার প্লাটফমের ওদিকে একটা দড়িতে গেঞ্জি রুমাল এইসব কেচে রোদে মেলছিল, সে একবার ওদিকে চাইল মাত্র।

মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

ইলাকে দেখে হাসল মলিনা। আজ তার চালচলনে খুশির আবেগ ফুটে ওঠে।

আমি দেখে সরে গেলাম।

বৈকালের আলো নেমেছে ভোগী নদীর বালুচরে। তেপ্পাকুলম্ থেকে নদীর দিকে আসছি। নদীর জলে ওই পুষ্করিণীর জলধারার একটা যোগ আছে।

এখন নদীর বুক শূন্য। বালির উপর হিজিবিজি রেখায় ক্ষীণ

জলস্রোত বয়ে চলেছে। অন্যপারে পল্লী অঞ্চল। ধানক্ষেতের সবুজ সোনালী আভাষের পারে মাথা তুলেছে নারকেলকুঞ্জ।

পাখিগুলো কলরব করে বাসার দিকে চলেছে। দূরে মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম দেখা যায় শেষ আলোয় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে ওরা।

ইলা বলে,—মলিনাকে নাকি বিশুবাবু ফিরে গিয়ে বিয়ে করবে বলেছে।

ওর দিকে চাইলাম। বিশু মল্লিককে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় ও আসলে একটা বাজে লোক। মলিনাও সাধারণ একটি মেয়ে। কোন বৈশিষ্ট্য ওর নেই।

এটুকু পাওয়ার স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে উঠেছে। বিশু মল্লিককে কেমন ভরসা করতে পারিনা। বলি।

—বিশুবাবু বলেছে?

ইলা হাসে—তা শুধোইনি। তবে মনে হয় কি জানো? ওর দিকে চাইলাম।

ইলা বলে,—কোথায় যেন ভুল করেছে মলিনা।

চুপ করে থাকি, ইলা বলে,—এত সহজে কিছুই পাওয়া যায় না, তারজন্য প্রতীক্ষা, সাধনা চাই, নইলে শুধু ঠকে, ঠকে আরও দুঃখ পায়।

—কথাটা ওকে বলেছো?

আমার কথায় ইলা বলে,—সে কথা বোঝবার মত মনের অবস্থা এখন নেই ওর।

তবু চাইবো খুব কষ্টে মানুষ হয়েছে, সে সুখী হোক। কিন্তু এখানে সব যে বেসুরে চলে। তাই ভয় হয়।

ইলার কথাগুলো শুনি।

নিজের কাছে নিজেকেই অপরাধী মনে হয় কদিন আগে মুক্ত উদার সমুদ্রবেলায় ওর কাছে আমার মনের ছবিটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

হয়তো আজও মনে মনে সে আমাকে ঘৃণা করে, নয় বোধ করে সঙ্কোচ।

—কথা বলছ না যে ?

হাসছে ইলা, সহজ সুন্দর সেই হাসি।

মুখে ওর দিন শেষের আলোর লালিমা, জবাব দিই।

—সব কথা তো বলা যায় না মলিনার জন্ম সমবেদনা বোধ করি।

—কেন ? জেরা করে ইলা।

—ও আমার দলে। আমি যেন ওর মত বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ করেছিলাম। চাঁদের আলো ভরা পৃথিবীতে সে রাত্রে আমিও ভুল করেছিলাম।

হেসে ওঠে ইলা! আমার চুলগুলো ধরে নাড়া দিয়ে সাবলীল ছন্দময় গতিতে বালির উপর ছুটে যায়। হাসছে সে।

তাগাদা দেয়,—এসো। ফিরতে হবে না ?

—ফিরতে তো একদিন হবেই সব কাজ সেদিন গিয়ে ঘাড়ে চাপবে। তাই যতটুকু এড়িয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো।

ইলা এগিয়ে আসে। হাতখানা ওর হাতে—বাতাসে কোথায় একদল প্রজাপতি শলনী পাহাড়ের সবুজ কালো দিগন্ত সীমার দিকে উড়ে চলেছে একটি মনোরম অপরাহ্ন ফুরিয়ে আসছে। ইলাকে ঠিক চিনতে পারিনি। ও ওই রহস্যলোকে উধাও কোন প্রজাপতি রঙিন পাখনা মেলে হাওয়ায় ভর করে যেন দূরে সরে যায়—কাছ থেকে আরও দূরে।

আবার পথ হারিয়ে পরিক্রমা করে আকাশে। স্টেশনে ফিরে এলাম। আজ রাত্রেই ফিরতে হবে আবার মাদ্রাজে।

—শেষ—